সন্ধানে

শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী

দি কাল্‌চার পাব্‌লিশার্স
২৫এ, বকুল বাগান রো, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৪৭

মূল্য ২৸০

প্রকাশক: শ্রীতারাপদ পাত্র, দি কাল্‌চার পাব্‌লিশার্স ২৫এ, বকুল বাগান রো, কলিকাতা। মুদ্রাকর: শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন, মডার্ণ [redacted] প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা

Sanathana

by Jyotirmala Devi

শ্রীঅরবিন্দ-চরণে

সন্ধানে

(১ম পর্ব)

সন্ধানে

সন্ধানে

অনুপম রেণু ওরফে নীলিমার পিসতুতো ভাই। দুজনে প্রায় সমবয়সী, রেণুই বোধ হয় মাসছয়েকের বড়। অনুপম যখন জার্মানিতে পড়তে যাওয়া ঠিক করল, রেণু ধ'রে বসল ওকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, কারণ একটা ভালো ইউরোপীয় ডিগ্রি নিয়ে এলে ওর চাকরির বিশেষ সুবিধা হয়। অনুপম দিল্লিতে ওকে তার ক'রে দিল—যেন ছুটি নিয়ে শীগ্‌গির একবার কলকাতায় আসে, সমস্ত বিষয়ের রীতিমত পরামর্শের জন্যে।

দিনকয়েক পরে রেণু কলকাতায় এসে দেখে—মহাকাণ্ড! কেন—বলছি—

অনেকদিন থেকেই সুপ্রিয়াদের সঙ্গে রেণুর পিসিমার বাড়ির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, সেই সূত্রে ছেলেবেলা থেকে সুপ্রিয়ার দিনগুলো কেটেছে রেণু-অনুপমদের সান্নিধ্যে। সুপ্রিয়ার দশ বৎসর বয়স থেকে সবাই জানে, ওর বিয়ে হবে অনুপমের সঙ্গে, কোনো কারণেই তার অন্যথা হ'তে পারে না। কি ক'রে সকলে এত নিশ্চিত হ'ল এবিষয়ে, সেটা অনিশ্চিত, কিন্তু এর অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে ওদের সন্দেহ এত কম ছিল যে, সুপ্রিয়ার ষোল পার হ'য়ে সতের—এমন কি আঠার বছর বয়সেও বিয়ের জন্যে বাড়ির কাউকে ব্যস্ত হ'তে দেখা গেল না। বাইরের কারুর গঞ্জনা অনুপমের মার কানে উঠলে তিনি বলেন—"ওসব পোড়া লোকের হিংসে।

আমার সু-র বিয়ে তো ঠিক হয়েই আছে, তার জন্যে অত ভাবনা কেন? অনি ভালয় ভালয় থীসিসটা দিয়ে নিক—"

থীসিসটা দিয়ে কিন্তু অনুপম জো' ধরলে—এবার বিদেশী উচ্চতর ডিগ্রি চাই, অতএব সে যাবে জার্মানি। মা কিছুতেই রাজী নন। সুপ্রিয়ার বাবা উমাশঙ্কর বললেন, "বেশতো, অনুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভালো—না বলবে কে? সত্যিকার শিক্ষালাভের জন্য বিদেশ ভ্রমণটাও নেহাৎ দরকার। টাকার যখন অভাব নেই তখন বড় কাজে ছেলেকে বাধা দেওয়া কেন?"—এ কথার পরে আর কেউ কিছু বলতে সাহস করলে না; অনুপমের বাবা বেঁচে নেই, সুপ্রিয়ার বাবাই ছোট থেকে একমাত্র অভিভাবক।

যাওয়ার যখন আর বাধা রইল না, অন্তঃপুর থেকে তাগিদ এলো, "এবার তাহ'লে কাজটা চুকে-বুকে যাক—"

ঠিক এমনি সময়ে রেণু এসে হাজির পিসির বাড়িতে। ওর মারফতে অনুপম জানালে—পাশ ক'রে ফিরে এসে কর্মক্ষম হবার আগে বিয়ের গুরুভার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে না।

মা রাগ ক'রে বললেন, "তোকে কি বউকে খাওয়াতে হবে?"

"না, কিন্তু অন্যে খাওয়াক সেটাও চাইনে।"

শুনে সুপ্রিয়ার বাবা চুপ ক'রে রইলেন। মা কত কান্নাকাটি করলেন, কত ভয় দেখালেন, সুপ্রিয়ার মত মেয়ে হাতছাড়া হ'য়ে যেতে পারে তাও বললেন, কিন্তু অনুপম অচল অটল। ওর সেই এক কথা—ফিরে এসে যা হবার হবে। অথচ ততদিন আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রাখতে গেলে খুব কমপক্ষেও সুপ্রিয়ার বয়স বাইশ পার হয়ে যায়। ওর বাবার না ছিল টাকার অভাব, না সামাজিক প্রতিপত্তির। দেশে বিদ্বান ছেলেরও দুর্ভিক্ষ হয়নি। তেমন অবস্থায় কে-ই বা—বাংলা দেশের কোন্ কন্যার পিতা—মিছামিছি মেয়েকে এত বয়স অবধি

অনূঢ়া রেখে দেয় ? সুপ্রিয়ার বাবাও নিশ্চেষ্ট রইলেন না। কিন্তু একদিন বসবার ঘরে পিতাপুত্রীতে আধঘণ্টা-খানেক কি কথাবার্তার পরে সুপ্রিয়া যখন বেরিয়ে এলো, রেণু একটু কাজে ওর কাছেই যাচ্ছিল। সুপ্রিয়া এমন ব্যস্ততা দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে উধাও হ'ল যে, রেণু দরকারী কথাটা শুধোবারই অবসর পেল না, কিন্তু ওর তীক্ষ্নদৃষ্টি থেকে সুপ্রিয়া নিজের আরক্ত মুখখানা সম্পূর্ণ গোপন করতেও পারল না।

তারপরে হঠাৎ বিয়ের কথাবার্তায় পূর্ণচ্ছেদ; শুধু তা-ই নয়, ওর বাবা রেণুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, সে সুপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি কি না।

"কোথায় জ্যাঠামশাই ?"

"তোমার সঙ্গে।"

সুপ্রিয়ার দিকে চেয়ে রেণু বিস্ময়-আনন্দে চমকে উঠল, "বিলেতে ? সত্যি বলছেন ?"

"সু ধ'রে বসেছে। বিয়ে যখন করতেই চায় না—তা যাক সে কথা ; তোমার তো লণ্ডনে যাওয়াই ঠিক মা ?"

"হাঁ। ভেবে দেখলাম চাকরীই যখন করতে হবে, বিলিতি ডিগ্রিই ভালো। পরে এডিনবরা আর আয়র্ল্যাণ্ডেও যেতে পারি।"

"ডাক্তারি লাইনে অভিজ্ঞতাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুঁজি। তা তোমার আছে, ওদেশে গিয়ে আরো বাড়বে। ডিগ্রি দু'টো একটা না হ'লে সাধারণে বোঝে না, তাই সেটা দরকার। চাকরির জন্যে চাকরি করাও—অর্থাৎ নেহাৎ অর্থের জন্যে—তোমার তো লক্ষ্য নয় রেণু ?"

"আশীর্বাদ করুন জ্যাঠামশাই, ভবিষ্যতে একদিন যেন এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্যে নিজের জীবনটা দিতে পারি সঁপে। মানুষের মনে গোপন আশা তো কতই থাকে।"

"সকলের থাকে না মা। যাদের থাকে, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তাদের জীবন যেন কিছুতে নষ্ট না হয়—সংসারের কোনো ঝড় ঝাপটায়ই না। তারাই যে আমাদের ভবিষ্যতের ভরসা। এ কথা কোনোদিন ভুলোনা রেণু, নিজেকে পরের কাজে দিতে পারাটাই সংসারে সবচেয়ে বড় পারা—নিজের শিক্ষা-দীক্ষা, সামর্থ্য—সমস্ত। আমি বুড়ো হয়েছি, শরীরে ধরেছে ভাঙন—তোমরা ফিরে আসতে আসতে—"

"না জ্যাঠামশাই, প্রথম ষ্টেজে ডায়াবিটিস এমন কিছু মারাত্মক নয় যে এত শীগ্‌গির—"

"শীগ্‌গির কই মা, তিন-চার বছরের ধাক্কা, কিন্তু সে কথা থাক। জীবনের অবসান তো মানুষের যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো কারণে হতে পারে। সে সময় যদি আসেই, ঠেকাবে কে? আর, এই জীর্ণ দেহটা আশ্রয় ক'রে কোনোমতে পৃথিবীকে আঁকড়ে পড়ে থাকাটাই সত্যিকার বাঁচা ব'লে আমি মনে করিনে। বাঁচব তোমাদের মধ্যে—আমার নিজের হাতে-গ'ড়ে-তোলা ছেলেমেয়ের বড় জীবনের বড় আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে।"

"এতটুকু কৃতজ্ঞতা, একটুখানি মনুষ্যত্বও যদি থাকে, কখ্‌খনো নিরাশ করব না আপনাকে। ছোটবেলা থেকে যে আপনার আদর্শের আবহাওয়ায়ই মানুষ হয়েছি জ্যাঠামশাই, সে কি ভুলতে পারি?"

"হঠাৎ এত কথা ব'লে ফেললাম ব'লে কিছু মনে করো না মা। কিন্তু মেয়েরা বাপের মন যতখানি বোঝে, আর কেউ তত নয়। সবাই ভুল বুঝুক ক্ষতি নেই, শুধু তোমরা জেনে রাখো কেন অত দূরে যেতে অনুমতি দিচ্ছি—এত স্বচ্ছন্দে।"

ফিরবার সময় রেণু একটু ইতস্তত ক'রে মৃদুস্বরে বললে, "জ্যাঠামশাই, আমি ভারি দুঃখিত যে অনু—অনুপম—"

সুপ্রিয়ার বাবা চকিতে মেয়ের দিকে কটাক্ষ ক'রে বললেন, "সু, ও-ঘর থেকে আমার চিঠির ফাইলটা নিয়ে এসো তো মা!"

সে বেরিয়ে গেলে বললেন, "তোমাকে একটা কথা ব'লে রাখি রেণু, এ নিয়ে ওদের দুজনের কাউকেই তোমরা আর পীড়াপীড়ি জোর-জবরদস্তি কোরো না। যদি স্বেচ্ছায় কখনো মিলতে চায়, আমার পুরো স্নেহ-সম্মতি আর আশীর্বাদ তো রইলই; তা নইলে সু-কে দাও একলা চলতে, কিংবা ভবিষ্যতে ওর মন যদি আর কাউকে চায়—"

রেণু ব্যথিত কণ্ঠে বললে, "জ্যাঠামশাই!"

তিনি হেসে বললেন, "তা নয় মা, অনুপমের উপর আমি একটুও বিরক্ত হইনি। সে যা ভালো বুঝেছে তা-ই করেছে। এখন আমি কেবল এই চাই যে, আমাদের কোনো বিধান ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের পায়ে আর শিকল না পড়ুক—তারা আর দুঃখ না পাক আমাদের মনোমত কাজ করতে পারল না ভেবে—"

"সুপ্রিয়াও কি—"

উমাশঙ্কর ইসারায় ওকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, "তা নয়, সু কিছুই বলেনি—তবে আমিই আর ওকে কোনো বন্ধনে রাখতে চাই না। বাপ হয়ে আমার যতটুকু করবার আছে—শিক্ষার, জ্ঞানলাভের, ওর নিজেকে বিস্তারের সুযোগ ক'রে দেওয়া—শুধু ততটুকুই আমি দিয়ে যাব। তারপর ওর কর্তব্য, ওর পথ ও নিজেই বেছে নেবে খুঁজে নেবে। আমার নিজের সাধ-আহ্লাদ দাবি-দাওয়াকে বাধার মত ওর সামনে খাড়া ক'রে ধরব না। ওকে বুঝতে দিতে চাই যে ও মুক্ত। নইলে জীবন ওর পূর্ণায়ত হবে না।"

"অনুপমের সঙ্গে মিলনে কি ঠিক তা-ই হ'তে পারে না জ্যাঠামশাই—আপনি যা চান? আমি তো ভাবতেও পারি না যে সু-র আর কোথাও—"

"বলেছি তো রেণু, ওরা স্বেচ্ছায় পরস্পরকে চাইলে আমার কোনো আপত্তিই নেই। কেবল আগের ভুলটার জের টানতে ইচ্ছে নেই আর। মেয়েকেও তাই বরাবর আঘাত পেতে দিতে—কিন্তু ঐ বুঝি সু আসছে; থাক এখন এসব কথাবার্তা। তুমি কিন্তু ওকে দেখো মা সব সময়ে—তোমার সঙ্গে যাচ্ছে ব'লেই—জানো তো মা তোমাকে কত বিশ্বাস করি?"

"জ্যাঠামশাই, যতটুকু সাধ্য আমার, করব—সুপ্রিয়ার জন্যে যাতে আপনাদের কোনো ভাবনায় পড়তে না হয়—"

সুপ্রিয়া ঘরে এলো, "বাবা, এই ফাইলটা তো?"

"হাঁ মা, এইটেই।"

সকলে যখন শুনলে সুপ্রিয়াও যাচ্ছে বিলেত, আত্মীয়-মহলে একটা সাড়া প'ড়ে গেল। বিলেত? সেই সাতসমুদ্র-তেরনদী-পারের রূপকথার দেশ? মেয়েছেলে?—বলা বাহুল্য, কেউই খবরটাকে বিশেষ ভালোভাবে নিতে পারলে না। কোনো রসিকা ঠানদিদি ঠোঁট ধনুক ক'রে মুচকে হেসে ব'লে ফেললেন, "হয়ত শুক সারীর চোখের আড়াল সইতে পারবে না—তাই এ ব্যবস্থা। কম তো নয়—চার-পাঁচ বছরের বিচ্ছেদ একটানা সওয়া! এ কি আর সেদিন।"

দ্বিতীয়া—"হুঁ, বিয়েই হ'ল না—তা শুক—"

তৃতীয়া—"ওমা বলিস্ কী? উমাশঙ্কর এ তবে করছে কী?"

"তাইতো বলি—যদি পাঠাতেই হয়, মাত্তর সাতটা পাক ঘুরিয়ে বিয়েটা চুকে-বুকে গেলে একসাথে পাঠালেই হ'ত? 'না' করত

তাকে কে? কিন্তু এখন—সোমত্ত মেয়ে, আগুনের ফুল্‌কি, ইয়ে—একটা কিছু ঘটতে কতক্ষণ?”

ঘরে বাইরে ঢিঢিকার, সবাই সবিস্তারে শুনল—অনুপমের প্রতিজ্ঞা, “ফিরে এসে বিয়ে হবে, এখন নয়।”—

“বলি, উমাশঙ্কর কি মেয়েকে বিবি করতে বিলেতে পাঠাচ্ছে?”

“মা—মা, কালে কালে আরো কতই দেখব, কতই শুনব! হবে না কেন? মেয়েকে অত বড় বুড়োধাড়ি ক’রে পুষে রাখা! এখন লেখাপড়া জানা পটের বিবিটির কি আর ঘরে মন বসবে? ছুটবেই তো নানান দিকে—”

কেউ বা বললেন, “লিখে রাখো তোমায় এই ব’লে দিলাম—আমার কথা সত্যি হয় কি না হয়! ওরা বিলেত ঘুরে এসে দেব-দেবতা আর মানবে না, বিয়ে যদি করেই তো করবে শুধু আংটি পরিয়ে—মেমের মতন, সেই যে একবার দেখেছিলাম, মনে আছে ঠাকুরঝি?—হুঁ, তারপর সায়েব-পাড়ায় গিয়ে থাকবে, হাত ধরাধরি ক’রে গড়ের মাঠে একসঙ্গে হাওয়া খেতে যাবে। যে এখন এতটা করছে সেই বুড়ো বাপকেও কি আর গেরাহ্যির মধ্যে আনবে?”

“তা তো আনবেই না! বুঝবে তখন উমাশঙ্কর কী আহাম্মুকিটাই করছে!”

“রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মত অন্ধ হয়েছে গো—স্নেহ অন্ধ হয়েছে। এখন হাজার বললেও কি ছাই শুনবে?”

“যখন এ গরীবদের কথা বাসি হ’লে ফলবে—”

একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে—তার সহানুভূতি সুপ্রিয়ার দিকে—খপ ক’রে ব’লে বসল, “তখন আর খাওয়া যাবে না, বাসি জিনিষ ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়।”—বলেই যায় পালিয়ে।

“কে রে, বড়দের কথায় কথা বলতে আসে?”

"আবার কে? ঐ ডেঁপো ছোঁড়াটা—মণে আজকালকার ছেলেমেয়েগুলোই হয়েছে অমন!"

"পিঁপড়ের পাখ গজিয়েছে, বুঝলে কি না আন্নাকালী? সমাজটা ছারেখারে দেবে এরা—"

এইসব অপ্রিয় সমালোচনার খানিকটা সুপ্রিয়া ঘরে বসে নিজের কানেই শোনে, খানিকটা বা ছোট ভাইবোনেরা এসে যায় শুনিয়ে। ধমক দিয়ে ওদের থামায় বটে, কিন্তু মনে মনে বড় কষ্ট হয় বাবার জন্যে। এক একবার ভাবে, "না-ই বা গেলাম অতদূরে—এতদিনের কাজ! এখানেই আরো পড়ি, শেষে করব রিসার্চ। বিলেতে গিয়ে কি-ই বা হয়—হাতিঘোড়া!"

সন্দেহটা বাবা ও রেণুর কাছে বলতেই রেণু ধম্‌কে ওঠে, "ছি সু, এত অল্পে কাতর হ'লে চলে কখনো? যে কাজ করতে যাচ্ছ তাতে তোমার উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় লোকনিন্দা গায়ে মাখতে আছে?" রেণু আড়ালে আরো বলে, "এমনি করে জ্যাঠামশাইকে নিরুৎসাহ ক'রে দিস্‌নে ভাই।"

"কিন্তু বাবাকে যে লোকে বড্ড যা-তা বল্‌ছে রেণুদি! নতুন মামিমা তো মুখের উপর—"

রেণু বাধা দিল, "বলতে দে না। যে কোনো নতুন কাজে নানান্ বাধা বিপত্তি এসে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে প্রথমটা। তা ব'লে দিবি তুই হাল ছেড়ে?"

"আমাকে মন্দ বললে গ্রাহ্য করিনে, কিন্তু বাবাকে যে খেয়ে ফেললে ওরা! এই দু'দিনেই কি রকম রোগা হয়ে গেছেন দেখেছ? কাল অনেক রাতে উঠে দেখি বাইরে বারান্দায় ইজিচেয়ারে একলাটি ব'সে আছেন। রাত্রে ঘুম নেই চোখে, দিনের বেলা এরকম হাজারো মুখনাড়া—কী হবে তাই আমার বিলেতে গিয়ে যদি—"

"ও-ই দেখ্, এখন থেকেই রকমারি দুশ্চিন্তা! আমাকে যদি জিজ্ঞেস করিস তো বলি তুই বড় অল্পে কাতর। আর একটু শক্ত হ'তে শেখ্ ভাই। তোর ওপর জ্যাঠামশায়ের অনেক আশা, শুনলি ত' সেদিন কী বললেন?"

সুপ্রিয়া চোখ মুছে বললে, "সেইজন্যই তো এত বাজে রেণুদি। যেখানে বেশি আশা, সেখানে ভয়ও বেশি। বাবা যদি আমার আবদারে এত সহজে রাজি না হতেন, এত যদি প্রশ্রয় না দিতেন আমায়—"

"তুই তা মনে ক'রেই বরং আরো সাহস কর্, ভালো সঙ্কল্পে আরো দৃঢ় হ। ভালো কাজ ক'রে জ্যাঠামশাইকে যতটা সুখী করতে পারবি, কাছে পড়ে থাকলে কি তার অর্ধেকও পারবি মনে করিস?"

"কিন্তু রেণুদি, আমার মনে যখন সন্দেহ একটা উঠেইছে, খুলে ব'লে ফেলি—শোনো। বাস্তবিক, বিদেশে গিয়ে কি আমাদের সত্যিকার কোনো উপকার হবে মনে করো তুমি?"

"মানে?"

"ডিগ্রি তো আমরা এখানেও পেতে পারি—না-ই বা হ'ল তা বিলিতি—"

রেণু আশ্চর্য হ'য়ে গেল, "ডিগ্রির কথা বলছে কে? ডিগ্রি ঘরে বসেও পেতে পারিস বই কি, তা-ই যথেষ্ট—বিশেষ ক'রে তাদের কাছে, যারা তোরই মতো, ভবিষ্যতে চাকরির জন্যে হা-হুতাশ ক'রে বেড়াবে না, খাওয়া-পরার অভাব যাদের নেই, কোনোদিন হবেও না—"

সুপ্রিয়া একটু হেসে বললে, "কি ক'রে জানলে কবে আমায় কি করতে হবে না হবে? কিন্তু সে কথা যাক।—তবে আর লাভটা কী বিদেশে গিয়ে?"

"এও তোকে বলে দিতে হবে সু? তুই ঠাট্টা করছিস?"

"সত্যি—তোমার কী মত শুনতে চাই রেণুদি, ঠাট্টা নয়।"

রেণু একটুখানি চুপ ক'র থেকে বললে,—"আচ্ছা বল্ দেখি, তুই আমার সঙ্গে যাচ্ছিস, তাতে জ্যাঠামশাই এত নিশ্চিন্ত কেন?

"বাঃ তুমি কত দেখেছ শুনেছ! সেই ম্যাট্রিক পাশের পর থেকে দিল্লিতে ডাক্তারি প'ড়ে ডিগ্রি নিয়ে তারপরে চাকরীর অজুহাতে আরো কত হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়িয়েছ, সাতঘাটের জল খেয়ে খেয়ে এই পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সেই তুমি একটা পুরুষমানুষের মত শক্ত-সমর্থ আত্মনির্ভরশীল। তোমার অভিজ্ঞতাটা কি কম ভাই রেণুদি? বাবা আমার মত খুকিকে তোমার হাতে সঁপে না দিয়ে পারেন?"

রেণু উত্তরে শুধু মৃদু মৃদু হাসে।

"হাস্‌ছ যে? আমার কথাটার তো কই জবাব দিলে না?"

"দিইনি?"

সুপ্রিয়া অবাক হ'য়ে ওর মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে থেকে হঠাৎ হেসে উঠল, "ও দুষ্টু, আমার মুখ দিয়েই—" তারপর কী ভেবে বললে, "কিন্তু অভিজ্ঞতা, দশ রকমটি দেখাশোনা, শক্ত-সমর্থ আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার জন্যে বিলেতেই যে যেতে হবে তার কী মানে? তুমিও তো এখনো সে দেশে যাও নি, তোমারই কিসে কম—"

"না, কম নয়। কিন্তু আমি আরো চাই! আরো দেখতে, আরো শুনতে, আরো শিখতে, আরো জানতে! এমন অনেক জিনিস আছে যা আমি দেখিনি, যা আমি জানি না—শুধু এখনো এ দেশের বাইরে যাইনি ব'লে। এই সুযোগে—বিলেতে গিয়ে—আমার সে অভাবটা পূর্ণ হবে, অন্তত খানিকটা। শুধু বাংলাদেশে বদ্ধ হয়ে থেকে আমার যা হ'ত না, দিল্লিতে একলা পড়তে গিয়ে তা-ই হয়েছে। অল্পবয়স থেকে আমি নিজের ওপর নিজে নির্ভর করতে শিখেছি; শুধু

দিল্লি আর কলকাতায় ঘোরাফেরা ক'রে যা হত না, তোর ভাবায় ছিল দিল্লি সাতঘাটের জল খেয়ে তাও আমার হ'ল অর্থাৎ সংসারটাকে একটু চিনতে একটু বুঝতে পারা। তাই সু, আমি লোকের দু'কথায় তোর মতো হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসি না। নিজের উদ্দেশ্য ঠিক রেখে নিজের পথে নিজেকে চালাতে জানি। তুইও যখন আমার মতো দশরকম দেখবি শুনবি, এত অল্পে আর কাতর হবি না।"

সুপ্রিয়া চিন্তিতভাবে বললে, "কি জানি; আমার তো মনে হয় সেটা আমার স্বভাব। তোমাতে আর আমাতে তুলনা চলে না রেণুদি, তুমি চিরকালই—"

"কে বললে? আমিও চিরকালই কিছু আজকের মতন ছিলাম না। আমার কী-ই বা জানিস তুই? কত ঘাত-প্রতিঘাত, কত দুঃখ বেদনা স'য়ে—" রেণু হঠাৎ কি ভেবে থেমে যায়। তারপর একটু ম্লান হেসে বলে, "ছোটটি রেখে মা-বাপ দুজনেই মারা যান, জানিস তো? পিসিমা না থাক্‌লে—"

সুপ্রিয়া চুপ ক'রে থাকে। রেণুর জীবনের নানা দুঃখ ও বেদনার কারণ একমাত্র শৈশবে পিতৃমাতৃহীনতাই নয়, সবটা না জানলেও একটু-আধটু যে সুপ্রিয়া শোনেনি এমন নয়। কিন্তু আগেও কোনোদিন কিছুই বলেনি, আজও বলল না। একজন যদি অপরের দৃষ্টি থেকে তার অগোচর বেদনার স্থানটি লুকোতে চায়, যদি স্বেচ্ছায় বিশ্বাস ক'রে উন্মোচিত ক'রে না দেখায়, তবে তা নিয়ে অনুরোধ বা পীড়াপীড়ি করতে, এমন কি নিজে যে একটুও জানে তারও আভাস দিতে বাধে ওর স্বভাব-সুকুমার ভদ্র মনে। তাই—যেন রেণুর সঙ্কোচটা লক্ষ্যই করেনি এমনিভাবে বললে, "জানি বই কি!" তারপর কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলে "মা বাপ না থাকার দুঃখ কত তা আমি কল্পনা করতে পারি ভাই। আর, ঠিক সেজন্যেই হঠাৎ এ

দ্বিধাটা এসেছে। আমার মঙ্গলের জন্যে যিনি সবরকম স্বার্থ-ত্যাগ করতে প্রস্তুত—করেছেনও, তাঁর জন্যে আমি কতটুকু কী করলাম? কখনও করতে পারব কি কিছু?”

“তোর কাছে জ্যাঠামশাই চেয়েছেন প্রতিদান?

“না, কিন্তু —”

“কিন্তু—কী?”

“আমার তো একটা কর্তব্য আছে বাপ-মার ওপর!”

“কর্তব্য বলতে কী বুঝিস তুই?”

“যাতে সুখী হন, যা করলে তাঁদের ভালো লাগে, সন্তুষ্টি হয়—আমার কাছে যা চান তাঁরা—”

“বেশ তো, আমিও তো তা-ই বলছি। তোর কাছে যা’ চান, দে তাঁদের। তোর মঙ্গলের জন্যে যাঁরা নিজেদের সব রকম স্বার্থকে ত্যাগ করেছেন বলছিস, তাঁদের সুখী করবার জন্যে, তাঁদের পরে তোর কর্তব্য পালনের জন্যে আঁকড়ে ধর সেই মঙ্গলকেই—কোনো লোভেই কখনও অমঙ্গলের পথে যাসনে। তবেই হবে সত্যিকার প্রতিদান দেওয়া—যদি প্রতিদানই দিতে চাস।”

সুপ্রিয়া কি বলতে যাবে, রেণু থামিয়ে দিয়ে বললে, “আমি জানি তুই কী বলতে চাস। কিন্তু মনে রাখিস সু, সব বাপ-মাও একরকম নয়, সবাই সন্তানের কাছে এক জিনিষ চায়ও না। যদি কপালগুণে এমন দুর্লভ বাপই পেয়েছিস যিনি তোর কাছে সেবা-শুশ্রূষা, ধন-দৌলত, সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছুই কামনা করেন না—যিনি শুধু চান যে তুই বড় হবি, দেশের ও দশের সেবায় নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে উৎসর্গ ক’রে দিতে শিখবি—”

আবেগে সুপ্রিয়ার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হ’য়ে আসে। কষ্টে বললে, “তুমিই তাঁকে সত্যি চিনেছ রেণুদি। অমি এত কাছে থেকেও—”

রেণু ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে আদর করে বললে, "শুধু কাছে থাকলেই কি চেনা হয় রে? তাছাড়া তুই যে এখনো বড্ড ছেলে-মানুষ ভাই। ঠেকৈ বা ঠ'কে সংসারটাকে যখন আরো চিনবি—"

চোখের জলের ভিতর দিয়ে সুপ্রিয়া হেসে ফেললে।

রেণুও হাসলে, "কিংবা দেখে বা শুনে—সে একই কথা—তখন মানুষকেও একটু বুঝতে শিখবি।"

"মানুষ চেনা কি এতই দুরূহ ব্যাপার রেণুদি?"

রেণু শুধু একটু হাসল।

জাহাজ ছেড়েছে প্রায় ঘণ্টা দুই। বন্দর ওরা অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছে, চারিদিকে এখন কেবল কূলহীন বিরাট জলমরু, ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে আর পড়ছে। যে দু'একটা সামুদ্রিক পাখীর তখনও দেখা মিলছিল জাহাজের আশেপাশে, ক্রমে তারাও এলো অদৃশ্য হয়ে। অস্তসূর্যের রঙীন আভায় পশ্চিম আকাশ আগুনের মতো দীপ্যমান; খণ্ড মেঘের উপর সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আকাশ ও সমুদ্র একসঙ্গে নানাবর্ণের সমাবেশে ঝলমল করছে। যে কোনো মুহূর্তে সূর্য একটি প্রকাণ্ড লাল বলের মত টুপ করে জলের নীচে অদৃশ্য হবে। জাহাজ ও ঢেউয়ের দোলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন সূর্যও সাগরের বুকের উপর তালে তালে নৃত্য করছে, এই জল ছোঁয় এই ওঠে, তারপর আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে নীচে নেমে যায়—হঠাৎ কখন একেবারে ডুবে গেল।

সুপ্রিয়া রুদ্ধনিশ্বাসটি ধীরে ধীরে ত্যাগ ক'রে রেলিংএর কাছ থেকে ফিরে এসে ইজিচেয়ারে বসল। রেণু নিজের চেয়ারখানা আর একটু কাছে সরিয়ে এনে হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা কোলের উপর টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "সমুদ্রে সূর্যাস্ত আগে কখনো দেখিসনি, না?"

"শুধু একবার—গঙ্গাসাগরে।"

দুজনেই চুপ। ডেকের উপর ধীরে ধীরে আঁধার নেমে আসে, কেউ কারো মুখ দেখতে পায় না, তবু নিঃশব্দ অন্ধকারে রেণু সুপ্রিয়ার

মনের বেদনা গভীরভাবে অনুভব করে। এই প্রথম ও বাপ-মা ভাই বোনকে ছেড়ে চলেছে—তা-ও সুদূর বিদেশে, বহুদিনের জন্যে,—আর, কত অল্প বয়সে! একে পিতামাতার স্নেহস্নিগ্ধ সুখ-নীড়ে অতি যত্নে—অতি সাবধানে—অতি-লালিতা কোমলা বাঙালী মেয়ে, তার উপর সুপ্রিয়া নিজে—স্বভাবতই—অতি স্নেহশীলা, সুকুমারী। ওকে সকলের অমতে একরকম জেদ্ ক'রে বিলেতে পাঠানোর জন্যে আত্মীয়-স্বজনের কাছে ওর বাবাকে প্রায় একঘরে হ'তে হয়েছে, তার উপর তিনি অসুস্থ—এইটেই যে সুপ্রিয়ার মনঃকষ্টের আসল কারণ, রেণু তা জানে। কিন্তু এ-ও সে বোঝে যে এসকল ক্ষেত্রে মুখের কথার সান্ত্বনায় বাস্তবিক কোনো ফল হয় না—শান্ত হ'লে, সময়ে আপনিই সকল ঠিক হয়ে যাবে।

একটু পরেই ডেক-এ বিজলি-বাতি জ্ব'লে ওঠে। জাহাজের অফিসারের পোষাক-পরা একটি লোক—আধবয়সী—দূর থেকে খানিকক্ষণ ওদের দুজনকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখে একটু একটু ক'রে কাছে এসে বললে, "আপনারা ডিনারের জন্যে পোষাক পরতে যাবেন না? ঘণ্টা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। ঠিক সাতটায়—"

রেণু সুপ্রিয়ার দিকে তাকাতে ও মাথা নেড়ে বললে, "ডিনারের পোষাক আবার কি? বেশ আছি, একেবারে ঘণ্টা পড়লে উঠব'খন।"

রেণু বললে, "তবু—হাতমুখ ধোওয়া? চোখ দু'টো যে ফুলে লাল হয়ে আছে!"

সুপ্রিয়া চোখ নামিয়ে নিয়ে বললে, "আমার ক্ষিদেই নেই, উঠতেও ইচ্ছে করছে না।"

"তাহ'লে বোস্ এখানে আর একটু। ক্ষিদে নেই—ওটা কোনো কাজের কথা নয়।—তুই থাক্ তাহলে, আমি মিনিট দশেকের মধ্যে আসছি নীচে থেকে।"

সুপ্রিয়া বসে বসে ভাবে ওর বাবার কথা। ওদের তুলে দেবার সময় তিনি নিজেও উঠে এসেছিলেন জাহাজে। ঘুরে-ফিরে কেবিন, বাথরুম, খাবার ঘর সব দেখিয়ে দিয়ে রেণুকে বললেন, "আজ যদি অনুপম থাকত তোমাদের সঙ্গে এই একই জাহাজে, আমি কত নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। হাজার হলেও একটা পুরুষমানুষ সঙ্গে থাকা কম ভরসার কথা নয়।"

"তা হতে পারল কই জ্যাঠামশাই? লোকের কথার জ্বালা—নইলে অনুকে এক ষ্টীমার আগে যেতে হবে কেন?"

"যাহোক, মার্সেল্‌সে তো ও থাকবেই তোমাদের অপেক্ষায়। শুধু এই পথটুকু—তা বন্দোবস্ত সবই খুব ভালো, চিন্তা করবার কিছু নেই, কি বলো রেণু?"

রেণু কোমলস্বরে বললে, "কিচ্ছু না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জ্যাঠামশাই তিনটি বছর তো মোটে?—দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

সুপ্রিয়া কষ্টে চোখের জল চেপে রাখে।

একটু পরে বাবা বললেন তাঁর ভারি তেষ্টা পেয়েছে—এক বোতল সোডা-ওয়াটার পেলে ভালো হ'ত। বয়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে বললে, "সোডা লেমনেডের তো অভাব নেই, কিন্তু সে শুধু যাত্রীদের জন্যে—আপনাকে দিতে পারি না। তবে ওঁরা যদি কেউ খেতে চান—"

রেণু মুখ লাল ক'রে বললে, "হ্যাঁ আমরাই খাবো, নিয়ে এসো তুমি!"

বাবা তাড়াতাড়ি নিষেধ ক'রে লজ্জিত মুখে বললেন, "থাক্ মা থাক্, কাজ কী গণ্ডগোলে? হয়ত সত্যিই হুকুম নেই দেবার, আমি নেমে গিয়েই খাবো'খন।"

তেষ্টা চেপে বসে রইলেন, অথচ সুপ্রিয়া জানে পিপাসা পাওয়া

মাত্র সোডা খাওয়া তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস—রোগের জন্যে জল খাওয়া নিষেধ। বাবার সেই স্নিগ্ধ নম্র মুখখানি মনে পড়ে সুপ্রিয়ার বুকের ভিতরটা ব্যথায় টন্‌টন্‌ ক'রে ওঠে—চোখ দুটি জলে ভ'রে আসে। সে বারবার রুমালে মুছে মুছে চোখ জবাফুল ক'রে তোলে। ডেক-এ তখন আর কেউ ছিল না, থাকলে এত বড় মেয়ের এমন কান্না দেখে আশ্চর্য হ'ত।

সুপ্রিয়া চেয়ারে চোখ বুজে আবার ভাবে—নেমে যাবার আগে বাবা কাছে এসে দাঁড়ালেন, ডাকলেন—"মা!"

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না।

বাবা বললেন, "এবার যাই মা? সময় হয়েছে।"

সুপ্রিয়া প্রণাম ক'রে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। বাবা ডানহাতখানি ওর মাথায় রেখে শান্ত ধীর স্বরে বললেন, "যাচ্ছ পড়তে—তবে এত কান্না কেন মা?"

নেমে গিয়ে জাহাজ-ঘাটার রেলিং ধ'রে এদিক পানে চেয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। সঙ্গে যারা ছিল, বেশ বোঝা গেল তারা মাঝে মাঝে তাড়া দিচ্ছে গাড়িতে উঠে বসবার জন্যে। তিনি তাঁর অভ্যাস মত কোটের পকেটে ডানহাতখানা ঢুকিয়ে কয়েক পা চলেন, আবার থেমে ফিরে ফিরে দেখেন। অবশেষে গাড়িতে উঠতে হ'ল, একটু পরে সবাইকে নিয়ে সেখানা অদৃশ্য হয়ে গেল। —তবু সুপ্রিয়া সেদিক থেকে চোখ ফিরাতে পারে না। মনে হয়, গম্ভীর অথচ স্নেহ-করুণ মুখখানি নিয়ে এখনো তিনি এইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে—কত আশা কত মিনতি সে দৃষ্টিতে!

ওর চোখের জল আরও দ্রুত ঝরে।—এ কোন্‌ যাত্রা, যার সুরুতেই হৃদয়ভরা অজানা বেদনার সাথে এমন মুখোমুখি পরিচয়? কিসের প্রত্যাশায় সে কোথায় চলেছে, কী আছে ওর এই দীর্ঘ

পথের শেষে, কোন্ সার্থকতা? আজন্মের স্নেহনীড়, পরিচিত প্রিয় মুখ, শান্তিময় স্বচ্ছন্দ জীবনখানি ক্রমে ক্রমে পিছনে—আরো, আরো পিছনে ফেলে অনির্দেশ্য এ কার উদ্দেশে ভেসে চলেছে—কোন্ তীরে গিয়ে ভিড়বে ওর জীবন তরী?

"I say, dearie—"

সুপ্রিয়া চম্‌কে উঠে বসল। দেখে—টলতে টলতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে এক শ্বেতাঙ্গ অফিসার, হাতে একটা পাইপ, চোখ ঢুলু ঢুলু ঈষৎ রাঙা। সুপ্রিয়া ভাবলে—কাপ্তেন সাহেব। উঠে দাঁড়ালে; ততক্ষণ লোকটা প্রায় ওর ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। মুখের অতি সন্নিকটে মুখ এনে বলছে, "ডিনারে যাওনি যে? ডার্লিং—"

ছিট্‌কে স'রে গিয়ে প্রমত্তের উদ্যত চুম্বনের থেকে সুপ্রিয়া নিজেকে বাঁচালে। এ কী ব্যাপার—কী এসব? ভয়ে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে, সমস্ত শরীর কাঁপে থরথর ক'রে—এদিকে লোকটা আবার আসে, জড়িতস্বরে কি সব বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে ওকে ধরতে যায়। সুপ্রিয়া নড়তে পারে না, সম্বিৎহারা অবোধের মত চেয়ে থাকে……

"কী রে, কী হয়েছে সু?—I say, what nonsense is all this?"

সুপ্রিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে রেণুর বুকের উপর পড়ে। একহাত ওর অবসন্ন দেহখানির চারিদিকে লতিয়ে অন্যহাতে লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রুক্ষ-স্বরে রেণু বললে, "কেন তুমি ভয় দেখাচ্ছ ওকে?"

"ভয়? না। দেখলুম একা—lonely—ডিনারে যায়নি—ডাকতে—ain't she a pretty one? Don't be fluttered, me bird! meant no 'arm."

"ফের যদি ও রকম করো তুমি, রিপোর্ট ক'রে দেব কিন্তু

কাপ্তেনকে। আয়রে সু, চুপ কর্, আর কাঁদিসনে। মাতাল যে, টের পাসনি? তা না হ'লে অতটা সাহস করে? সন্ধ্যার সময় ডেক-এ একলা থাকা মোটেই সুবিধের নয়—মাতাল ছাড়াও আরো দুষ্টু লোক আছে। চল্ নীচে, মুখটা একটু ধুয়ে নিবি।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রেণু আবার বললে, "মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল—আসতেই তো টের পেলাম। তুই কী ব'লে সোজা নেমে না এসে দাঁড়িয়ে থাকতে গেলি ওর সামনে?"

"মদের গন্ধ? কই আমি তো কিছু টের পাইনি রেণুদি? মদের গন্ধ আবার কি রকম?"

রেণু নিশ্বাস ফেলে বললে, "বাস্' এতবড় মেয়ে, মদের গন্ধ কেমন তাও জানে না! শুঁড়ির দোকানের পাশ দিয়ে যাসনি কখনও? মাতাল ট'লে ট'লে হাঁটে, তা জানিস? না তাও শিখিয়ে দিতে হবে?—নাঃ, তোকে যতটা ভেবেছিলাম, দেখছি তার চেয়েও আনাড়ি তুই। আর, হবে না কেন? অসূর্যম্পশ্যা হয়ে থাকার এই তো পরিণাম! দিন রাত বই মুখে ক'রে ঘাড় গুঁজে ঘরে বসে থাকো! বেশ হয়েছে।"

"কী যে বলো তুমি! অসূর্যম্পশ্যা আবার কবে ছিলাম? ছোটবেলা থেকে স্কুল-কলেজেই তো দিনের অর্ধেকটা কেটে যেত!"

"ওঃ তবে তো একেবারে কেল্লা ফতে ক'রে রেখেছ! গাড়ি ক'রে যেতে, গাড়ি ক'রে ফিরতে, যেতে আসতে দুধারের জানালা দিয়ে পৃথিবীর যতটুকু দেখতে পেতে তাইতেই নিজেকে একেবারে একটা amazon—চিত্রাঙ্গদা-বিশেষ ঠাউরে রেখেছিলে নয়? বীরপণা দেখলাম কিনা সব!—অসূর্যম্পশ্যা নয় তো কী? একদিনও তুই হেঁটে গিয়েছিস স্কুলে? জীবনটাকে—এই বাস্তব জগতটাকে কখনো ভালো ক'রে চেয়ে দেখেছিস চোখ মেলে? তোর—স্কুল,

তোর কলেজ—পাঁচিলঘেরা ছোট্ট একরত্তি জায়গা, সেখানেও তুই কারো সঙ্গে মিশতিস না, খেলা করতিস না, পারতপক্ষে নাকি কথাও বলতিস না—কেমন, না? সবই জানি বাপু, আমার কাছে লুকোবি কী? নইলে তোর বয়সী, তোর থেকেও ছোট অনেক মেয়ে আছে যারা ঢের বেশি জানে শোনে, যাদের মাতাল কি চীজ চিনিয়ে দিতে হয় না, অপরিচিত পুরুষ মুখ বাড়িয়ে চুমো খেতে এলে যারা ভয়ে জমে পাথর হয়ে না গিয়ে ঠাস্ করে গালে চড় বসিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে, আর কিছু না হোক অন্তত দৌড়ে পালিয়ে যেতে জানে—"

"আমি কি ক'রে জানব যে একজন ভদ্রলোক, জাহাজের অফিসার—ইংরেজ—"

"যা, যাঃ—আর বলিসনে। জানিস না সেটাই স্বীকার কর। ভারি ইংরেজ, ভারি তো জাহাজের অফিসার! পদগৌরব আর সাদা চামড়ায় মাতলামি ঢাকা যায় নাকি তার কাছে যার চিনবার মত চোখ আছে? সরলভাবে স্বীকার কর যে পুঁথিপড়া বিদ্যে সংসারের ধাক্কা সামলে চলবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তার জন্যে আরও কিছু চাই।"

"অর্থাৎ—?"

"এক কথায় বলা শক্ত। ক্রমে নিজেই বুঝতে পারবি। কেবল চোখ-কান দুটোই একটু খুলে রাখিস, সারাক্ষণ অত হাওয়ায় চড়ে থাকিস না। স্বপ্ন-জগৎ থেকে মাঝে মাঝে নেমে এসে বাস্তবকে সাদা চোখে দেখতে আর চিনতে চেষ্টা করিস।"

সুপ্রিয়া হেসে ফেললে, "তুমিই বা কি করে জানলে আমি সারাক্ষণ বসে বসে স্বপ্ন দেখি?"

রেণু গম্ভীরভাবে বললে, "জানতে খুব বেশি গবেষণার দরকার করে না। আর, ভুলে যাস কেন যে, আমি তোকে ছোট থেকে দেখছি?"

"তবু—বুঝিয়ে দাও একটু।"

"কিন্তু খেতে যেতে হবে না? ঘণ্টা তো অনেকক্ষণ পড়ে গেছে।"

"তুমি যাও ভাই, আমার একটুও ইচ্ছে করছে না।"

"তবে এক কাজ করা যাক, ঐ বেল্‌টা টিপে দে—জোরে, আরো—ব্যস্‌, ওতেই হবে।"

বয় ছুটে কেবিনের দোরের কাছে আসতেই রেণু মুখ বা'র ক'রে বললে, "আমাদের জন্যে খাবার কিছু আজ এখানেই নিয়ে এসো।"

"আমি তো কিচ্ছু খাবো না রেণুদি—"

"খাবি বই কি—অল্প একটু। খালি পেটে সী-সিক্‌নেস হয়, কাল সকালে মজাটা টের পাবি।"

"যাও, ভয় দেখিও না।"

"সত্যি বলছি, অন্তত একটু মাছ খা।"

খাওয়া-দাওয়ার পরে রেণু বললে, "চল্‌ এবার ডেক-এ যাই।"

উপরে উঠে দেখে মহিলারা অনেকে ইতিমধ্যে আসর জমিয়ে বসেছেন। জাহাজে ভারতীয় মেয়ে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। এবার আসতে আসতে দেখা গেল, পুরুষদের মধ্যেও ভারত-প্রত্যাগত ইউরোপীয়—ইংরেজ ও স্কচ—যাত্রীর সংখ্যাই বেশি। মাত্র জনপাঁচেক দেশীয় ছাত্র—তাও বাঙালী কেউ নয়।

পুরুষেরা একে একে স্মোকিং-রুম থেকে বাইরে ডেক-এ এসে জুটতে লাগল। প্রায় সবারই পরণে ডিনারের পোষাক, কেবল ভারতীয় ছাত্রদের ছাড়া।

একটু পরে যাত্রীদের ভিতর কিছু চাঞ্চল্য দেখা গেল, দু'একজন যুবক ব্যস্ত হয়ে কোথায় যেন গেল। মিনিট দুই পরেই জনকয়েক বয়

এসে ডেকের একধার থেকে চেয়ার ইত্যাদি সরিয়ে অন্যদিকে গাদা করতে লাগল।

সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপার কি রেণুদি ?"

রেণু সেদিকে চেয়ে চেয়ে বললে, "কি জানি, কিছু একটা হবে বোধ হয়, দেখা যাক।"

"না বাপু, চলো মানে মানে স'রে পড়ি কেউ কিছু বলবার আগেই।"

রেণু মুখ ফিরিয়ে বললে, "তোর সব কিছুতে এত ভয় কেন রে? ওরা যেমন আমরাও তেমনি ফার্স্ট-ক্লাসেরই যাত্রী।"

"দেখছ না আমাদের লক্ষ্য ক'রে কী যেন বলাবলি করছে ?"

"বলতে দে না।"

রেণুর মুখের কথা ফুরোতে একটি ভদ্রলোক অগ্রসর হয়ে এসে বললেন, "আপনারা কি আমাদের সঙ্গে নাচে যোগ দেবেন ?"

"দুঃখিত—"

"তবে যদি দয়া ক'রে অনুমতি দেন আপনাদের চেয়ার দু'খানি একটু ওধারে সরিয়ে দেব—ডেকের এদিকে সবটাই আমাদের চাই কি না।"

"নিশ্চয়, এই নিন।"

"ধন্যবাদ ; না না, অতদূরে যেতে হবে না। এই—এতেই হবে, এখানে বসুন আপনারা। যাত্রী খুব বেশি নেই দেখছেন তো, মাত্র জনকয়েক নাচবে।"

লোকটি চলে যেতে সুপ্রিয়া বললে, "বেশ ভদ্র তো রেণুদি! মোটেই চৌরঙ্গীর 'সাহেব'দের মতো নয়।"

"না, কিন্তু কারণ আছে। ওর পোষাক দেখে মনে হচ্ছে জাহাজেরই কেউ—বোধ হয় কোনো কর্মচারী। ভারতের জল হাওয়া গায়ে না লাগলে ওরা খুব বেশি বিগড়ায় না—অন্তত স্বদেশের

আদব-কায়দা আর ভদ্রতাটুকু বজায় রেখে চলতে জানে। যত মুস্কিল তো ও-ই ভারত-ফেরতাদের নিয়েই!"

সুপ্রিয়া হেসে বললে, "যেমন ওদেরও মুস্কিল বিলেত-ফেরতাদের নিয়ে?"

রেণু চোখ তুলে বললে, "কে বললে? বরং বিলেত-ফেরতারাই—"

"কী?"

"আরো দাসানুদাস ওদের! আমাদের কাছে তো সাহেবেরও বাপ-দাদা—"

"যাঃ—আমি কি তাদের কথাই বলছি? নব জাগরণের বান ডেকেছিল যাঁদের বুকের ভিতর প্রথম, দেশের স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা সর্বস্ব পণ করেছিলেন—অরবিন্দ, রবীন্দ্র, গান্ধী, দেশবন্ধু—"

রেণু একটু আশ্চর্য হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকাল। সুপ্রিয়ার স্বরে এক অশ্রুতপূর্ব গভীরতা!

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে রেণু জিজ্ঞাসা করলে, "তুই কি এসব বিষয়ে ভাবিস নাকি?"

"কী সব?"

"দেশের—"

সুপ্রিয়া লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বললে, "ভাবতে হবে কেন? এ কথা আজকাল কে না জানে, বলো? যাদের নাম সকলের মুখে মুখে, হঠাৎ মনে হ'ল তাঁরা সকলেই বিলেত-ফেরতা। তাই বলছিলাম—"

"হুঁ!"

"জানি, আরো অনেক আছেন—বিলেত-ফেরতা—যাঁদের কথা না তোলাই ভালো, তাঁদের সংখ্যাই বেশি; এও জানি, তাঁরা না থাকলে ইংরেজের ভারত-শাসন অচল—"

রেণু বাধা দিয়ে বললে, "ওরে, থাম্ থাম্!" এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, "ফ্যাসাদ বাধাতে চাস নাকি? যে-সে কথা যেখানে-সেখানে এমনভাবে বলে কখনও?"

স্থপ্রিয়া একটু উত্তেজিতভাবে বললে, "একটা সামান্য সত্যি কথাও বলে না?"

"সত্যি?" রেণু পূর্ণদৃষ্টি ওর মুখের 'পরে ন্যস্ত ক'রে বললে, "যদি সত্যি কথা ব'লেই মনে করিস তবে জেনে রাখ্—সত্যকে এমন ক'রে বাইরে পথে-ঘাটে টেনে টেনে বে-আব্রু করতে নেই।"

"বাঃ—"

"সত্যের স্থান কর্মে; কথায় নয়—উচ্ছ্বাসেও নয়, নিরালায় নিজের বুকে। কিন্তু থাক, বক্তৃতা আর না। শুধু জানতে চাই, এ বিষয়ে তোকে এত উৎসাহ দিলে কে? তোর মতো কেতাব-কীট কুনো মেয়েকে বাইরের কেউ না ভজালে—"

স্থপ্রিয়া হেসে ফেললে, "আমার সম্বন্ধে সবদিকেই তোমার ধারণা দেখছি যা উঁচু!"

"ঠাট্টা না। বল্ কার কাছে—"

"কী?"

"কেন চালাকি করছিস স্থ? আচ্ছা বেশ, না বলতে চাস তো বলে কাজ নেই। কিন্তু আমি জানি।"

"ভজানো যাকে বলছ, তিনি সে-সব কিছুই করেন নি।"

"না?"

"উৎসাহ দিয়ে থাকতে পারেন।"

"তার বেশি?"

"না। কারণ সেটা তাঁর আদর্শ-বিরুদ্ধ। দিতে চায় যে, সে

স্বেচ্ছায় দেবে, কারোর প্রভাবে প'ড়ে নয়, এইটেই তাঁর মত—সে কি তুমি নিজেই জানো না? দেশের স্বাধীনতা চান বলেই তো ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় এত বিশ্বাস করেন তিনি।"

রেণু শুধু হাসে। সুপ্রিয়া গ্রাহ্য না ক'রে বললে, "যত খুসি হাসতে পারো, কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলেছি।"

"অর্থাৎ—ওর কার্য-কলাপ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের ভাবনা জেনে, আর শুনে?"

"হাঁ। একে ভজানো বলতে চাও, বলো। কিন্তু এর বেশি তিনি করেননি, অন্তত এখন পর্যন্ত না। হয়ত জানেনও না—"

"বলে ফেল্ না বাপু, এত সঙ্কোচ কিসের? কী জানে না?"

"আমার মতামত।"

"সত্যি জানে না?"

"না।"

"কেন?

"বলিনি, অপেক্ষা করছিলাম।"

"কিসের?" বলেই রেণু অনুতপ্ত হয়, সুপ্রিয়া রক্তিম মুখে চুপ ক'রে থাকে।

রেণুও খানিক চুপ ক'রে থেকে বললে, "কিছু মনে করিসনে।"

সুপ্রিয়া জোর ক'রে লজ্জা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে, "রেণুদি, পরে জেনেছি কেন তিনি বিয়ে করতে চাননি।"

"তোর গুরু-ভার পাছে সুরুতেই দুঃসহ হয়?"

"যাও, ঠাট্টা রাখো। তোমরা তাঁকে খামখেয়ালি ভাবো, কিন্তু ভেতরের কথা আমি জানি ব'লেই—"

"সুপ্রিয়া! তুই যে আমায় ভাবিয়ে তুললি!"

"কিসের এত ভাবনা?"

"অনেক কিছুর, কিন্তু এদিকে এরা যে নাচ সুরু করলে! উঠে আয় ওই ডেক-এ। ··· বল্‌তো এবার।"

"কি জানতে চাও?"

"ভেতরের কথাটা কী বল্‌ দেখি? কার প্রেমে—"

"তবে চললাম। একটু কি সিরিয়াস্‌ হতে পারো না?"

"এই—এবার হ'ল তো? বল্‌ এখন।"

তবু সুপ্রিয়া রুষ্টমুখে চুপ ক'রে বসে থাকে।

"আরে, ভয় পেয়েছিলাম, তোকে শেষে—"

"আবার?"

"না না, রাগ করিসনে লক্ষী বোন! কিন্তু তুইও যেমন! কী যে রহস্যের আভাস দিচ্ছিলি!"

"উনি যে ব্রত নিয়েছেন!"

"ব্রত?—অনু? কিসের? কী ব্রত?"

"আস্তে, আস্তে! আমি তো ওঁর সব কথাই জানি নে, তবে জীবনে যা নিজের সত্য ব'লে জানেন তারই জন্যে সর্বস্ব উৎসর্গ করবেন আর কোনোদিকে না তাকিয়ে, এটুকু বুঝেছি।"

"সেই সত্যটা কী শুনি?"

"দেশের সেবা।"

"খুলে বল্‌!"

"আর তো কিছু বলবার নেই।"

"কি সাংঘাতিক কাজের ভার নিয়েছে অনু, কোন্‌ বিপদের বোঝা ঘাড়ে—"

সুপ্রিয়া বাধা দিয়ে বললে, "তুমি কী ভাবছ বলো তো! বিপদ কিসের?"

"তুই যে বলছিস কি নাকি ব্রত নিয়েছে—সর্বস্ব পণ ক'রে?"

"ব্রত নিয়েছেন—ভবিষ্যত জীবনটা স্বদেশের সেবায় নিয়োগ করবেন, সাধারণ লোকের মতো কেবল টাকা রোজগার আর ঘর-গেরস্থালি নিয়েই থাকবেন না, তার জন্যে গোপনে কী একটা সাধনাও না কি করেন। বিবেকানন্দের বই প'ড়ে তার নির্দেশ পান। এই মাত্র। তুমি তো জানো বিবেকানন্দকেই তিনি আদর্শ বলে জানেন ছোটবেলা থেকে ?"

"তা জানি।—শুধু এই ?"

"আর কী ?"

"বাঁচলাম। ভেবেছিলাম বুঝি তুই নিদারুণ কিছু একটা বলছিস।"

"অর্থাৎ ?"

"ওই যে কি না কি বিপ্লব—"

সুপ্রিয়া আকাশ থেকে পড়লো, "ঐ জন্যেই এত ভয় পাচ্ছিলে ? কিন্তু সে-সব সত্যিই আছে নাকি ভাই আমাদের দেশে ?"

"সরকার তো তাই বলেন। থাক বা না থাক, বছর বছর কত লোক জেলে যাচ্ছে সে অপরাধে !"

"সে কি তারা বিপ্লবী বলে ? গান্ধীজিকে তুমি বিপ্লবী বলবে ? এদেশে নিছক পরিবার-প্রতিপালনের বাইরে কিছু করতে গেলেই, কারো জীবনটা একটু অসাধারণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা একটু উঁচু হলেই চারদিক থেকে বাধা আসে ছেয়ে।"

"সে বাধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণাই যদি অমুর জীবনের ব্রত হয়, আমার সম্পূর্ণ সায় আছে।"

"কিন্তু সে পথেও কি অদৃষ্টে জেল-ভোগ নেই ?"

"থাকবে না কেন ? এ-দেশে জেলে যাবার পথ তো শক্ত নয়, বরং চিরমুক্ত, তা কে না জানে ? কিন্তু দেশের অজ্ঞান, অশিক্ষা,

কুসংস্কার ইত্যাদি দূর করতে গিয়ে জেলে যেতে হ'লেও দুঃখ কী? না হয় জীবনটাই গেল, কিন্তু কর্ম ব্যর্থ যাবার নয়।"

"রেণুদি, 'পণ্ডিতমশাই'-এর বৃন্দাবনের ব্যাপার মনে পড়ে?"

"পড়ে বই কি।"

"বিপ্লব কী জানি না ভাই, সত্যি সে প্রচেষ্টা কেউ করে কি না তাও জানিনে। কিন্তু জানি বৃন্দাবনের মতো লোক এ দেশে বেঁচে থাকতে পায় না।"

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। ডেকের ওধারটা তখন গ্রামোফোনের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে 'বল' নাচে সরগরম।

হঠাৎ রেণু জিজ্ঞাসা করে, "অনুপম কী সাধনা করে বলছিলি?"

সুপ্রিয়া স-সঙ্কোচে জবাব দেয়, "তা কি ক'রে জানব?"

"মানে, জপ-তপ কিছু?"

"স্বামীজির বইগুলো আর গীতাখানা তো রোজই পড়তে দেখেছি। কিন্তু তুমি তাঁকে বলে দিও না যে আমি বলেছি এসব।"

রেণু হেসে বললে, "ভয় নেই। ওবই পড়ার অভ্যেস ওর ছোটবেলা থেকেই, তা কি আমি জানি না? কিন্তু জপ-তপ আর গীতাপাঠ কি মানুষকে বড় কাজের জন্যে তৈরি ক'রে তোলে নাকি?"

সুপ্রিয়া অবাক হয়ে বললে, "তুমি যে ঘোর নাস্তিক দেখছি!"

"নাস্তিক কিসে? গীতাপাঠের মাহাত্ম্য স্বীকার করি না ব'লে?"

কোনো উত্তর নেই।

রেণু হাসি চেপে বললে, "অমনি রাগ হ'ল?"

"রাগ নয়, এসব জিনিষের এধরণের আলোচনায় বাস্তবিক মনে কষ্ট পাই। কী রকম একটা অবজ্ঞা যেন তোমার কথার সুরে!"

"না রে, অবজ্ঞা নয়—কিংবা হবেও বা—একটু, কিন্তু—"

"কী সে ?"

"স্বদেশের সেবায় স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী হওয়া।"

"স্বামী—মানে ?" রেণু পূর্ণ দৃষ্টি ওর মুখের 'পরে স্থির ক'রে ধরলে—সার্চ-লাইট ফেলে ভিতরটা পর্যন্ত দেখে নিতে চায়।

সুপ্রিয়া আরক্তমুখে বললে, "যিনিই হোন।"

রেণু হাসলে।

"সতী, সাবিত্রী ?"—রেণুর চোখ তেমনি ব্যঙ্গ-উজ্জ্বল।

সুপ্রিয়া মুখ নীচু ক'রে ধীরে ধীরে বলে, "নয় কেন ? তাঁর যা ধর্ম আমারও তা-ই। নিজেকে দেওয়া—বলতে বাধে—কিন্তু—"

রেণু হেসে বলে, "নিজেকে মিশিয়ে দিবি তাঁর মধ্যে, কোথাও কোনো স্বাতন্ত্র্য রাখবি না, যা তাঁর ব্রত তা তোরও—এইসব, না ?... অনুপমের শিক্ষা !"

সুপ্রিয়া এবার যেন জোর পেয়ে বললে, "নিশ্চয়।"

"তাই একটু আগে বলছিলাম তুই নিজেকে চিনিসনি এখনো।"

"কেন এমন ক'রে বল্‌ছ রেণুদি ?"

"রাগ করিসনে ভাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যা তোর নিজের পক্ষে সত্য নয়, তা হ'তেই পারে না তোর ব্রত। যা তোরও সত্য তোর স্বামীরও সত্য, কেবল তাতেই তোর অন্তর সায় দিতে পারবে, সেটিকে নিজের ব'লে গ্রহণ করতে পারবে, সেখানেই তিলে তিলে নিজেকে দিয়ে সুখী হ'বি। কিন্তু সে আত্মদান তো মানুষের কাছে নয়।"

"যাকে ভালবাসে কেউ, তার জন্যে সব ত্যাগ ক'রে সে কি সুখী হয় না ?"

"স—ব ? এমন কি নিজের অন্তরতম আদর্শও—নিজের সত্যও ? তেমন ক'রে নিজেকে বঞ্চিত করতে হ'লে তুই সুখী হবি ?"

"কেন হব না?"

"নিজেকে ভেঙে-চুরে, সব সার্থকতায় জলাঞ্জলি দিয়ে—"

সুপ্রিয়া অধীর হ'য়ে বললে, "তুমি আমার কথা বুঝতে পারোনি মোটেই। প্রিয়ের জন্যে আত্মদানেই আমার সার্থকতা, সে-ই আমার সত্য। তিনি চান সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর মতো থাকতে। আমি তাঁর সহধর্মিণী, তাঁর সহায় হব, হব শক্তি—যেমন ছিল শান্তি জীবানন্দের। স্বদেশসেবাই যখন তাঁর ব্রত, তখন আমারও।"

রেণু নিশ্বাস ফেলে বললে, "ভাগ্যবান পুরুষ!—নিজেকে যদি ঠিক বুঝে থাকিস, তবে ওতে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না নিশ্চয় জানিস।"

"কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার যেন কোথায় একটা সন্দেহ আছে। বলবে খুলে?"

রেণু একটুখানি ভেবে বললে, "না, থাক। আমারও তো ভুল হ'য়ে থাকতে পারে। চল্ যাওয়া যাক। রাত কম হয়নি।"

ওরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই নৃত্যোৎসাহীদের একজন এসে বললে, "অনুগ্রহ ক'রে একবার আসবেন এদিকে?"

দু'খানি প্লেট সামনে ধ'রে দিয়ে বললে, "আজকের উৎসবে আমাদের সঙ্গে একটু আনন্দ করুন। অনেকদিন পরে দেশে ফিরছি, স্বদেশমুখী এই প্রথম রাতটা আজ আমরা জেগে কাটাবো। আপনারা কিছুই কি পান করবেন না?—আচ্ছা, তাহ'লে এই আর এক প্লেট আইসক্রীম—তা-ও না? বেশ, জোর করব না। বসুন না এখানে। এত শীগ্‌গির বিদায় নেবেন?"·····

নাচ চলতে লাগল।

সকালে উঠে সুপ্রিয়া দেখে বিছানায় রেণু নেই। এত ভোরে কোথায় গেল ভাবতে ভাবতে সে স্নানের ঘরের দিকে চলল। ওকে দেখে জাহাজের স্টুয়ার্ডেস্ প্রাতঃসম্ভাষণ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলে স্নানের জল ঠিক ক'রে দেবে কি না, আর কী চাই, বেশি দেরি হ'লে স্নানের ঘর খালি পাওয়া না যেতে পারে। ইংরেজ-গিন্নিরা উঠলে তাঁদের আর খোকা খুকিদের স্নানের জন্যে সব ঘরগুলো আটকে যাবে, তার চাইতে এখনই—টব পরিষ্কার থাকতে থাকতে—

সুপ্রিয়া খুসী হ'য়ে বললে, "বেশ তো, তুমি জল তৈরি ক'রে রাখো। এখনি আসছি।"

"যখন যা দরকার, বলবেন। আমি আছি আপনাদের জন্যেই।"

"বলব বৈ কি।"

"ব্রেকফাস্ট সাতটায়। আর, এই যে চা-ও এসেছে আপনাদের, গরম গরম খেয়ে নিন আগে।"

বয় দুজনের আন্দাজ চা, টোস্ট আর একটা ক'রে আপেল রেখে চ'লে গেল।

সুপ্রিয়া স্টুয়ার্ডেস্‌কে বললে, "আমার বোনকে ডেকে দিতে পারো?"

রেণু ঘরে ঢুকেই বললে, "কি, ঘুম ভেঙেছে?"

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"ওপরে—ডেক-এ। যা সূর্যোদয়টা হ'ল—glorious!"

"আমায় জাগালে না কেন? দেখবার ইচ্ছা ছিল।"

"কাল অত রাত ক'রে শুয়ে সকালে যে বেহুঁসের মত ঘুমোচ্ছিলি। দেখে মায়া হ'ল, তাই আর ওঠালুম না। সূর্য তো উদয় হবে রোজই, ভয় কি আর তোর।"

"না, কিছু ভয় নেই। কিন্তু শুনেছ, স্টুয়ার্ডেস্ ব'লে গেছে শিগ্‌গির স্নান সেরে নিতে। সাতটায় ব্রেকফাস্ট স্বরু। আচ্ছা, ভালো কথা, এটা তবে কী—এই চা টোস্ট—?"

"এটা 'বেড্-টি'। শুয়ে শুয়ে খেয়ে নেয়। খেয়ে চাঙ্গা হ'য়ে তবে বিছানা থেকে ওঠে, তার আগে নয়।"

"তাই নাকি? নিজেদের বাড়িতেও কি ওরা এতটা নবাবী করতে পারে—সত্যি?"

"তা জানিনে, তবে স্টীমারে করে বৈ কি।"

ব্রেকফাস্টের পর স্বপ্রিয়া চিঠি লিখতে বসল; প্রতিদিনকার ডায়েরী লিখে প্রতি বন্দরে বাবার নামে পোস্ট করবে এটা আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিল।

রেণু পাশে একটা সোফায় চুপ ক'রে বসে; মনে হয় যেন সমুদ্র দেখছে, কিন্তু আসলে ভাবছে কাল রাত্রের কথা।

এর আগে, দেশে থাকতে স্বপ্রিয়াকে সে এতটা চিনতে পারেনি। উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ঘরের আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে সাধারণত যেমন হ'য়ে থাকে, তার বেশি কোনো মূল্য রেণু ওকে দেয়নি। কিন্তু এখন সে ভাবে, স্বপ্রিয়ার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যতই বড় হবে, বাইরের সঙ্গে সংঘাতে ওর অন্তরের এ বৈশিষ্ট্য ততই স্পষ্ট হবে, নিজের কাছে নিজে সে ধরা প'ড়ে যাবে। এখনও স্বপ্রিয়া নিতান্ত অনভিজ্ঞ, কিন্তু রেণু বুঝেছে ভিতরে ভিতরে ও দারুণ আদর্শবাদী,

স্বাধীনচেতা। ওর মধ্যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে যা সম্পূর্ণ আপন অনুপ্রেরণায় নিজেকে ভাঙে গড়ে, কারো মতের অপেক্ষা রাখে না। যাদের আদর্শ ওর আদর্শের সঙ্গে খাপ খায়, যাদের মতবাদ, জীবনের ধারা সে তার নিত্য নবভাবে পরিস্ফুট চেতনার আলোকে যাচাই করে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে, কেবল তাদেরই হয়ত সহ্য করতে পারবে, অন্যথা কাউকে ত্যাগ করতে ওর এতটুকু বাধবে না।

রেণু মনে মনে বললে—এখন বুঝতে পারছি, কেন জ্যাঠামশাই বিয়ের জন্যে জোর করতে চাননি আর। নিজের মেয়েকে উনি অন্তত আমার চেয়ে ভালো বোঝেন।—ওর বৈশিষ্ট্য নিয়ে ও জাতে-ঠেলা, চির-দুঃখী, একক জীবন যাপন করবে, তবু হয়ত সংসারের ভালো আর মন্দ দুটোকেই সহজভাবে মেনে নিয়ে জীবনের কারবার চালাতে চাইবে না। এমনভাবে গ'ড়ে উঠতে পারল আরো এ'জন্যে যে, যাদের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে পারে, তেমন কারো সংস্পর্শেও এখন পর্যন্ত আসেনি। সমস্ত কুমারী-জীবনটা কাটিয়েছে একটা সহজ সামঞ্জস্যের মধ্যে—যাদের সবচেয়ে ভালবাসে আর শ্রদ্ধা করে তাদেরই সাহচর্যে, যাদের মধ্যে আজ অবধি ও কোনো স্খলন দেখেনি। উন্নতমনা অনুপম ওর যৌবনের আদর্শ, ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারী, চিরকাল পড়াশুনায় ভক্ত উমাশঙ্কর ওর পিতা, ওর আশ্রয়—ছোট থেকে যিনি ওকে নিজের উদার, বিশাল ব্যক্তিত্বের আড়ালে লালন আর রক্ষা ক'রে এসেছেন সংসারের সকল বিক্ষোভ আর গ্লানি থেকে। জীবনের রুক্ষ, অসুন্দর দিকটার সঙ্গে ভালো ক'রে একবারও পরিচিত হ'তে দেননি ওকে। ওর নিজের জন্যে নিজেকে কখনো কিছু করতেও হয়নি। ও কেবল ভেবেছে আর পড়েছে।

মাকে দেখেছে ও নম্র প্রকৃতি, স্নেহশীলা, পতি-অনুগামিনী। কিন্তু তিনি সেই মুষ্টিমেয় নারীদের একজন, যাদের স্বামীভাগ্য সত্যই

অসাধারণ। মেয়েদের জীবনে যা সত্যিকার অশান্তি ও অপমান আনে, বিরোধ ও বিতৃষ্ণার সূত্রপাত হয় যাতে, বিজয়া দেবীর জীবনে মুহূর্তের জন্যেও সে দুঃখের কারণ ঘটেছে ব'লে কেউ জানে না। ছোট থেকে সুপ্রিয়া পিতাকে জানে দৃঢ়চিত্ত একনিষ্ঠ স্বামী হিসেবে, কারণ ওর মার প্রধান গর্ব আর সুখ যেখানে, সেটা তিনি নিজের মেয়ের কাছেও গোপন করতেন না। তাই সুপ্রিয়ার স্থির বিশ্বাস, আদর্শ-পুরুষ তিনিই যিনি একনিষ্ঠ। সীতার প্রতি রামের আচরণের শত ত্রুটিসত্ত্বেও তাই সীতাপতির উপর সুপ্রিয়ার অসাধারণ ভক্তি।

ভাইবোনেরা সবাই ওর অনেক ছোট। সমবয়সী কেউ ছিল না বাড়িতে। এক রেণু ছাড়া—যদিও রেণু বয়সে ওর অনেক বড়—সুপ্রিয়া কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে মন খুলে কথাও বলেনি। এমনিতেই ওর সখীর সংখ্যা বিরল, কারণ ওকে কেউ বুঝত না, সেও ওদের বুঝতে পারত না। তার উপর উমাশঙ্কর ওর স্বভাবটা সকলের সঙ্গে সাধারণভাবে মিলে-মিশে গ'ড়ে উঠবার সুযোগই দেননি। রেণুর মনে পড়ে, একবার ওদের নিমন্ত্রণ ছিল কোনো আত্মীয় বাড়িতে। তাদেরই একটি ছেলের সুপ্রিয়াকে ভারি পছন্দ হয়, সেকথা শ্বশুর-বাড়ি-প্রত্যাগত বড়বোনকে কোনো এক সুযোগে জানিয়ে রাখে। ভ্রাতৃ-গর্বে মেয়েটি ভাবলে বুঝি সুপ্রিয়া ওদের ঘরের বৌ হ'য়েই গেছে। নিঃসঙ্কোচে ওর হাত পা, চুল, নাক-মুখ যাচাই ক'রে দেখতে বসল। অন্য মেয়েরা টিপে-টিপে হাসছে দেখে সুপ্রিয়া অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগল ব্যাপারখানা কী। চুল খুলে দেখাতে বললে সে অসঙ্কোচে দেখতে দেয়, হাত পা ধ'রে পরখ করতে গেলে এতটুকু আপত্তি করে না।

শেষটা বয়স জিজ্ঞাসা করতে পরিষ্কার ব'লে দিলে, "সতেরো।"

শুনে ছেলের দিদিমা-সম্পর্কীয়াকে একজন চট ক'রে ব'লে বসলেন,

"ওবাবা, কনের তো দেখছি বয়সের গাছ-পাথর নেই! আমাদের রাজুকে যে কোলে ক'রে বেড়াতে পারবে!"

শুনে মেয়েদের মধ্যে হাসির হিল্লোল ব'য়ে গেল। রেণুর মুখটা লাল হ'য়ে উঠল।

দিদিমা সকলের হাসিতে উৎসাহিতা হ'য়ে আবার বললেন, "ওগো কনে, কোথায় কখন্ এতটা মন-জানাজানি হ'ল তোমাদের?"

সুপ্রিয়া বোকার মত শুধালো "কী বলছেন?"

"বলছি, স্বয়ংবরা হ'লে কবে?"

সুপ্রিয়া বড় বড় চোখ মেলে চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল, কিছুই বুঝতে পারে নি। রেণুর ভয়ানক রাগ হ'তে লাগল, ইচ্ছে হ'ল হাত ধ'রে টেনে তুলে ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যায়। কিন্তু ওরা নিমন্ত্রিত, গায়ে প'ড়ে কিছু বলা অশোভন—এই ভেবে স্থির হ'য়ে ব'সে রইল।

সবাই কিন্তু ধ'রে নিল যে এটা সুপ্রিয়ার কলেজে-পড়া নব্য-চাল—বরের কথায় লজ্জা না পাওয়া।

দিদিমা নাছোড়বান্দা, বললেন, "এই যে পাশে ব'সে রয়েছে এ তোমার বড় ননদ সরযূ, আর এটি মেজ লীলা। রাজেন তোমার থেকে বেশি বড় নয়, বছর তিনেকের তফাত। তা বড়ঘরে অমন নিত্যই হয়, বরের চেয়ে কনে বড় হ'তেও শুনেছি।"

মেয়েরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে; সুপ্রিয়া উঠে সোজা বাইরের ঘরে চ'লে গেল। রেণু বুঝল এবার ঢুকেছে ওর মাথায়।

খাওয়ার সময় হ'য়ে এলো। সুপ্রিয়া কোথাও নেই। দরোয়ান খবর দিল, এক দিদিমণি তো গাড়ি ভাড়া ক'রে চ'লে গেছেন ঘণ্টাখানেক হ'ল প্রায়।.........

ফিরে এসে রেণু জিজ্ঞাসা করলে, "না খেয়ে চলে এলি যে বড়?"

"ওদের খাবার ?—আর কখনো আমি ওবাড়ি খাবো মনে করেছ ?"

"কেন চুল-টুল দেখতে দিলি ?"

"বুঝতে পারিনি কিছুই। ভাবলাম ভাব করতে চাইছে, স্কুলেও তো মেয়েরা কতরকম করে এক এক সময়।"

"তা একেবারে চ'লে না এলেও পারতিস। উঠে গিয়েছিলি, ওতেই ঢের হ'ত। বাড়ির গিন্নি বড্ড দুঃখিত হয়েছেন।"

"হ'লে কি করব বলো! আমিতো ওখানে খেতে পারতাম না কিছুতেই। মানুষ যে এতটা আন্‌রিফাইন্‌ড্‌ হ'তে পারে—"

উমাশঙ্করও শুনে বললেন, "রেণু, এইজন্যেই আমি সু'কে যেখানে সেখানে যেতে দিতে চাই না। এঁচড়েপাকা মেয়েদের সঙ্গ কচি-মনের পক্ষে মারাত্মক; বিশেষত বিবাহিতা মেয়েদের কি এতটুকু কাণ্ড-জ্ঞান নেই ? যার-তার সামনে যে-সে বিষয়ে আলোচনা করতে বাধে না একটুও ?"

"কিন্তু সুপ্রিয়া বড় কাঁচা রয়ে গেছে জ্যাঠামশাই। মেয়েদের ঠাট্টা তামাসা অনেকক্ষণ ধ'রে বুঝতেই পারলে না। শেষে যেই বুঝেছে, অমনি ধাঁ করে উঠে সোজা বাড়ি চ'লে এলো। দু'টোর কোনোটাই কি ঠিক সহজ ব্যবহার হয়েছে ? ওকে আর একটু 'ফ্রি-লি' সকলের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে দেওয়া দরকার।"

"না। আমি চাই না যে ওর মনে কোনো ছোট জিনিষের ছাপ পড়ে।"

"কিন্তু চিরদিন কি আপনি ওকে আগলে বেড়াতে পারবেন ?"

"চিরদিনের কথা তো হচ্ছে না রেণু। আরো বড় হ'লে, ওর নিজের ভাব নিজের মধ্যে বদ্ধমূল হ'য়ে গ'ড়ে উঠবে। তখন বাইরের মলিন ছোঁয়াচ ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ততদিন আমি ওকে সকল রকম স্পর্শদোষ থেকে যথাসাধ্য বাঁচিয়ে চলতে

চাই। সুস্থ সুন্দর আবহাওয়ায় ওর দেহমনকে সহজভাবে বিকশিত হবার সুযোগ দিতে চাই।"

ওরা পিতা-পুত্রীতে চিরদিন সম্পূর্ণ একমত। উমাশঙ্করের সমর্থন না পেলে সুপ্রিয়া বহির্জগতের সম্পর্ক এতটা বর্জন ক'রে চলতে পারত না।

রেণু আর কোনোদিন এ বিষয়ে কিছুই বলেনি, কিন্তু ওর বরাবর মনে হ'ত, জ্যাঠামশাই এখানটায় মস্ত ভুল করলেন।

রেণু বিশ্বাস করে না—সমস্ত জগতকে দূরে রেখে কেউ পূর্ণাবয়ব হ'তে পারে। অসুন্দর আছে ব'লেই সুন্দরের প্রয়োজন। কিন্তু সেই সুন্দরের জন্যে অভীপ্সা অকৃত্রিম ও দৃঢ়ভিত্তি হ'তে হ'লে পরিচয় থাকা দরকার জীবনের যত মিথ্যা যত কুশ্রীতার সঙ্গে। ভেজাল থেকে খাঁটি চিনতে হ'লে দু'টোকেই জানা দরকার। সুপ্রিয়ার স্বভাবে আছে গভীরতা, নেই বিস্তৃতি; যেন ভাব আছে, কিন্তু তাকে স্ফুট ক'রে রূপ দেবার জন্যে দেহ নেই; ও স্বপ্ন দেখে, কিন্তু বাস্তব চেনে না। আর চেনে না ব'লেই এতটুকু সহ্য করতে পারে না, সব ছেড়ে কেবলই পালাতে চায় বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ থেকে। রেণু ঠিক তার উল্টো—

"রেণুদি, এডেনে কবে পৌছোব আমরা? ওকি, ঘুমোচ্ছ?"

"প্রায়। তোর ছোঁয়াচ লেগেছে। দিনের বেলা স্বপ্ন দেখছি।"

"চিঠি লিখবে না বাড়িতে?"

"লিখব'খন। আমি তো তোর মতো ভাবুক নই যে দশপাতা-জোড়া পত্তর লিখতে পারব! দু'চার লাইনে হ'য়ে যাবে, তার ঢের সময় আছে।"

সুপ্রিয়া হেসে বললে, "তুমি দেখছি আমাকে খোঁটা দিতে পারলে আর কিছুই চাও না। কি করব, ভগবান আমাকে অমনি ক'রেই গড়েছেন।"

"জানিস না ? ননদিনী রায়-বাঘিনী ! পতিব্রতা হওয়া অত সহজ নয় রে, পতির সঙ্গে সঙ্গে সতীর আরো অনেক—"

"রেণুদি, ওসব ঠাট্টা নয় ভাই কিন্তু।"

"বাপ রে, বিয়ে না হ'তেই মেয়ের—"

"কে বললে বিয়ে হয়নি ? বাক্‌দান আর বিয়েতে তফাত কতটুকু ?"

রেণু সোফা ছেড়ে সোজা উঠে বসল, "বলিস কি ? ভেতরে ভেতরে এত ? অনুকে বাক্‌দান করেছিস তুই ?"

"কী যে বলো ! ওঁকে কি আমি ডেকে বলতে গিয়েছি—"

"তবে ? বল্ না বাপু আর একটু খুলে। জানিস তো আমার কাছ থেকে কথা ফাঁস হবার যো নেই।"

"রেণুদি, আশ্চর্য করলে তুমি আমাকে ! এই এতটুকু বয়স থেকে কা'কে স্বামী ব'লে জেনেছি তাও আজ নতুন ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে তোমায় ?"

রেণু উঠে সুপ্রিয়ার গলা জড়িয়ে ধরলে, "দিদি, কী নিশ্চিন্ত যে করলি আমায় আজ ! কত বড় দুর্ভাবনা থেকে—"

সুপ্রিয়া বাধা দিয়ে বললে, "দুর্ভাবনা কিসের ?"

"আমি তোরই মুখ থেকে স্পষ্ট ক'রে এই কথাটাই জানতে চেয়েছিলাম যে কোনো কারণেই তোর ভালবাসার নড়চড় হয়নি ; যতই বিপদ আসুক, যতই বিরুদ্ধ আবহাওয়া বইতে থাকুক না কেন তোদের মধ্যে—"

"কাল অতক্ষণ ধ'রে কী শুনছিলে তাহ'লে ?"

"সেই এক ব্রত, এক ধর্ম, এক কর্ম ইত্যাদি ? বিয়ের মন্ত্র অক্ষরে অক্ষরে পালন ?"

"নিশ্চয়। সন্দেহ আছে তোমার ?"

রেণু খানিক চুপ ক'রে থেকে বললে, "এখন হয়ত নেই। কিন্তু—"

"কী ?"

"আদর্শের আনুগত্য আর প্রেমের আনুগত্য—দু'টো তো এক জিনিষ নয় ভাই। একটি যেন তপস্যা, অন্যটি স্বেচ্ছা-সমর্পণ। একটি কঠোর, অন্যটি সহজ, স্বত-উৎসারিত। যেখানে প্রেমের হাওয়া বয়, সেখানে তোর মতো স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ঘোর আইডিয়ালিস্টকেও ভয় নেই আমার।"

সুপ্রিয়া আবার চিঠি লেখায় মন দিল দেখে রেণু ব্লটিংপেপারটা ওর কাগজের উপর চাপা দিয়ে বললে, "জ্যাঠামশাই আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোর মন যদি ভবিষ্যতে আর কাউকে চায়, বাধা দেবেন না। কারণ তিনি মনে করেন তুই মুক্ত, যেন কোথাও কারো সঙ্গে বিয়ের কথা হয়নি তোর, স্বেচ্ছায় সানন্দে যাকে বরণ করবি—"

সুপ্রিয়ার মুখ লাল হ'য়ে উঠল, "মেয়েরা শুধু একবার এবং একজনকেই স্বামী ভাবতে পারে।"

আবার সেই আদর্শের বুলি!—রেণুর মুখ ম্লান হ'য়ে গেল। বললে, "কিন্তু আমি জানতে চাই তোর গভীর হৃদয়ের কথা, যেখানে তুই শুধু প্রেমিকা—ব্রতচারিণী নয়, যেখানে তোর ধর্ম শুধু ভালোবাসা, আদর্শকে আঁকড়ে থাকা নয়। মেয়েরা কী করতে পারে বা না পারে তার কথাও হচ্ছে না। সংসারের তুই জানিস কী ?"

"রেণুদি, তোমার অনেক কথা বুঝতেই পারি না। কী জানতে চাও স্পষ্ট ক'রে বলো।"

"অনুপমকে তুই সত্যি ভালবাসিস ?"

"আজ পর্যন্ত তাঁকে ছাড়া আর কিছুই কি জানি আমি ?"

"ব্যস, আমিও আর কিছু জানতে চাইনে। সুপ্রিয়া, তুই যতই

'আদর্শ আদর্শ' করিস না কেন, মানুষের হৃদয় বস্তুটি আদর্শের চেয়ে অনেক বড়, যেখানে হৃদয় আছে সেখানে মনও আছে। প্রাণহীন সাধনা, প্রেমহীন আত্মদান আর যারই হোক, তোর স্বধর্ম নয়।"

সুপ্রিয়া কী বলতে যাচ্ছিল, থামিয়ে দিয়ে রেণু বললে, "কিছু মনে করিস নে ভাই গায়ে-প'ড়ে এত কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে। জানিস তো, অনু শুধু আমার ভাই নয়, আমার বন্ধু আমার দুঃখের দিনের একমাত্র সাথী—"

সুপ্রিয়া একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললে, "রেণুদি, তোমার নিজের কথা তো কখনো—"

"বলব। যদি—যদি কোনোদিন দরকার হয়—"

"দরকারই সব? তোমার ব্যথার ভাগী হ'তে ইচ্ছা করে না আমার?"

রেণু সস্নেহে ওর হাতটা চেপে ধ'রে বললে, "নিশ্চয় বলব একদিন। কিন্তু আজ নয়।"

"বেশ, যেদিন তুমি সহজে বলতে পারবে! শুধু একটা কথা, উনি সব জানেন?"

"তৃতীয় ব্যক্তির যতটা জানা সম্ভব।" তারপর জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বললে, "জানিস সু, বিলেতের মাটিতে পা দিয়ে আমার প্রথম কাজ হবে তোর এই স্বপ্ন-ব্যাধি সারানো। যত নষ্টের মূল এইটেই। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করবারই বা দরকার কী? আজ থেকেই হোক না তোর হাতে খড়ি। পুঁথি-পত্তর তুলে রেখে আয় আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"লাইফ দেখবি আয়।"

"জাহাজের ওপর কী—"

রেণু অসহিষ্ণুভাবে বললে, "যেখানে মানুষ সেখানেই জীবনের নাট্যলীলা চলেছে অষ্টপ্রহর—তা সে জাহাজের ওপর হোক বা পাতাল-গহ্বরেই হোক।"

"কিন্তু আমার চিঠি যে শেষ হ'ল না—"

"পরে লিখিস। চল, চারদিকে ঘুরে-ফিরে দেখিগে একটু।"

মিথ্যা বলেনি রেণু। যেখানে মানুষ সেখানেই রয়েছে তার আনুসঙ্গিক উপসর্গ। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল জাহাজের একেবারে একপাশে সুইমিং পণ্ড্ বা সাঁতার কাটবার ছোট কৃত্রিম পুকুরটায় এক হাস্যকর দৃশ্য। যাত্রীদের মধ্যে জন তিন-চার তরুণী ইংরেজ মেয়ে ছিল। তার মধ্যে একটিকে দেখলেই আর ভোলবার যো নেই। সবচেয়ে রঙীন আর মিহি ওর পোষাক, সবচেয়ে কায়দাদুরস্ত ওর চাল চলন। বিশেষ ভঙ্গিতে দোকানের বিশিষ্ট টুপিটি ওর মাথার উপর বসানো, কিংবা টুপির যখন দরকার নেই তখন রং-বেরঙের রেশমী রুমাল দিয়ে মাথার একরাশ ফাঁপানো চুল—সত্যিকার সোনালি রং-এর, তা 'শ্যাম্পু'র কল্যাণেই হোক বা পৈতৃক অকপট উত্তরাধিকার-সূত্রেই হোক—জড়ো ক'রে একত্র বাঁধা। বাঁধা, কিন্তু এমনভাবে যে ছোট দু'খানি কানের পাশ দিয়ে, ঈষৎ হলুদের ছোপ-লাগা শুভ্র গ্রীবাটির উপরে কয়েকগুচ্ছ কুঞ্চিত কেশ বরাবরই দোদুল্যমান। ও জানে যে তা না হ'লে ওর পরিপুষ্ট গালদুটির ও নিটোল গ্রীবার চোখকে আকৃষ্ট করবার মতন রূপটি ঠিক ফুটে ওঠে না। মেয়েটির যে প্রসাধনে একান্ত বিশ্বাস, হাল আমলের ধুয়ো—গণ্ডে গোলাপ ফোটাবার ও চোখের ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার জন্যে ভোরে একমাত্র

ফলের রস পথ্যের উপরই যে নির্ভর করে না, তা ওকে দেখলে বোঝা যায়। যখনই দেখা হয়, মনে হয় ও এইমাত্র আয়নার সামনে থেকে উঠে এলো। আর কেউ হ'লে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হ'ত, কিন্তু কেন জানি না এ সমস্তই ওই মেয়েটিকে দিব্যি মানাত। হয়ত সেটা ওর সাজসজ্জা করবার ও তাকে স্বচ্ছন্দে বহন করবার জন্মগত সহজ প্রবণতার দরুণ। যাহোক, মেয়েটির একটি সাবলীল মুক্ত গতি, ঈষদ্দীর্ঘ ছিপ্‌ছিপে দেহখানি এবং ওষ্ঠাধরের চাপা গর্বিত ভাব—সব মিলে ওকে যেন একটা বিশেষ মহিমা দিয়েছিল। বোধহয় এই বিশিষ্টতার জন্যেই প্রথমেই ওর ভক্ত জুটে গেল—জাহাজের নূতন পাশ করা সুদর্শন তরুণ স্কচ ডাক্তারটি। গতরাত্রে আইসক্রীম খেতে খেতে সুপ্রিয়ারা ওদের দুজনকে অনেকবার একসঙ্গে নাচতে দেখেছে। বোধ হ'ল ডাক্তারের বেশ একটু ঘোর লেগেছে। আরো দু' তিনটি অবিবাহিতা তরুণী এবং তাদের প্রতিস্পর্ধী অন্তত জন-তিনেক বিবাহিতা সুন্দরী থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার আর কাউকেই নাচের অংশীদার করতে বিশেষ উৎসুক নয়, এটা কারো চোখে পড়তে দেরি হয় নি। ওর কপালক্রমে এ জাহাজে ইউরোপীয় অবিবাহিত যুবক আর ছিল না বললেই হয়। আগে স্ত্রীকে পাঠিয়ে পরে নিজে একলা যাচ্ছে এরকম জনকয়েক সিভিলিয়ান আছে বটে, কিন্তু আফশোষ এই যে ভারতের রোদে পুড়েই হোক বা গরম দেশে অতিরিক্ত পোলাও কালিয়া খেয়েই হোক, ওদের চেহারার আর সে জৌলুষ নেই যা আছে ডাক্তার কাওয়ানের। ও মাত্র গতবছর এম-বি পাশ করেছে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি থেকে। ফিরে এবার এম-ডি হ'ল ব'লে। তারপর নাকি হাঁসপাতালেই কি-একটা কাজ পাবার আশা আছে। ইতিমধ্যে ছুটিতে ফাঁকতালে এই স্টীমারের

ডাক্তার হ'য়ে এসে করছে অভিজ্ঞতা অর্জন, দেশভ্রমণ, সমুদ্র-বিলাস আর সঙ্গে সঙ্গে দু'চার শিলিং যা পায়—উপরি লাভ। বয়স বেশি নয়—বড় জোর তেইশ চব্বিশ, ছ'ফুট লম্বা, রঙে গোলাপী আভা। বলা বাহুল্য, মেয়েটি বিনা আপত্তিতেই কাওয়ানের এমন একেবারে বে-পরোয়া অগ্রসর হওয়াটাও মঞ্জুর ক'রে দিলে। স্টীমারে ওর সাবধানী আত্মীয় কেউ ছিল না, সেটাও একটা কারণ হ'তে পারে। শাসন করবার কেউ থাকলে হয়ত ও আর একটু সাবধান হ'তে বাধ্য হ'ত। যাই হোক, আজ সকালে মিস্ রায়ান আর ডাক্তার 'সুইমিং কস্‌টিউম্' প'রে এদিকেই আসছিল। পরে দেখা আর একজোড়া সাঁতারুর সঙ্গে—একজন পাঞ্জাবী ছাত্র, অপরটি বম্বেনিবাসী। ডাক্তারের ইচ্ছা ছিল ফিরে আসে, কিন্তু সঙ্গিনী বললে, "এদের সঙ্গে মেলা-মেশায় ক্ষতি কী? বড়লোকের ছেলে না হ'লে কি আর বিলেত যায়?"

রায়ান ছোট থেকে ভারতে মানুষ, খবর রাখে অনেক সে দেশের সম্বন্ধে। কিন্তু ডাক্তারের আপত্তি ছিল অন্য কারণে। একসঙ্গে সাঁতার দেওয়ার অজুহাতে নব-লব্ধা বন্ধুনীর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হ'য়ে নেবার মতলব দু'জন নির্বুদ্ধি কৃষ্ণকায়ের অযাচিত মাঝে-এসে-পড়ায় ফেঁসে যাবার উপক্রম দেখে মনে মনে সে রীতিমত বিরক্ত হ'য়ে উঠল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে মুখ ফুটে কিছু বলাও তো যায় না। অগত্যা মনের ক্ষোভ মনেই চেপে নেমেছে জলকেলিতে। এদিকে মিস্ রায়ানের নেক-নজর পেয়ে ভারতীয় ছাত্র দুটি নিজেদের এতই ধন্য মনে করছে যে, জলে নেমে সাঁতার কাটার কথাই গেছে ভুলে। ওদের জীবনে কোনো মেয়ের সঙ্গে এমনভাবে মেশা আর ঘটেনি।

রেণু আর সুপ্রিয়া ডেকের রেলিংএর কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—এক রায়ান ছাড়া ওখানে কারোই অবস্থা ঠিক

সহজও নয়, স্বচ্ছন্দও না। মেয়েটি অতিরিক্ত 'ফরোয়ার্ড' বই কি, ভারতীয় ছেলেদু'টির অবস্থা ঠিক যেন টেনিস-গ্রাউণ্ডে সাহেব-মেমের পিছনে বল কুড়িয়ে দিতে ব্যস্ত আরদালির মতো। স্নান দেখবার জন্যে আস্তে আস্তে ডেক-এ লোক জমে গেল।

ডাক্তার আর বেশিক্ষণ বরদাস্ত করতে পারলে না। নতুন বয়স, গরম রক্ত!—উঠে পড়ল জল থেকে।

রায়ান যখন দেখলে যে ডাক্তার ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সেও উঠে এলো; সঙ্গে সঙ্গে গোলযোগের মূল—বন্ধুদ্বয়ও উঠে, একজন শশব্যস্তে ওর জুতোজোড়া, আর একজন শুকনো বাথ-গাউনটি এগিয়ে ধরলে—মুখে তাদের দাসসুলভ আভূমি-প্রণত নম্রতা।

সুপ্রিয়া আর সহ্য করতে পারলে না। লাউঞ্জে ফিরে এসে ধপ ক'রে ব'সে পড়ল।

রেণু ওর কাণ্ড দেখে হাসছে।

"এই তোমার লাইফ দেখানো রেণুদি ?"

"লাইফ্? এইটুকুতেই ?"

"চাইনে আমি ওসব দেখতে, চাইনে যতসব বাজে জিনিষের সঙ্গে পরিচয় করতে—"

রেণু গম্ভীর হয়ে গেল, "চাসনে ? সুপ্রিয়া, ফুল্স্ প্যারাডাইজ-এ থাকা পোষায় তাদেরই, যাদের নেই কোনো আকাঙ্ক্ষা—বদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে কাটে যাদের জীবন—কূপমণ্ডুকের মত। তুই তা-ই কেন রইলি না তাহ'লে ? আর, তাও বলি—কূয়োর মধ্যেই কি পাঁক নেই রে ? জীবনে কুশ্রীর হাত থেকে উদ্ধার পাবি কোন্ শ্রীমন্ত গুহায় ঢুকে ? নিজের মধ্যেই কি সব সুন্দর ? এমন অনেকে আছে, যাদের কাছে তোর এই অল্পে অসহিষ্ণু হওয়াটাও মনে হবে অতি অসুন্দর—অসহ্য ছেলেমানুষি।"

"কিন্তু আমি মানুষকে দেব যা কিছু আমার সবচেয়ে সুন্দর, শুধু তা-ই। ফুল যেমন নির্জনে ফুটে তার সবটুকু সুবাস দেয় উজাড় ক'রে—"

"পারবি? যারা তোর কাছে হাত পাতবে—তাদের দেখেই যদি ভড়কে যাস এমন ক'রে—"

"আগে শোনো আমার সব কথা। এখনো তো আমি নিজেকে তেমন ক'রে দেবার জন্যে তৈরী হ'তে পারিনি। আমার নিজের মধ্যেই যে সুন্দরের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়নি—যেমন এই একটু আগে তুমিই বলছিলে। এখনই কেন আমাকে মন্দর সাথে টেনে নিয়ে বেড়াতে চাও? তাতে কার কী লাভ হবে?"

রেণু আর তর্ক করল না। ওর হাতখানা হাতে নিয়ে শুধু বললে, "সুপ্রিয়া, কি ক'রে বোঝাব ভাই, তোর কথাগুলো শুনলে আমার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কত ভয় হয় তোর জন্যে!"—মনে মনে বললে, "এত সরল, এত ছেলেমানুষ!"

সুপ্রিয়া ভাবে, "রেণুদি বারবার বলে—'ভয় হয়!' কিন্তু কেন? কিসের ভয়? জীবনটা কি সত্যই এতই ভয়ানক?"

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে।

বাইরে ডেক-এ তখন টেনিস খেলার ধুম প'ড়ে গেছে, রায়ানই অগ্রণী। সেই পাঞ্জাব ও বোম্বাইবাসী ভদ্রলোকযুগল স্নানের সময়কার আলাপ উপলক্ষ ক'রে এখানেও মাথা গলাবার চেষ্টা করছেন! বাকি তিনজন ভারতীয় ছাত্রও খেলা দেখতে এসেছে। রায়ানের মুখ দেখে মনে হয়, কালা আদমীদের উপস্থিতি-সম্বন্ধে সে যেন সচেতনই নয়, ভুলেই গেছে যে একবারও একটুও সদয় ব্যবহার করেছিল। কিন্তু ওর ক্ষণিকের বন্ধুদ্বয় নাছোড়বান্দা, এটা ওটা হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করবার দুশ্চর তপস্যায় নিরত।

দেখে দেখে একটু নিশ্বাস ফেলে সুপ্রিয়া বললে, "বলতে পারো, কেন ওরা ইউরোপীয়ানদের অনুগ্রহ পাবার জন্যে এতখানি কাঙালপনা করে? একটু লজ্জাও হয় না নিজের জন্যে?"

"শুধু ইউরোপীয় ব'লে নয়রে। মেয়েটি মেয়ে ব'লে—"

"সত্যি?"

"হাঁ। চুপ, চুপ! ওই লম্বা ছেলেটি আসছে এদিকে—"

"এলোই বা। বাঙালী তো নয়!"

"না, তবু—"

"নমস্কার।"

"ওঃ নমস্কার!" ছেলেটির অভিবাদনের উত্তরে হেসে রেণু বললে, "আমরা ভেবেছিলাম আপনি বাঙালী নন।"

আগন্তুকও হেসে বললে, "দোষ নিই না আপনাদের। অভ্যস্ত পোষাকেই জাহাজে উঠেছি, অনেকদিন গুজরাটে থেকে কাপড়-চোপড় তাদেরই মতন—"

রেণু মাথা নেড়ে বললে, "না, ওই টুপিটার জন্যেই—"

ছেলেটি সলজ্জে টুপী খুলে ফেললে।

"দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না ঐ চেয়ারটায়। এটি আমার বোন। সু, চেয়ারটা এগিয়ে দে।"

"না না, আমি নিজেই নিচ্ছি। আপনাদের বিরক্ত করলাম না তো?"

"তা কেন? বিদেশে স্বদেশীয়দের সঙ্গ বরাবরই আনন্দের। যদিও এখনো বিলেতে পৌঁছইনি, তবু এরই মধ্যে তার পূর্বস্বাদ পাচ্ছি। স্বচ্ছন্দে বসুন আপনি।"

ছেলেটি পরিচয় দিল, "আমার নাম নির্মল। যাচ্ছি ছবি-আঁকা শিখতে।"

"ছবি-আঁকা! বটে? কোথায়?"

"লণ্ডনে।"

"ছবি-আঁকা শিখতে লণ্ডনে?"

"হাঁ। স্যার রথেনষ্টাইনের ছাত্র হিসেবে। এতদিন ছিলাম বোম্বে স্কুল অফ্ আর্টস্-এ। শান্তিনিকেতনেও কিছুদিন থেকে এসেছি।"

"সেখানেই শেষ পর্যন্ত থাকলেন না কেন? কিম্বা অন্য কোথাও? দেশে তো বড় আর্টিস্টের অভাব নেই—যাঁর কাছে শিক্ষানবিশী করতে পারতেন তেমন কেউ কি—"

"থাকবেন না কেন? নিশ্চয়ই আছেন কিন্তু আমার অভিভাবকের ধারণা অন্যরকম।"

"বাবা?"

"না, বাবা নয়; বাবার বন্ধু!" ছেলেটি ঈষৎ বিব্রত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে খেলা দেখতে লাগল। রেণু ইত্যবসরে ওর আপাদমস্তক ভালো ক'রে দেখে নিল।

নিতান্ত তরুণ বয়স, বড় জোর একুশ কি বাইশ, কিন্তু মুখের অতি সুকুমার ভাবখানার জন্যে আরো কম দেখায়। শ্যামল রঙ, একমাথা কুঞ্চিত নরম চুল, দীর্ঘ গঠন।

"আহা, বড় ছেলেমানুষ!" অনুপমের কথা মনে এলো রেণুর—ঠিক এর উল্টো। লম্বা-চওড়া ব্যায়াম-পুষ্ট সুগৌর দেহ, সুশ্রী নাক চোখ; দেখলেই প্রথম কথা মনে পড়ে—এর আছে শক্তি, আছে আত্মবিশ্বাস, লোকে ওর উপর নির্ভর করতে পারে। আর নির্মলকে দেখলে মনে হয়—"ওর মা এই ছেলেকে কোন্ প্রাণে একলা ছেড়ে দিল? যত্ন করবার জন্যে, দেখাশুনা করবার জন্যে সঙ্গে না এসে পারল কী ক'রে?"

হঠাৎ নির্মল এদিকে তাকায়। রেণু চমকে চোখ ফিরিয়ে নেয়,

তারপর লজ্জিত হ'য়ে বলে, "পুরো নামটা আপনার বললেন না তো? দরকার হ'লে কী ব'লে খোঁজ করব?"

"বোস্। আপনাদের কেবিন দেখেছি। যদি আপত্তি না থাকে আমারটা চিনিয়ে দেব।"

"বেশ তো। ভালোই হ'ল আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে। আমার নাম নীলিমা রায়, আর এই সুপ্রিয়া—আমার বোন। আপনি কোন্ টেবিলে খেতে বসেন? আমাদের কাছেই বসেন না কেন?"

"বসব আজ থেকে।"

"আপনাকে আমরা সঙ্কোচ করব না। বয়সে অনেক বড় আমি।"

নির্মল হাসলে। ছেলেটির হাসি বড় মিষ্টি, রেণুর কেমন স্নেহ জাগে।

"এখন তাহ'লে আসি দিদি?"

"এসো ভাই। কিছু মনে কোরো না, কিন্তু এটিই চেয়েছিলাম, বড় বোনের মতো মনে করবে।"

নির্মল চ'লে যেতে সুপ্রিয়া হেসে বললে, "অমনি ভাই-বোন পাতিয়ে ফেললে? চেনা না, শোনা না—"

"কেউ কেউ আছে যাদের চিন্‌তে সারা জীবনটাও পর্যাপ্ত নয়। তারা চির-অচেনাই থেকে যায়, কিছুতেই যেন প্রাণ খুলে মিশতে পারিনে। এর কথা আলাদা। এ সেই দু'চারটের দলে যাদের দু'দণ্ড দেখলেই, দু'চারটি কথা বললেই মনে হয় যেন কতকালের চেনা, আপন। কেন এমন হয় জানি না। তোকে ব'লে রাখলাম সু, এ ছেলেটির ভেতরটা বড় ভালো, কিন্তু মনে হয় দুর্বলও। এ রকম প্রকৃতি যাদের, তাদের একটা-না-একটা আশ্রয় থাকা চাই—আদর্শ হোক, আর্ট হোক।"

"যা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে?"

"যার জোরে নিজেকে তুলে ধরতে পারে। মার্সেলসে নেমে

অঙ্গুর সঙ্গে দেব আলাপ করিয়ে। দুজনেই দুজনের মধ্যে নতুন জিনিষ পাবে।”

সুপ্রিয়া ঠাট্টার সুরে বলে, “ঠিক যেন লতা পাবে সহকার আর সহকার লতা ?”

রেণু হেসে বললে, “হাঁ। এতদিনে তোর অন্তর্দৃষ্টি খুলেছে, নির্মলকেও চিনেছিস ঠিক। কিন্তু দেখিস—”

সুপ্রিয়া উৎসুক চোখ তুলে তাকায়।

“নাঃ, হাজার হ’লেও নির্মল পুরুষমানুষ, বে-দখলের ভয় নেই তোর !”

সুপ্রিয়া লাল হ’য়ে ওঠে, “কী যা তা বলছ ?”

“একটু ঠাট্টাও করতে পাবো না ? তুই এত সিরিয়াস কেন বাপু ?”

* * *

লাঞ্চের সময় দেখা গেল ভারতীয়দের সকলকে আলাদা টেবিলে খেতে দেওয়া হয়েছে। নির্মল এসে রেণুর সামনে বসল।

“এসেছ নির্মল ? বেশ !”

“কাল আপনারা খেতে আসেননি, এই চেয়ার দুটো খালি পড়েছিল ! প্রত্যেকের জায়গা আগে থেকেই ঠিক করা আছে কিনা।”

“সু’র কাল মাথা ধরেছিল ! এখন থেকে রোজই আসব।”

সুপ্রিয়া বললে, “রেণুদি, ‘অক্স-টেইল্ সুপ’ আবার কী ? ও আমি ছুঁতে পারব না, বয়কে বলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।”

“খাসনে, তাহ’লে ও আপনিই নিয়ে যাবে। কিন্তু তোকে নিয়ে তো আচ্ছা মুস্কিল হ’ল ! কোনো মাংসই তো খাবি না। স্টুয়ার্ডকে বলতে হবে কাল থেকে আলাদা কিছু তৈরী ক’রে দিতে।”

"দরকার কী? এত মাখন, রুটি, ফল আর পুডিং রয়েছে, ওতেই ঢের হবে।"

নির্মল বললে, "কোনো মাংসই খান না? তবে তো ওদেশে গিয়ে বড় কষ্ট হবে আপনার!"

রেণু বললে, "হবেই তো। দেশে যা করেছিস, বিদেশে সে অভ্যেসের জের টেনে চললে সুবিধা হবে না। অন্তত মাট্‌ন্ খা, কথা শোন্।"

"আজ নয় রেণুদি। একেবারে অতটা সইবেনা। ··· জাহাজটা বড্ড দুলছে।"

নির্মল দুঃখিত হ'য়ে বললে, "আর একটু আলুভাজা আনিয়ে দেব? বয়, এদিকে এসো—আরো আলু—মিস রায় মাংস খান না।"

"ভালো মাংস ম্যাডাম, টার্কি!"

"অভ্যেস নেই ওঁর। তুমি ওকে সব্‌জী বেশি ক'রে দাও! মিস রায়—"

রেণু বাধা দিলে, "মিস রায় নয় নির্মল।"

"বাঃ আপনি যে বললেন—"

"তাছাড়া, এসব ইংরিজী সম্বোধন না হ'লে কি চলেই না? কেমন যেন বিশ্রী শোনায় ভারতীয় মুখে।"

"কিন্তু ডাকতে হ'লে একটা কিছু নাম তো চাই।"

"কেন, ওর নিজের নাম রয়েছে কি করতে? সুপ্রিয়া বলতে পারো না?"

নির্মল লজ্জিত মাথা হেঁট ক'রে বললে, "অনাত্মীয় পুরুষের মুখে—"

"আচ্ছা, মানলাম। তাহ'লে 'দেবী' যোগ ক'রে দাও না কেন নামের সঙ্গে? সুপ্রিয়া দেবী। দেখ তো কেমন মিষ্টি শোনায়।"

"সেটা চলে নিজেদের মধ্যে। ওদের কাছে কী বলব?"

রেণু হতাশ স্বরে বলে, "ওই তো আমাদের মুস্কিল! ওদের কাছেও সুপ্রিয়া দেবী বলতে বাধা কী ছিল? কিন্তু আমরা যে নকল-নবিশ! না, না, বিশেষ ক'রে তোমাকেই বলছি না। ভারতীয় মাত্রেরই ঐ দোষ, পরেরটা বড় সহজে নেয়, নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করতে জানে না একটুও।"

"কিন্তু আমরা যে আধা-বিদেশী দিদি! ছোট থাকতে স্কুলে মাষ্টার শিখিয়েছে—Learn to think in English, learn to dream in English. বড় হ'য়ে তাই পরিষ্কার মাতৃভাষায় কথা বলতেও ভুলে যাই। আমাদের রঙটাই শুধু খাঁটি জাতীয়ত্ব রক্ষা ক'রে রইল চিরকাল। নিজের বলতে তাছাড়া আর আছে কী?"

সুপ্রিয়ার মুখখানি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, ভাবে—নির্মল তো বেশ চিন্তাশীল!

"এই বোম্বাইয়ে দেখুন, পার্শী ভদ্রলোক থেকে আরম্ভ ক'রে মায় গোঁড়া হিন্দু পর্যন্ত সবাই চাল-চলনে এক একটি পূরো ইংরেজ—স্বদেশী পোষাকে বিদেশী মন! বোম্বাইয়ে এলে মনে হয়, যেন অর্ধেক বিলেতে এসে গেছি। একটু দেখবার শক্তি থাকলেই বুঝতে পারব আমরা, খাঁটি ভারতীয় বলতে কোনো জাত আর নেই—আছে একটা পাঁচমেশালি—"

"সার্, স্টুয়ার্ড এই কারি পাঠিয়ে দিলেন মিস্ সাহেবের জন্যে। রোজই ওঁর জন্যে আলাদা ভাত-তরকারী হবে কাল থেকে।"

"স্টীমারে তো যাহোক একটা ব্যবস্থা হ'ল। ওদেশে পৌঁছে কি উপায় হবে রে তোর?"—রেণু জিজ্ঞাসা করলে।

"যা হবার। এখন থেকেই ভাবনা কেন? খাওয়া আমার হ'য়ে গেছে। উঠতে বাধা কী।"

"বাঃ, এক টেবিলে বসেছে—ওঁদের খাওয়া না হ'লে কি উঠতে আছে? তুই বিলিতি এটিকেট কিচ্ছু জানিস না।"

"হয়েছে, অতক্ষণ বসে থাকতে হবে? আচ্ছা, এটিকেট না হয় জানিনে, কিন্তু ওঁরা তো আর বিলিতি নন!"

"তবু ভালো দেখায় না। যস্মিন্ দেশে যদাচার!...দুপুরে কী করবে নির্মল?"

"কী আর ক'রব? শুয়ে শুয়ে উপন্যাস পড়ব, নয় তো ছবি আঁকব।...ওঁদের খাওয়া শেষ, চলুন এবার।"

যেতে যেতে রেণু ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "তাস খেলতে জানো?"

"একটু-আধটু।"

"এসো তাহ'লে।"

"তিনজনে—"

"তিনজন কোথায়? তাস পেতে শোয়, কি গায়ে দেয় সুপ্রিয়া তারও খবর রাখে না। তাইতো তোমায় ডাকছি।"

নির্মল হাসতে লাগল—"উনি তাহ'লে একলাটি কী করবেন?"

"সে জন্যে ভাবনা নেই। এখনই বই নিয়ে বসবে। খেলাধুলো একটুও ভালোবাসে না। তুমি বেঁচে আলাপ না করলে সময় কাটানো মুস্কিল হ'ত আমারই। সু যে ফিলজফার।"

"রেণুদি, কেন মিছে ওঁকে ভয় দেখাচ্ছ ভাই? নির্মলবাবু, বিশ্বাস করবেন না, তাস খেলতে না জানলেও খেলাধুলো আমি ভালোবাসি। আপনারা খেলুন, আমি দেখি।"

"বই হাতে নেই? জানি কতক্ষণ তোর ভালো লাগবে। এসো নির্মল।"

নির্মল সেই প্রকৃতির লোক যারা পরকে অতি সহজে আপন ক'রে নিতে পারে—কোনোরকম আত্মীয়তার ঘটা বা গায়ে-পড়া সামাজিকতার আতিশয্যে নয়, একটা সহজ স্বচ্ছন্দ আন্তরিক স্নেহশীল প্রকৃতি ও চরিত্রগত সৌকুমার্যের আকর্ষণে। ওর স্বভাবের বিশেষত্বই হচ্ছে মাধুর্য, কিন্তু ও নিজে সে সম্বন্ধে সচেতন নয়। লোকচরিত্রে যারা অভিজ্ঞ, তাদের এতে আরো বেশি মুগ্ধ করে। রেণুরও নির্মলকে যথার্থই আপনার ভাইয়ের মত স্নেহ করতে বেশি দিন লাগল না। ওর মধ্যে বরাবরই একটা চাপা ক্ষুধা ছিল ছোট ভাইবোন, পিতামাতা ও পারিবারিক জীবনের জন্যে। পিসিমার বাড়িতেও নানা কারণে র'য়ে গিয়েছিল অতৃপ্ত। বিদেশযাত্রী নির্মলের সঙ্গে যদি আর কেউ থাকত—অভিভাবক পদ-বাচ্য না হ'লেও অন্তত বয়স্ক বন্ধু হিসাবে—তাহলেও হয়ত রেণু এত সত্বর, এত নিঃসঙ্কোচে ওর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পারত না। কিন্তু এখানে প্রতি পদে দেখে ওর এলোমেলো অন্যমনস্ক প্রকৃতি, ভালো-মন্দ বিচার না ক'রে সকলের সকলরকম বন্ধুত্বের আহ্বানে সহজেই সাড়া দেওয়া এবং কেউ একটু ধ'রে বসলেই মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করা। একদিন থাকতে না পেরে ব'লে ফেললে, "তোমার সব কথা শোনা না থাকলে মনে করতাম বুঝি তুমি কোনো নবাবজাদা, নির্মল!"

"কেন দিদি?"

"ভাবী শ্বশুরের পয়সায় যে মানুষ হ'তে যাচ্ছে তার এত বাবুয়ানা কেন ভাই ?"

"আপনি ব্যাপারটা ঠিক বোঝেননি দিদি, কারবার রামেশ্বরবাবুর একলার নয়। আমার বাবা আর তিনি একসঙ্গে ব্যবসায় স্থরু করেন। বাবার অবর্তমানে এখন তিনিই একমাত্র পরিচালক বটে, কিন্তু আমার অংশ রয়েছে সমান—অর্ধেক।"

"ও, দলিলপত্র আছে তো ?"

"বাঃ, তা আর নেই ? তবে সে সব মা জানেন। আমার ঝোঁক যদি একান্তই অন্যদিকে না হ'ত, তবে আমিও এতদিন ঐ কারবারের কাজেই লেগে যেতাম।"

"কিসের ব্যবসা ভাই তোমাদের ?"

"আমদানি, রপ্তানি—বেশির ভাগ বিলেতে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো পাকা খবর আপনাকে দিতে পারব না, আমার কোনোদিনই ও-সব ভালো লাগে না।"

"ভালো লোককে জামাই করতে যাচ্ছেন রামেশ্বরবাবু। সবরকমে তাঁদের উল্টো! তবু তোমাকেই এত মনে ধরল কি ক'রে বলতে পারো নির্মল ?"

"মনে ধরাধরির কথা নয়, এ তাঁদের প্রতিশ্রুতি-রক্ষা। বাবার বাল্যবন্ধু, যৌবনের সহকর্মী, মরণের পরে ট্রাস্টি—"

"এবং একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে—বহুকালের যোগসূত্রকে কোনোমতেই ছিন্ন হ'তে না দেবার অনুরোধ পালন! তোমার নিজের কোনো গুণ নেই, না নির্মল ? কিংবা মেয়ের দিক থেকেও কোনো—"

নির্মল মহা লজ্জিত হ'য়ে চট ক'রে উঠে যায় সেখান থেকে।

স্থপ্রিয়া আর হাসি চাপতে পারে না।

রেণুও হেসে বলে, "তুই বুঝি সব শুনেছিস সু ?"

"না শুনে উপায় আছে ? ভদ্রলোককে এত অপ্রতিভও করতে পারো তুমি ! নির্মলবাবু, চলে যাবেন না, একটু শুনুন—আমাকে ছবি আঁকতে শেখাবেন বলেছিলেন, মনে আছে ?"

"বেশ তো, আসুন।"

"ওকে আর অত নির্মলবাবু-টাবু ডাকা কেন সুপ্রিয়া ? দাদা বলতে পারিস না ?"

"হয়েছে !" সুপ্রিয়া নির্মলের দিকে তাকিয়ে বললে, "তার চেয়ে বরং আপনিই দিদি বলবেন আমায়। সে ঢের বেশি মানাবে।"

নির্মল নতমুখে বললে, "দাদা-দিদি কিছুই বলতে হবে না কাউকে। আপনারা আমায় সোজা নাম ধরেই ডাকবেন।"

রেণু উঠে কাছে এলো, "কী, রাগ হ'ল বুঝি ?···নির্মল তোর থেকে বছর দেড়েকের বড় সুপ্রিয়া, তা জানিস ?"

সুপ্রিয়া বাধা দিয়ে বললে, "বছর দেড়েকের, না দেড়মাসের ?"

রেণু সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "বলুক যা খুসি, ওর কথায় তুমি কান দিওনা নির্মল। ও-মেয়ে আঠারো ছাড়িয়ে সবে উনিশে পা দিয়ে সব বিষয়ে নিজেকে সকলের সমান ভাবতে সুরু করেছে।"

সুপ্রিয়া হাসি চেপে গম্ভীর হ'য়ে বললে "দুজনেই যদি দুজনের নাম ধরেই ডাকি আমরা, সে-ই সবচেয়ে ভালো হয়, না ? সমবয়সী বন্ধু আমার একটিও নেই।"

রেণু হেসে ফেললে, "উনিশ আর একুশকে কি সমান বয়স বলে রে আনাড়ি ! এই বুঝি তোর অঙ্ক-জ্ঞান ? যাহোক, অন্তত এক্ষেত্রে খাঁটি ভারতীয় না হ'লেও চলবে নির্মল। বলুক না ওর যা খুসি।"

"কিন্তু দিদি, আমি এই গতমাসে একুশ পার হ'য়ে গেছি।"

রেণু ওর ক্ষুণ্ণ মুখখানির দিকে খানিকক্ষণ সস্নেহে তাকিয়ে দেখে

বললে, "সু, তোর নিজের বড় ভাই থাকলেও এর চেয়ে বড় হ'ত না।"

সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "বড় কি শুধু বয়সের গুণেই হয় রেণুদি ?" ব'লেই হেসে ফেলে, "নিজে ছেলেমানুষের মতো কথা বলবেন, তবু তাঁকে বড়র মতন মান্য ক'রে কথা কইতে হবে ? আচ্ছা, আপনিই নিরপেক্ষভাবে বলুন না—যদি আপনি না হ'য়ে আর কেউ হ'ত কী করতে উপদেশ দিতেন আমায় ?—হ্যাঁ নির্মলদা ?"

মুহূর্তে নির্মলের মুখের মেঘ কেটে যায়। খুসি হ'য়ে বলে, "জানেন, আমার একটি ছোট বোন ছিল—মামাতো বোন—"

"ছিল—মানে ?"

নির্মল ম্লান মুখে বলে, "গতবছর মারা গেছে।"

সুপ্রিয়া দুঃখিত হ'য়ে বললে, "তারপর ?"

"আমি ওর মাত্র মাসকয়েকের বড় ব'লে ছোট থাকতে কিছুতেই আমাকে দাদা বলতে চাইত না। এর জন্যে কত মার খেয়েছে, তবু না। কোনো কথা বলতে হ'লে ছুটে সামনে এসে বলবে, দূর থেকে আমাকে কখনো ডাকবে না, পাছে কিছু সম্বোধন করতে হয়। সেই শুভা যখন—"

রেণু এতক্ষণ চুপ ক'রে শুনছিল। চকিত হ'য়ে বললে, "কে ? কী নাম বললে ?"

"শুভা। কেন ? চিনতেন সে নামের কাউকে ?"

রুদ্ধশ্বাসে রেণু বললে, "দিল্লীতে থাকত ?"

"হাঁ। রজনীবাবুর মেয়ে। বড়দা সুবিমল—বিমল ব'লেই জানত সবাই। আগ্রা মেডিকেল স্কুলের সেরা ছাত্র, অমন ছেলে—"

"তোমার পুরো নাম সুনির্মল ? প্রায়ই যেতে সেখানে ? ছেলেবেলায় ?"

"হাঁ। কিন্তু যে বছর বড়দা—সে অনেক দিনের কথা—সে-ই শেষ—ও কি, কী হ'ল দিদি? অমন করছেন কেন?"

রেণু প্রাণপণ বলে নিজেকে সংযত ক'রে এক হাতে চেয়ারের একটা হাতল চেপে ধরলে। কিন্তু বারবার প্রয়াস সত্ত্বেও একটি কথাও বলতে পারল না। সুপ্রিয়া ওকে কোনোদিন এতটা বিচলিত হ'তে দেখেনি। হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা কি মনে হ'ল। তখনই উঠে কাছে গিয়ে বললে, "মাথা ঘুরছে?"

বিস্মিত নির্মলের দিকে ফিরে বললে, "কেবিন থেকে স্মেলিং সল্টের শিশিটা নিয়ে আসুন—শিগ্‌গির!"

নির্মল ছুটে চ'লে যেতেই কানের কাছে মুখ এনে বললে, "শান্ত হও দিদি, শান্ত হও!"

"সু, এই নির্মল—"

"বুঝেছি দিদি। আগে তুমি স্থির হও দেখি! চলো আমরা ওদিকে যাই, নইলে এখনি কেউ এসে পড়বে ··· এই যে—বসো এখানে—"

"দিদি আজ কেমন আছেন সুপ্রিয়া ?"

"ভালোই। বললেন, 'অমন মাঝে মাঝেই হয়, ভয় পেও না।" আজ আসবেন ডেক-এ। এডেনে পৌঁছোবার কথা না বিকেলে ?"

"হাঁ চারটে নাগাদ। আসছ তো আমার সঙ্গে ?"

"কোথায় ?"

"জায়গাটা দেখবে না একবার ?"

"এডেনে আবার দেখবার আছে কী ? শুনেছি কিনবার মতো জিনিষও সব ডেকের ওপরেই নিয়ে আসে। তবে আর নেমে কি হবে ?"

"কিছুতেই দেখি তোমার কোনো উৎসাহ নেই। সেই আগেকার ফিলজফারদের মত। কেবল চুপচাপ ব'সে ব'সে ভাবতেই ভালোবাসো।"

সুপ্রিয়া হাসে, "এরই মধ্যে দিদির দলে নাম লিখিয়েছেন সুপ্রিয়ার বিরুদ্ধে ? কিন্তু 'আগেকার, ফিলজফার' আবার কারা ?"

"কেন, জানো না ?—সেই যাঁরা সব ছেড়ে-ছুড়ে বনে গিয়ে ঢুকতেন, নয়ত গুহায় ! কিন্তু দোহাই তোমার, কোনো তর্কাতর্কিতে টেনো না আমায়। আগে থেকেই হার মানছি। বেশ বুঝতে পারি, মস্তিষ্ক-চালনা করতে পেলে আর কিছুই চাও না তুমি। কিন্তু অতটা আমার সইবে না। আমি নিরীহ আর্টিস্ট মানুষ, জীবন নিয়ে থাকি, জীবনকে ভালোবাসি। তার বাইরে কিছু বুঝি না।"

সুপ্রিয়া শোনে আর হাসে, "বেশ তো, আপনার কথাই বলুন। আমিও অপরের কথা শুনতে, অন্যের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে ভালোবাসি। চাই কি, তাতে স্বভাবটা আমার শোধরাতেও তো পারে!"

নির্মল মুহূর্তখানেক ওর দিকে চেয়ে থাকে: "ঠাট্টা করছ বুঝি? কিন্তু সত্যি বলছি সুপ্রিয়া, তোমার এই একান্ত নিরুদ্যম ভাবখানা আমি বুঝতেই পারি না। জীবন থেকে রস সংগ্রহ করতে, নানা সময়ে নানারকম অবস্থায় প'ড়ে, নানা লোকের সঙ্গে মিলে-মিশে, নানান্ জিনিস দেখে-শুনে অভিজ্ঞতায় বাড়তে একটুও ইচ্ছা বা আগ্রহ হয় না তোমার?"

"হয় না! বিলক্ষণ!"

"তবে?"

সুপ্রিয়া একটু ন'ড়ে চ'ড়ে ব'সে, একটু ভেবে বললে, "কী জানেন, আমার মনের সব কথা নিজেই এখনো ঠিক বুঝতে পারিনি। জীবন-সম্বন্ধে কৌতূহল আমার আছে। কিন্তু সেটা আপনি যা বলছেন ঠিক সেরকম নয়। অর্থাৎ দেশ-বিদেশে ঘুরে পথ-ঘাট, হাট-বাজার, মানুষ-জন দেখে বেড়াবার খুব বেশি আগ্রহ যে আছে আমার, তা বলতে পারি না। কিছুই না দেখে একেবারে চোখ বুজে বসে থাকতে চাই, তা-ও নয়। কিন্তু—"

"কী?"

"নিজের কথা অপরকে বোঝানো মুস্কিল।"

"কেন?"

সুপ্রিয়া ইতস্তত করে।

নির্মল ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, "বলবে না?"

"বলব। নির্মলদা, সেদিন্ ঠাট্টা ক'রে সমবয়সী বলেছিলাম ব'লে রাগ করেছিলেন।"

"রাগ নয়, পুরুষের মানে লেগেছিল—এ সহজ কথাটাও বুঝতে পারোনি ?"

"ওঃ, বটে!"—সুপ্রিয়া খানিক হাসে। তারপর গম্ভীর হ'য়ে বলে, "কিন্তু সবটাই ঠাট্টা ছিল না। আপনি আমার দু'এক বছরের বড় বটে, তবু বয়সের পার্থক্যটা আপনার কাছে এলে মনেই থাকে না। বড়দের সঙ্গে যে-সব কথা বলতে সঙ্কোচ হয়, তা কই আপনার সঙ্গে তো হয় না।"

"আমাদের মন বড়-ছোট হিসেব ক'রেই যে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে সহজ বা সঙ্কুচিত হয়, তা আমি বিশ্বাস করি না। এর অন্য কোনো কারণ আছে যা আপাতত আমাদের অজানা। এক একবার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় যে অন্তর্জীবন ব'লে সত্যিই কিছু একটা আছে, এই বাইরেটাই একমাত্র সত্য নয়। সে যাক, কী বলছিলে তুমি।"

সুপ্রিয়া হাসিমুখে বলে, "আপনি নিজেই তার খানিকটা ব'লে দিয়েছেন। বলছিলাম কী জানেন? আমার ইচ্ছা হয় জানতে—এই জগতটা কী বা কেন হ'ল, উদ্দেশ্য কী এর, চলেছে কোথায়? সৃষ্টিকর্তা এর সত্যই কেউ আছে কি না, থাকলে দেখা যায় না কেন তাঁকে?"

নির্মল নিরুত্তরে শোনে।

সুপ্রিয়াও একটুখানি চুপ ক'রে থেকে আবার বলে, "এক কথায়—সত্য কী বা কে? কেন আমি জন্মেছি, কেন এত লোক জন্মায় আর মরে, কেন আসে আর যায়? জগৎজোড়া এ কী বিরাট রহস্য, এর মূলে কি কেউ নেই? নির্মলদা, বলতে পারেন কোথায় কার কাছে গেলে মিটবে আমার এ কৌতূহল?"

নির্মল স্তব্ধ হ'য়ে থাকে।

সুপ্রিয়া বলে, "শুনেছি এক সময় আমাদের দেশে এমন এমন জ্ঞানী ছিলেন যাঁরা নাকি সবই জানতেন, সবই দেখতেন। যদি যাওয়া যেত তাঁদের কাছে আজ, তবে ঠিক বলছি আপনাকে, নিশ্চয় যেতাম। কিন্তু তাঁরা যে এখন মানুষের ধরা-ছোঁয়ার অতীত হ'য়ে গেছেন, ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায় না—"

"ডেকে দেখেছ ?"

"ডাকিনি ? বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—কত ভেবেছি তাঁদের কথা, কত ডেকেছি। কিন্তু কিছুই পাইনি। রাতদিন কেবল অন্তরের শূন্যতা আর ব্যাকুলতা টেনেই বেড়াই।"

নির্মলের বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে, গাঢ়স্বরে বললে, "কি জানি সুপ্রিয়া, এসব বিষয়ের কিছুই তো আমি জানি না। কী যে চাও তুমি, তা-ও ঠিক বুঝতে পারছি না। তেমন অবস্থায় যা-তা একটা ব'লে ফেলাই হবে অন্যায়। তবে এটুকু বলতে পারি যে তোমার মতো আমারও মাঝে মাঝে একটা অকারণ ব্যাকুলতায়, একটা অজানা বিষাদে মনটা ভ'রে যায়। বিশেষ ক'রে কখন্ জানো ? সূর্যাস্তের পরে কখনো কখনো যখন পশ্চিমদিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকি, সূর্য ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকাশটা যখন এক কোমল রঙে রঙীন হ'য়ে ওঠে, সারা জগৎ আস্তে আস্তে হ'য়ে আসে নিস্তব্ধ, পাখীরা নীরবে যায় বাসায় ফিরে, গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকে মৌন অথচ ভাষাময় হতাশায়।"

"হতাশায় ?"

নির্মল নিশ্বাস ফেলে বলে, "কি জানি, আমার তো ওরকমই মনে হয়। তখন সুপ্রিয়া, আমার মনের ভিতরটায় কী যে করতে থাকে, বোঝাতে পারব না। নিজেই বুঝি না। কেবল মনে হয়, আমার কত কী যেন করবার ছিল—করিনি। কা'কে যেন পাবার আছে, কিন্তু আছি

ভুলে। কোথায় কে যেন রয়েছে আমার প্রতীক্ষায়, কিন্তু নিইনি তার খোঁজ। সে যে কী বেদনার অনুভূতি। অথচ সেই সময়টাই সবচেয়ে সুখী আমি। বুঝতে পারো কি এই রকম উল্টোপাল্টা কথা?"

"পারি।" সুপ্রিয়া সোৎসাহে উঠে বসে—"বলুন আরো!"

"চোখে জল আসে, এত গভীর সে মুহূর্তগুলো! মনে হয়, আমি যেন এজগতের মানুষ নই, কেউ কোথাও নেই আমার, আমিও কারও নই, সব বাঁধন ছিঁড়ে এখনি যেন কিসের তরে উদাসী হ'য়ে পথে বেরিয়ে পড়তে না পারলে শান্তি পাবো না!"

"আমারও ঠিক—"

নির্মল হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দেয়—"কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যে? অস্তসূর্যের শেষ আভাটুকু দিগন্ত থেকে বিলীন হবার সঙ্গে সঙ্গে মন ফিরে আসে আবার এই অন্ধকার বাস্তব জগতে। ফিরে আসি আমি আবার আমার তাস-পাশা খেলা-ধূলোর আড্ডায়। কচিৎ কখনো একলা ব'সে পড়াশুনো করি; কিন্তু মিশুক স্বভাব আমার—দেখছই তো।"

সুপ্রিয়া নীরবে সায় দেয়।

নির্মল ব'লে চলে, "তখন সমস্ত জিনিষটাই সেন্টিমেণ্ট ব'লে উড়িয়ে দিই। বন্ধুরা এমনিতেই তো আমাকে ক্ষেপায়, বলে সেন্টিমেণ্টাল—ওদের কাছে এসব কথা বলবার জো-টি নেই।"

"না।"

"আমার ক্ষ্যাপামি সারাবার জন্যে ওরা আমায় জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় সিনেমায়, থিয়েটারে, পার্টিতে মেয়েদের"—নির্মল হঠাৎ থেমে যায়।

সুপ্রিয়া চুপ ক'রে থাকে।

সামলে নিয়ে নির্মল বলে, "এমনিভাবেই গ'ড়ে উঠেছি আমি

তোমার সঙ্গে মেলে বলছিলে? আমি তো কই দেখতে পাই না! শুনলে তো জীবনকে আমি কেমনভাবে ভোগ করতে ভালোবাসি! কয়েক মুহূর্তের রঙীন স্বপ্নকে মনের মধ্যে চিরকাল আঁকড়ে থেকে যখন-তখন একই কথা ভাবি না। স্বপ্ন ছুড়ে ফেলে দিয়ে বরাবর বাস্তবকেই নিই বরণ ক'রে।"

খানিক চুপ ক'রে থেকে আবার বলে, "না নিয়ে উপায়ই বা কী? একদিকে-না-একদিকে নিজেকে ব্যস্ত না রাখলে কোথা থেকে কী যে এক অহেতুক শূন্যতা ঘিরে ধরে মনটাকে! অথচ কেন, তাও জানি না। চোদ্দ-পনের বছর বয়স থেকেই এরকম—আর ঠিক তখন থেকেই—"

"কী?"

একটু হেসে নির্মল বলে, "নানারকম আমোদ-প্রমোদে ঝাঁপিয়ে পড়তে শিখেছি। ক্লাসের পড়াশুনোর ঝোঁক খুব বেশি কোনোদিনই ছিল না আমার, কিন্তু তবু তা-ও করেছি, স্কুলের—কলেজেরও—যতটুকু পড়েছি, পরীক্ষাগুলো ভালোভাবেই পাশ করেছি। তাতেও সময় কাটে না। কারণ, পড়া তৈরি করতে খুব বেশি খাটতে হ'ত না আমায়। বাকি সময়টা কাজে কাজেই আড্ডা—তাস, টেনিস, বিলিয়ার্ড—"

"সব বিদ্যাই জানা আছে তা'হলে!"

"না থেকে উপায় কী? আর কী-ই বা করতাম তা না হ'লে?"

"কেন, আপনার আর্ট?"

নির্মলের মুখ একটুখানি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে—"হাঁ, আছে বটে ওই একটা জিনিস। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে বাড়ীর লোকেরা আমার আর্টিস্ট হবার দুরাশাকে অনেক দিন ধ'রে আমোলই দেয়নি। ওরা জোর ক'রে আমায় কাজের লোক বানাতে চেয়েছিল। শেষে নেহাৎ পারল না বলেই না!"

"কি করেছিলেন শুনি?"

"বেরিয়ে গিয়েছিলাম সন্নিসী হ'য়ে।"

"বলেন কি? কতদূর?"

"দৌড়—মোটে দিল্লি আর আগ্রা পর্যন্ত। দিল্লিতে আমার আত্মীয়—যাঁদের কথা বলছিলাম কাল—"

"হাঁ।"

"ভালো কথা, দিদি তো চেনেন তাঁদের। অনেকদিন দিল্লিতে ছিলেন বুঝি?"

"অনেক দিন।"

"বড়দা মারা যাওয়ার পরে কতকাল আর সেদিকে মাড়াইনি।"

"কি হয়েছিল বিমল বাবুর?"

নির্মল সমুদ্রের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে থাকে।

"ওকি, চোখে জল? ক্ষমা করবেন—না বুঝে জিজ্ঞেস ক'রে ফেলেছি—নির্মলদা!"

সজল কণ্ঠে নির্মল বললে, "বড়দা আত্মহত্যা করেছিলেন।"

সুপ্রিয়া চম্‌কে ওঠে।

নির্মল আস্তে আস্তে বলে, "ছ'সাত বছর আগেকার কথা। বয়স আমার তখন বছর চোদ্দ, কি সবে পনেরয় পা দিয়েছি—"

"ঐ ঘটনার পর থেকেই বুঝি সব শূন্য বোধ হ'তে সুরু করে আপনার?"

"তখন থেকে সুরু। সে যে কী আঘাত! দিল্লিতে যেতাম শুধু বড়দার জন্যেই তো! তিনি ছিলেন আমার হিরো। ছোট থেকেই আমি মনের মধ্যে কাউকে-না-কাউকে ওয়ারশিপ না ক'রে থাকতে পারতাম না। স্বভাব!—গুরুর মতো ভক্তি করতে শিখেছিলাম তাঁকে, অত বড় হৃদয় আজ পর্যন্ত আর কারোর মধ্যে

দেখিনি। তিনি চলে যাবার পর মনে হ'ল সব মিথ্যে—ধর্ম মিথ্যে, ভগবান মিথ্যে! নয়তো এত বড় একটা প্রাণ জগতকে দিয়ে এমন মিছিমিছি, এত সাংঘাতিকভাবে নিতে পারেন তাকে ছিঁড়ে? আর ভালো লাগত না কিছুই। কেবলই মনে হ'ত—সত্য ব'লে কি কোথাও আছে কিছু? এই যে আমার দাদা এলো আর এমন ক'রে গেল—এর মধ্যে কি কোনো সত্যই পাই খুঁজে? যে একদিন আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছিল—বাড়িতে, কলেজে, ক্লাবে—যখন যেখানে গেছে—জুড়ি ছিল না যার, এত গুণবান আর রূপবান অমন জীবন্ত সত্য মানুষটা দু'ঘণ্টার মধ্যে—"

সুপ্রিয়ার চোখে জল আসে।

কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে নির্মল বলে, "কতবার মনে মনে তাঁকে ডেকেছি জানো? কেঁদে বলতাম—'আর কিছুর জন্যে না হোক্ অন্তত আমার মনের এই সন্দেহ আর শূন্যতা ঘোচাবার জন্যে একটিবার তুমি দেখা দিয়ে যাও দাদা!' কিংবা মরণের পরে কোথাও কিছুই যদি না থাকে, জীবনটা যদি নিছক ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদের মতনই, তবে তা-ই বা কেন নিঃসংশয়ে জানতে পাই না? সংসারে সবই যদি মিথ্যে—আদর্শ বলো, মহৎ কর্ম বলো, প্রেম বলো—সকলই মানুষের মনগড়া কল্পনা মাত্র,—যে মানুষ এই আছে এই নেই, তবে কেন এত দুঃখ করা বড় হবার জন্যে, বড় কাজ করবার জন্যে? ম'রে গেলেই তো হয় স্রোতের মুখে কুটোখানির মতো!"

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে নির্মল।

সুপ্রিয়া সাগ্রহে বলে "তারপর?"

"তারপর—কিছুই না। খুব ভয়ানক রকমের চিন্তাশীল প্রকৃতি নয় আমার কোনোদিনই—"

"নিজের প্রকৃতি চেনা এতই সহজ মনে করেন?"

"অন্তত তখন তো কিছুই ভালো মতো ভেবে দেখতে পারতাম না—কেবল দুঃখ আর দুঃখ!—ছেলেমানুষি-রকমে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল পৃথিবীতে সত্য ব'লে যদি কিছুই থাকে, তবে বড়দা আমার কোথাও না-কোথাও আছেনই। কিন্তু এত ডেকে এত কেঁদেও যখন কোনো সাড়াই পেলাম না, সে বিশ্বাস গেল ভেঙে। নিজেকে আর খাড়া রাখতে পারলাম না।"

"কি করলেন?"

"সে আর তুমি জানতে চেও না। বললেও বুঝবে না। শুধু এটুকু বলতে পারি—একেবারেই ব'য়ে যেতাম যদি না—গুজরাটে থাকার দরুণ—গান্ধীজির সংস্পর্শ পেতাম। ননকো-অপারেশনে দেশ উদ্ধার না হোক, অন্তত একটি ছেলেও যে—" নির্মল থেমে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "বিশ্বাস আবার পেলেন ফিরে?"

"বিশ্বাসের কথা জানি না। আজকাল আর ওসব নিয়ে মাথাও ঘামাই না। মন যে এখন শক্ত হ'য়ে গেছে সুপ্রিয়া! তাছাড়া শোকের আঘাতও কি চিরকালই থাকে? সময়ে মুছে যায়—সব মুছে যায়!"

"কেন আপনার দাদা হঠাৎ ওরকম করলেন তার—"

"স্পষ্ট কিছুই জানা যায়নি। কেউ বলে প্রেমে হতাশ হ'য়ে, কেউ বা বলে প্রতারিত হ'য়ে। শেষেরটাই সম্ভব। মানুষকে যে বড্ড বিশ্বাস করতেন তিনি।"

"ঠিক আপনার মতো!"

"আমার মতো? না, আমি অত ভালো ছেলে নই। বড়দা ছিলেন আর এক যুগের মানুষ। এমন ক'রে নিজেকে বিলিয়ে দিতে কম লোককে দেখেছি আমি। যারা বন্ধু-বান্ধবকেই নিজের এতখানি এমন সহজে দিয়ে দেয়, কোনো মেয়েকে সত্যি সত্যি ভালোবাসলে

তারা তো—কিন্তু থাক, তাঁর কথা আর না।···দিদি কি আজ আর আসবেনই না? এডেনে পৌঁছোতে আর তো বেশি দেরি নেই।"

"দেখে আসছি।"···

সিঁড়ির মুখে রেণুর সঙ্গে দেখা।

"এই যে দিদি, এসো। নির্মলদা ভারি ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।"

রেণু উঠে এসে হাসিমুখে বললে, "এত ব্যস্ত কেন নির্মল?"

"বা, এডেন দেখব না বুঝি? আপনারা না নামলে আমাকে আবার অন্য সঙ্গী খুঁজতে হবে। এখন কেমন আছেন? নামতে পারবেন তো? সুপ্রিয়া তো নড়তেই চায় না।"

"সহরটা একবার দেখা উচিত বটে। অন্তত কেউ জিজ্ঞেস করলে বোকা বন্‌তে হবে না। কিন্তু আমার যে ভাই নামবার যো নেই, মাথাটা এখনও ঘুরছে। দেশে ফিরবার পথে এই এডেন দিয়েই তো আসব আবার।"

"বেশ, আমি তবে চললাম ডাক্তার কাওয়ানদের সঙ্গে। ওরা ডেকেছিল নিজে থেকে।"

"ওরা কে? মিস রায়ান তো? গৌরবে 'বহুবচনী'?"

"যান দিদি, আপনি বড় ইয়ে—"

"বলো না কে ডেকেছে? মিস রায়ান না?"

"হুঁ। বলছিল সবাই দল বেঁধে একসঙ্গে গেলে বেশ হয়। তবে যদি আমার বন্ধুরা অর্থাৎ আপনারা—পছন্দ না করেন—"

সুপ্রিয়া হেসে উঠল।

রেণুও মুখটিপে হেসে বললে "কেন, আমরা বুঝি দল-ছাড়া?"

নির্মল অপ্রতিভ হ'য়ে বললে, "উনি তা-ই বললেন কিনা! বোধ হয় ভেবেছেন আপনাদেরই আপত্তি থাকতে পারে। সবাই দেখে কিনা যে কারো সঙ্গে বড় মেশেন না আপনারা।"

"মিশব কার সঙ্গে? ওঁরা, আরে না-না, উনি, কি ভুলেও কখনো আসেন আমাদের কাছে? জোর ক'রে তো আর নিজেদের সঙ্গ চাপাতে পারি না কারো ওপর? কি বলো?"

"এলে মিশবেন? ধ'রে নিয়ে আসব কালই।"

"না ভাই, উটি কোরো না। আমাদের সঙ্গ পাবার জন্যে মিস রায়ান যে ঠিক লালায়িত নন, এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি। বরং যে জন্যে—" বাকি কথাটা তাড়াতাড়ি সামলে নেয় রেণু।

সুপ্রিয়া মুখ ফিরিয়ে হাসে।

নির্মলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে মিস রায়ানের একান্ত প্রয়াস এ কয়দিন ধ'রে সবাই লক্ষ্য করেছে। সুপ্রিয়ারা মাঝখানে না থাকলে ওকে খুব বেশি বেগও পেতে হ'ত না।

অপ্রস্তুত নির্মলের দিকে তাকিয়ে রেণু হাসিমুখে বললে, "যাও ভাই, আর দেরি কোরো না। ওদের ব'লে রাখগে আগে থেকে।"

নির্মল উঠে গেল।........

ক্লান্ত-স্বরে রেণু ডাকলে "সু, কাছে আয়।"

"মাথায় হাত বুলিয়ে দেব, দিদি?"

"না ভাই, তুই শুধু চুপ ক'রে ব'সে থাক আমার কাছে।"

সুপ্রিয়া ওর হাতখানা হাতে নিয়ে নীরবে ব'সে থাকে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। যাত্রীরা একে একে এডেন থেকে ফিরে আসছে। ছোট ছোট সাম্পানগুলো জাহাজের ঝুলানো সিঁড়ির কাছে ভিড়তে-না-ভিড়তে রেণু উৎসুকনেত্রে চেয়ে দেখে নির্মল এলো কিনা।

সুপ্রিয়া অনেকক্ষণ থেকে ওর উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করছিল। শেষে আর থাকতে না পেরে বললে, "রেণুদি, ছেলেমানুষটি তো নন নির্মলদা! গেছেনও ডাক্তারদেরই সঙ্গে।"

"ছেলেমানুষ নয়! ভয়ঙ্কর ছেলেমানুষ। তোর সঙ্গে কী কথা হয়েছে শোনবার পর থেকে ওর সম্বন্ধে ভয় বরং আমার আরো বেড়ে গেছে। ওরা সব করতে পারে—স-ব! যখন যেদিকে ঝুঁকবে একবার, কারো কথা ভাববে না, কোনোদিকে চেয়ে দেখবে না। তাই তো—"

অস্পষ্ট আলোকে সুপ্রিয়া ঠাওর ক'রে চেয়ে দেখে—রেণু কাঁদছে। সযত্নে অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বললে, "বলবে না আমাকে তোমার সব কথা? লোকে দুঃখকষ্টের কথা বন্ধু-বান্ধবকে ব'লে তবু তো একটু শান্তি পায়!"

"সব কথাই সব বন্ধু-বান্ধবকে বলা যায় না রে সু। এমন জিনিষও আছে—সত্যিকার দরদী না হ'লে—কিন্তু তুই আমার সে রকম বন্ধুই। বলি তো তোকেই বলব।"

"তবে আজই বলো।"

"নির্মল ফিরে আসুক।"

"তাঁকে কেন?"

"সেও শুনবে।"

"সেটা কি ভালো হবে রেণুদি?"

রেণু একটু ভেবে বললে, "আমার বিশ্বাস ভালোই হবে। ওর বড়দাকেই সংসারে সবার চাইতে ভালোবাসত সে। শুনে রাখুক কী ক'রে, কেন—"

কথা শেষ হ'তে পায় না। দেখা গেল মিস রায়ানের দল স-কলরবে জাহাজে ফিরে আসছে। রেণু গলা বাড়িয়ে দেখে নির্মলও পিছন

পিছন আসছে। পরণে এ কয়দিনের ধুতি পাঞ্জাবীর পরিবর্তে ইউরোপীয় পোষাক। তাতে বেশ একটু বড়ও দেখাচ্ছে ওকে। বোঝা শক্ত নয় মিস রায়ানের এত অনুগ্রহ কেন ছেলেটির উপর। সত্যি সুশ্রী দেখতে, কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্যের চেয়েও টানে যা, নির্মলের চেহারায় রয়েছে সেই সম্পদ। ওর অন্তরের বৈশিষ্ট্য, স্বভাবের মাধুর্য আর শিল্পীচিত্তের কমনীয়তা সমস্ত মুখখানায় এমন একটা রূপ ফুটিয়ে তুলেছে, যা এত পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে কুৎসিতকেও মনে হয় সুন্দর। নাক, চোখ বা প্রতিটি অবয়বের সুসমঞ্জস, সুন্দর গঠনই যে সৌন্দর্যের একমাত্র উপাদান নয়, আরো এক জাতীয় রূপ যে থাকতে পারে যার মূল একেবারে অন্তর্লীন, নির্মলকে দেখে রেণু যেন আজ আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি করল সে কথা। মনে মনে ভাবলে, "কেবল আর একটু—একটু যদি পৌরুষের ছাপ থাকত! সবটাই এত কোমল না হ'য়ে, আরো যদি দৃঢ়তা ফুটে উঠত চোখেমুখে! যদি কোনো কঠিন ভিৎ থাকত এতখানি লালিত্যের! কি জানি, হয়ত পরে—"

"কী ভাবছ অত, রেণুদি? এদিকে নির্মলদা যে চ'লে গেলেন।"

"কই, কোথায়?"

"মিস রায়ানের সঙ্গে ওদিকে—এই যে, এবার দেখেছেন তোমায়।"

নির্মল ওদের দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে, কি ভেবে তাড়াতাড়ি কাছে এলো।

রেণু জিজ্ঞাসা করলে, "এডেন কেমন লাগল নির্মল?"

"ওঃ, যা ফুর্তিটা হ'ল আজ! বলব সব পরে। এখন একটু কাজে যাচ্ছি, কিছু মনে করবেন না।"

"কী কাজ?"

"উনি অনেক জিনিষপত্র কিনেছেন, সেগুলো একটু গুছিয়ে ঠিক ক'রে দিতে হবে!"

"আবার উনিটি কে ? মিস রায়ান ? কিন্তু কাজ তো আমাদেরও ছিল তোমার সঙ্গে।"

"ওঁকে কথা দিয়ে ফেলেছি যে। লক্ষ্মী দিদি, আসছি আমি যত শীগ্‌গির পারি। দাঁড়িয়ে আছেন—দেখছেন না!" নির্মল ছুটে চ'লে গেল।

"মিস রায়ান জিনিষ গুছিয়ে দেবার আর লোক পেল না স্থ ?"

"তাই তো দেখছি। ডাক্তারের কী হ'ল ?"

"বোধ হয় তত মনে ধরেনি। কিংবা একেও হাতে রাখছে। ডাক্তার তো ফিরবে সেই পচা গ্লাসগো সহরে, সেখানে গিয়ে হয়ত মিস ডরোথীর নামও করবে না আর। লণ্ডন সহরের ফূর্তি লুটবে কার সঙ্গে আমাদের নির্মল বাবুর মতো দু'একজন নাবালক নবাবজাদা হাতে না থাকলে ? মেয়েটি এ বয়সেই ওস্তাদ, লোক চেনে বেশ। কথা দিয়ে কথা ভাঙতে ভয় পায়, এধরণের লোককেই ওর পছন্দ আর প্রয়োজনও বেশি, যদিচ ডাক্তারের মতো দু'দিনের প্রমোদের সঙ্গীকেও পারতপক্ষে নিজে থেকে ছাড়তে চায় না। কিন্তু নির্মলের মতন লোকের ওপরই সত্যিকার ভরসা ওর—শেষ টালটা সামলাবার জন্যে। সংসারে কত রকম লোকই যে আছে!"

সুপ্রিয়া উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললে, "তুমি সাবধান ক'রে দাও না কেন ওঁকে ?"

"নির্মলকে ? যদি ভেবে বসে বাইরের লোকের এতে কথা কওয়ার কী অধিকার ? তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে কিছু বললেই অনেক সময় উল্‌টো ফল হয় যে। না, চুপ ক'রে দেখে থাকা ছাড়া কোনো উপায়ই নেই।"

"হয়ত কিছুই হয়নি ওঁর মনে। মিছে ভাবছ তুমিই।"

"ভাবনাটা মিথ্যে হ'লেই খুসি হই। হয়ত সত্যিই বেশিদূর গড়ায়নি এখনো। কিন্তু—ওদের রক্তের মধ্যেই আবেগ যে উদ্দাম—"

সুপ্রিয়া বাধা দিয়ে বললে, "থাক্ নির্মলের ভাবনা। তোমার নিজের কথা বলো এখন। বলবে তো?"

"কেবিনে চল্ তাহ'লে।"

কেবিনে এসে জানালাটা খুলে দিতেই সুপ্রিয়া চেঁচিয়ে উঠল, "মাগো, ঐ দেখ পোর্ট-হোল্ দিয়ে কে উঁকি দিচ্ছে! দেখ, দেখ, কী চায় লোকটা? চোর-টোর নয় তো?"

রেণু উঠে দেখে বললে, "না রে, চোর নয়।"

"এই আরবগুলোকে দেখলে ভয় করে আমার। এখনো ওরা নৌকো নিয়ে জাহাজের চারপাশে ঘোরাফেরা করছে কেন?"

"জিনিষ-পত্তর যা এনেছে, তা-ই বিক্রি করবার জন্যে ঘুরছে আর কি। তবে, সুবিধে পেলে—অর্থাৎ কেবিনের দোর-জানালা যদি খোলা পায়—চুরি করতেও ছাড়ে না। আচ্ছা, দে জানালাটা বন্ধ ক'রে। হয়েছে, এইবার বোস আমার কাছে এসে। না, না, আলোর দরকার নেই, বরং পাখাটা খুলে দে।"

খানিক চুপ ক'রে থেকে রেণু বললে, "ভেবেছিলাম আমার সব কথা আরো কিছুদিন পরে বলব—যখন তুই, আর কিছু না হোক, অন্তত লোক-চরিত্রে আর একটু অভিজ্ঞ হবি। কিন্তু বারবার এতটা আগ্রহ ক'রে শুনতে চাচ্ছিস যখন, বলব না বলাও মুস্কিল আমার পক্ষে।"

"থামলে কেন? বলো!"

"এই যে নির্মলকে দেখছিস, ওর দাদা ছিল অনেকটা ওরই মতো। না, মুখে নয়, কিন্তু অমনি লম্বা আর একহারা গড়ন, চুলগুলো অমনি ঈষৎ কোঁকড়া, সমস্ত শরীরে অমনি মেয়েলি লালিত্য আর মাধুর্য। কে যে ওকে বলেছিল ডাক্তারি পড়তে কে জানে? ওরা হচ্ছে যাকে বলে born আর্টিস্ট। জোর ক'রে ওদের অন্য কাজে আটকাতে চাওয়াই

ভুল। অন্তরের প্রেরণা ছাড়া এক পা ঠিকভাবে চলতে পারে না ওরা। সংসারের আর দশজনের মতন তো নয়, তবু কেন যে লোকে বোঝে না! বিমলের বাপ-মাও বোঝেন নি। বড় ছেলে, ভবিষ্যতে ওরই হাতে পড়বে সমস্ত পরিবারটার ভার। অতএব দিলেন ঠেলে ডাক্তারি লাইনে! প্রথম প্রথম নাকি ভয়ানক কষ্ট হ'ত। ক্লাস পালিয়ে গিয়ে নির্জনে লিখত কবিতা। নির্মলের রুচি গেছে ছবি আঁকার দিকে, ওর দাদা ঝুঁকেছিল গান আর কবিতায়। কবিতা কেমন লিখত জানি না, কিন্তু ওর গান! সে যে কী, নিজের কানে না শুনলে বোঝবার উপায় নেই। এই গানের জন্যেই, অর্থাৎ গান শুনতে গিয়েই আমার পরিচয় ওর সঙ্গে। কিন্তু সে কথা বলছি পরে। কি ক'রে শেষটা ডাক্তারিতে এত ভালো পাশ করল, সেকথাই আগে শোন্।

"শুভা—যার কথা কাল নির্মল বলছিল তোকে—তার বড়দিদি চারুর সই ছিল লতিকা। দুজনে আমারই সমবয়সী। লতিকাদের বাড়িও এই দিল্লিতে, মস্ত বড় লোক ওর বাবা। অনেকদিন থেকে, প্রায় প্রথম যৌবন থেকেই নাকি বিমল ভালোবাসত ওকে, কিন্তু সে কথা আমি জানলাম অনেক পরে। বিমলকে প্রথম দেখি ওদের বাড়িতেই—গানের আসরে। দিল্লি এলেই বেশির ভাগ সময় কাটত ওর গান গেয়ে। আগ্রা আর দিল্লি এ'দুটো জায়গার বাঙালীদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে সুবিমল সেনকে চিনত না বা একবারও গান শোনে নি ওর। লতিকার বাবা ইচ্ছে করলে বিমলকে ডাক্তারী পড়ার কবল থেকে উদ্ধার করতে পারতেন। কিন্তু ওঁর আদর্শ জামাতার যে বিলেত ফেরতা হওয়া চাই! বড় বড় সাহেব-সুবোর সঙ্গে পরিচয় থাকা, মেয়েকে বছরে বার-তিনেক দার্জিলিং, সিমলা, মারীপাহাড়, কাশ্মীরের হ্রদ ইত্যাদিতে ঘুরিয়ে আনবার ক্ষমতা রাখা—এ না হ'লে কি চলে

ঐশ্বর্যের ! বিমলের বাবার অবস্থা ভাল হ'লেও ধনী বলা যায় না তাঁকে। তাছাড়া বিমলই একমাত্র সন্তান নয়।

"কাজেই হাতের কাছে এমন ছেলে থাকতেও লতিকার অন্যত্র বিয়ের কথাবার্তা চলতে লাগল। ওদের বড়লোকের সমাজে যেমন হয়, অর্থাৎ মা-বাপের মনোনীত, ভাবী জামাই হবার যোগ্য ছেলের সঙ্গে মেলা-মেশা—টি-পার্টিতে, টেনিস-কোর্টে, ডিনারে। পরে চারুর কাছে শুনেছিলাম বিমলের এ সময় প্রায় পাগল হবার উপক্রম। নয়ত ওর মতন অভিমানী, আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে অতি স্পর্শকাতর ছেলে লতিকার বাপের কাছে গিয়ে হাতে পায়ে ধ'রে প্রতিজ্ঞা করে যে, যেমন ক'রে হোক পাশ করবে ডাক্তারি, বিলেত যাবে আর তাঁদের মেয়ের উপযুক্ত হ'য়ে ফিরবে!"

"আশ্চর্য তো!"

"শুধু তা-ই নয়—তারি জন্যে আজ থেকে ছাড়বে সকল রকম খেয়াল—গান আর কবিতাও ওর কাছে তখন খেয়াল মাত্র!—লতিকার বাবার একটু স্নেহ ছিল বোধ হয় ওর ওপর। তিনি রাজি হ'লেন অপেক্ষা করতে।

"তাই তো অত ভালো ক'রে ডাক্তারি পাশ করল বিমল। নইলে—আমি তো জানি কত ঘৃণা করত ও ডাক্তারি ওকালতিকে!"

"লতিকাকে তাহ'লে খুবই ভালো বাসতেন উনি?"

"বাসতো বই কি। বললুম তো, এমন অপ্রিয় কাজেও ওর সফলতার কারণই ছিল এই ভালোবাসা। এমন সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসতে দেখেছি কম লোককেই। এ হ'ল তিলে তিলে আত্মদান! সবাই জানত গান ছিল ওর হৃদয়ের জিনিষ, ওর প্রাণ! তবু তা-ই ছেড়ে দিল লতিকার জন্যে! কিন্তু জানিস সুপ্রিয়া, এধরণের লোকেরা সংসারে কখনোই সুখী হয় না। মেয়েদের প্রেম

দেয় তাদের প্রেরণা, স্বীকার করি। কিন্তু তাতে বঞ্চিত বা প্রতারিত হ'লে, কিংবা প্রতারিত হয়েছে কল্পনা করলেও, সেই প্রেমই ওদের হ'য়ে দাঁড়ায় কাল।

"কেবল ভাবি, কেন যে এরা উচ্চতর জিনিষকে ভালোবাসে না! কোথায় এমন কোন্ মেয়ে আছে বল্ তো—যে হ'তে পারে সম্পূর্ণভাবে যে-কোনো সুন্দরের পূজারীর, সত্যের ভক্তর অহেতুক প্রেমের উপযুক্ত পাত্রী? নারীও তো মানুষ—পদে পদে তারও আছে স্খলন! তা'তে এরা আহত হয়, হৃদয় ওদের রক্তাক্ত হয়ে ওঠে; তবু বোঝে না যে, সমগ্র সত্তা দিয়ে যাকে অমন আঁকড়ে ধরতে যায়, যাকে ধ'রে অন্তরের ক্ষুধা মেটাতে চায়, যার কাছে আপনাকে ঢেলে দিতে চায়, সে কিছুতেই অতখানি নিতে পারবে না, নিতে জানবে না। কারণ, মানুষের সে যোগ্যতা নেই যে যথার্থ ভালোবেসে হৃদয়ের অতৃপ্ত বুভুক্ষাকে তৃপ্ত করতে পারে। ওরাও জানে না অন্তর ওদের এমন ক'রে খুঁজছে কা'কে!"

"কা'কে?"

"এ সেই প্রেম সুপ্রিয়া, যা নিজেরও অজ্ঞাতে অহরহ পূর্ণকেই খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু অন্ধের মতো।"

"রেণুদি!"

"কী?"

"তবে না তুমি ভগবান মানো না, কিছুই মানো না? বড় যে ঠাট্টা করছিলে আমায় সেদিন?"

"ওরে সু, আমি কী মানি আর কী যে মানি না, তা কি নিজেই জানি রে? কিন্তু কে ভগবান, কোথায় তিনি—"

"আমিও জানি না। অতএব থাক্ তাঁর কথা। বলো যা বলছিলে।"

"বলছিলাম কি—কেন মানুষ মানুষের থেকে মহত্তর, যোগ্যতর, সত্যতর কিছুকে ভালোবাসে না? কতদিন ধ'রে এ-ই ছিল আমার দিন-রাতের ভাবনা, আমার সমস্যা।—"

সুপ্রিয়া সাগ্রহে বললে, "কোনো মীমাংসা খুঁজে পেয়েছ দিদি? মানুষকেই সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসার চাইতেও বড় কিছু আছে কি পৃথিবীতে? যদি থাকে তবে কী সে? আদর্শ, বিজ্ঞান, আর্ট? কোনো ব্রত?"

"কোনো নিশ্চিত মীমাংসাই এ পর্যন্ত পাইনি। পেলে কি আজ—"একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে বললে, "তবু মনে হয়, ওর আর্টকেই যদি বেশি ভালোবাসত বিমল, সেটিই যদি জুড়ে থাকত ওর সমস্ত মন প্রাণ! অন্তত এ লাভটুকু হ'ত তা'তে—অকালে অমন একটা প্রাণ—"

"সেদিন কেন তবে আদর্শের চাইতে মানুষকেই বেশি ভালোবাসতে বলছিলে? তোমার কথাগুলো উল্‌টো-পাল্‌টা ঠেকছে যে। মনে আছে, কী বলেছিলে?"

"আছে। কিন্তু তুই আমার ওকথাটা ঠিক বুঝতে পারিস নি। তোর সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল, কারো সঙ্গে কতগুলো মতে মেলে আর সেজন্যে তাকে ভালো লাগে ব'লেই, সেই ভালোলাগাকে ঠাহর ক'রে নিয়েছিস প্রেম। তাহ'লে ঠকবি; কোনোদিন যেই দেখবি মতে মিলছে না, অমনি ধ্বসে যাবে মন-গড়া প্রাসাদ। কিন্তু হৃদয় থেকে স্বতই আসে যে স্নেহ, যে আত্মদান, জীবনের শত ত্রুটি, শত অপরাধের ওপরে থাকে সে স্থির অটল অচল—আপন মহিমায়। সে প্রেমই শুধু সত্যি।"

"বুঝলাম।···বিমলবাবুর কি হ'ল তারপর?"

"বলেছি তো, পাশ করল ভালো ক'রেই। লোকে শুনে অবাক

হয়, বলে—'যেমন গান-বাজনায় আমোদ-আহ্লাদে, তেমনি পড়া-শুনোয়! ছেলে তো নয়, হীরের টুকরো!' আমরা তখন নীচু ক্লাসের ছাত্রী। বিমলের খ্যাতি ক্লাসের টিচারদেরও মুখে মুখে। কিন্তু যার জন্যে এত, সে-ই বুঝল না। ভিতরে ভিতরে কী-যে হ'ল, লতিকার বাবা রাখলেন না তাঁর কথা। সব দোষ অবশ্য নিলেন নিজেরই ওপর, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁকে বাধ্য হ'য়েই ওরকম করতে হয়েছিল। সে যা-ই হোক, বিমলের পরীক্ষার মাসকয়েক পরেই লতিকার বিয়ে হ'য়ে গেল—এক তরুণ ব্যারিস্টারের সঙ্গে।"

"সর্বনাশ! তাইতেই বুঝি—"

"না রে, বিমল সে ধাক্কা সামলে নিয়েছিল। হাজার আবেগ-প্রবণ হ'লেও অত সহজে কেউ মরে না। কিন্তু তখন থেকেই ওর মনটা গেল ভেঙে; মানুষের ওপর সে সরল বিশ্বাস এর পরে কি আর থাকতে পারে? পরে আমায় বলেছিল—ওর কেমন একটা অনুভূতি হয়েছিল এ দুঃখের সময় যে ওর সঙ্গে সঙ্গে ভগবান আছেন। অন্তত এমন এক অদ্ভুত শক্তি—যা মানুষের নয়, অথচ তারই স্পর্শে পেত সান্ত্বনা! কতবার কত পাগলের মতো উদ্ভট ইচ্ছা থেকে এই অনুভূতিই নাকি বাঁচিয়েছে ওকে।"

"আশ্চর্য তো!"

"ওর নানারকম অনুভূতির কথা শুনলে অবাক লাগত। বুঝতে পারতাম না কিছুই, সন্দেহ হ'ত এক এক সময়—দুঃখে কষ্টে বুদ্ধি-ভ্রংশ হয় নি তো? লতিকার চপল স্বভাবের—"

"লতিকা কি আগে ভালবাসত ওঁকে?"

"ছেলেবেলার সাথী, বুঝতেই পারিস ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ছিল নিশ্চয়ই। তাছাড়া একতরফা কখনো এতখানি টান হ'তে পারে—যেমন ছিল ওর জন্যে বিমলের?"

"তোমার সঙ্গে আলাপ হ'ল কি ক'রে বললে না ?"

"পরিচয় ছিল বরাবরই। চারু—শুভার দিদি—বলেছিই তো, আমারই সমবয়সী। কিছুদিন একসঙ্গে পড়েছিও। প্রায়ই নিয়ে যেত ওদের বাড়ি। মা নেই, কেউ নেই শুনে ওর মা ভারি স্নেহ করতেন আমায়। ছুটিতে মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি গিয়ে থাকতামও দু'একদিন।"

"তবে কেন নির্মলকে চিনতে পারোনি ? সেবাড়িতে ওকে দেখেছিলে নিশ্চয় ?"

"না। ওরা আসত লম্বা ছুটিতে। একটি মাত্র ছেলে, তায় ছেলেমানুষ, মা ওকে একলা ছাড়তে চাইতেন না। ওরা আসত যে সময় আমি তখন কলকাতায় পিসিমার বাড়িতে। চারুর কাছে সব শুনতাম, বিমলের সঙ্গে তোলা ফটোও দেখেছি। কিন্তু ও তখন কতটুকু ? এত বছর পরে ঐ সামান্য ছবির পরিচয়ে চিনতে না পারা—"

"অপরাধ হয়নি। যাক সেকথা। তারপর ?"

"ছুটিতে যখনই ওবাড়ি যেতাম, বিমলের সঙ্গে দেখা হ'ত প্রায়ই। এমন সুন্দর পড়া বুঝিয়ে দিত !" সাবধানে একটি নিশ্বাস ফেলে রেণু বললে, "মনে রাখিস, আমি তখনো ওর বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানতাম না। ভালো ছেলে, লতিকার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল—হ'ল না, এইটুকুই শুনেছিলাম। আমি কেবল দেখতাম ওর বিমর্ষ ভাব, আর বাড়িসুদ্ধ লোকের চাপা অসন্তোষ কোনো কাজ কর্মই করে না ব'লে।

"একদিন কথায় কথায় ব'লে ফেললাম, 'আপনি এমন চমৎকার পড়া বুঝিয়ে দেন যা আমাদের লেকচারারও পারেন না !'

"বিমল বললে, 'তাই নাকি ? কিন্তু তাতে আর বাহাদুরিটা কোথায় ? পড়া বিদ্যেটা কাজে খাটানোই মুস্কিল।'

—'কেন? ডাক্তারি আপনার ভালো লাগে না?'

"অন্যমনস্কভাবে বললে, 'না।'

'তবে আর কিছু পড়লেন না কেন? এত কষ্টে ডাক্তারি প'ড়ে—'

"বিমল উত্তর দিল না।

"আমি না জেনে আবার ব্যথা দিলাম ওকে। বললাম, 'চারু বলে কী জানেন?—আমার দাদা রাতদিন গান বাজনা আর বাজে পড়াশুনো নিয়ে থাকে। আপনি সাহিত্যে বি-এ, এম-এ পড়লেন না কেন? বোধ হয় সে-ই বেশি ভালো হ'ত আপনার পক্ষে, না? জোর ক'রে ডাক্তারি প'ড়ে কী লাভ হ'ল?'

"বিমল চমকে বললে, 'কী বলছেন? ডাক্তারি কেন পড়লাম? সে অনেক কথা। কিন্তু—' ব'লে হঠাৎ রুষ্টভাবে বললে, 'তাতে বাইরের লোকের মাথাব্যথা কেন এত? চারুই বা যাকে-তাকে ঘরের কথা বলতে যায় কিসের জন্যে?'

"ভয়ানক দুঃখ হ'ল। উঠে চ'লে এলাম।......

"বিকেলে বাগানে বেড়াচ্ছি। মনটা ভালো ছিল না। একলা ঘুরতে-ঘুরতে বাগানের একেবারে নির্জন দিকটায় পৌঁছে দেখি, ঘাসের ওপর শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে প'ড়ে আছে বিমল। ফিরব ভাবছি, শব্দ শুনে চেয়ে দেখলে। তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বললে, 'চ'লে যাবেন না, আসুন।'

"থতমত খেয়ে বললাম, 'এমনি একটু বেড়াচ্ছিলাম। আপনি আছেন এখানে জানতাম না।'

'থাকলামই বা। তাই ব'লে আর কারুর আসতে তো মানা নেই। বসুন না এখানে।'

'কিন্তু—'

'কিন্তুর কিছু নেই। দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

'আপনার অসুবিধে—'

'সকালের ব্যাপারটার জন্যেই অসুবিধের কথা এত বেশি ক'রে মনে হচ্ছে বুঝি?'

এমন বিষণ্ণ অথচ মধুরভাবে কথাগুলো বলল যে আমার চোখে প্রায় জল এলো।"

"শুধু সেজন্যে?"—সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসু নেত্র তুলে ধরলে রেণুর মুখের উপর।

সে লজ্জিতভাবে বললে, "জানিস তো আমি ছোট থেকেই মা-বাপ-মরা মেয়ে। কারো মুখে এতটুকু ভালো কথা শুনলে বা সামান্য একটু স্নেহের পরশ পেলেও—বিমলের ব্যবহার এমনিতেই মিষ্টি, তার উপর আমায় বরাবরই যত্ন করত।"

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তারপর?"

"বিমল বললে, 'দেখুন আপনাকে দুঃখ দেবার জন্যেই অমন ফোঁস ক'রে উঠিনি আজ সকালে। মনটা আমার ভালো থাকে না প্রায়ই। কখন যে কী ক'রে বসি বা কা'কে কী ব'লে ফেলি—বিশ্বাস করুন, ওরকম রূঢ় ক'রে বলার ইচ্ছা ছিল না একটুও। কিন্তু ওরা—মানে, আমার বাড়ির লোকেরা—বোঝেনা আমাকে মোটেই। আমি ডাক্তারি পড়েছিলাম, পাশও করেছি সত্যি। কিন্তু কি জন্যে তা কি ওরা জানে না? যার জন্যে করেছি সে এখন নেই, আমারও গরজ ফুরিয়েছে। মিছে বোঝা ব'য়ে বেড়াব কেন আর?'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'তবে ভালো লাগে তেমন কিছু করুন না।'

নিশ্বাস ফেলে বললে, 'কিছুই ভালো লাগে না।'

'কেন? আপনার গান—কবিতা?'

'গান, কবিতা? সে কি আবার একটা কাজ?'

'নয় কেন ? কবি কি কাজ করছেন না ?'

'কে, রবীন্দ্রনাথ ?' বিমল হেসেই খুন। বললে, 'কিন্তু আমিও কি কবি ?'

'হ'তেও তো পারেন ! কিংবা গায়ক'—দৃঢ়স্বরে একথা ব'লে মুখ তুলে দেখি বিমলের চোখ আমার উপর, মুখে চাপা হাসি। অপ্রতিভ হ'য়ে বললাম, 'আপনার গুরুজনদের চাইতে আমি যে বেশি বুঝি, তা নয়। তবে আপনাকে দেখে আমার মনে হয়—'

বিমল সাহস দিয়ে বললে, 'বলুন।'

'মনে হয়, আপনি আর্টিস্ট।'

বিমলের হাসি আর থামেই না।

একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বললাম, 'হাসবার জন্যে বলিনি। সত্যি যা মনে হয়েছে, তা-ই বললাম।'

'না না, রাগ করবেন না। সেজন্যে হাসিনি। আপনার সরলতা দেখে—'

বাধা দিয়ে এবার একটু জোর ক'রেই বললাম, 'আপনার গানের ক্ষমতা অপূর্ব, কণ্ঠ অপূর্ব। এই তো আপনার সত্যিকার সম্পদ, বিধিদত্ত দান। তাকে অবহেলা করবেন ?'

'বুঝলাম সবই। কিন্তু চিরদিনই কি বাপের গলগ্রহ হ'য়ে গানবাজনা করতে বা কবিতা লিখতে পারব ? আর্টিস্টের অন্ন যোগাবে কে ?'

'যোগাবে তার আর্ট ! তবে এ গরীব দেশে প্রথমেই সেটা সম্ভব নয়, জানি। তবু এ রকম ভেসে ভেসে বেড়ানোর চাইতে গানকেই না হয় জীবনের অবলম্বন করুন না ? বড় বড় ওস্তাদও যে আপনার সুখ্যাতি করে।'

বিমল খানিকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে কী ভাবলে। তারপর একটু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ভাবছেন ?'

প্রফুল্লমুখে বিমল বললে, 'কেউ কোনোদিন আমায় এমন ক'রে বলেনি, এত উৎসাহও দেয় নি ! নিজের ওপর বিশ্বাস হচ্ছে আজ ! নীলিমা, তুমি সত্যিকার দরদী !'

'কিন্তু কী ঠিক করলেন ?'

'গান আরো শিখতে হবে। কোনো আর্টই সহজ-লভ্য বা সামান্য নয়। শুধু ক্ষমতা থাকলেই তো হয় না, তার বিকাশের জন্যে রীতিমত সাধনাও চাই।"

'বেশ তো, তা-ই করুন।'

'দেখি।'

সেই থেকে আমাদের ঘনিষ্ঠতা। এ-রকম অদ্ভুত চরিত্র সুপ্রিয়া, আমি তো আজ পর্যন্ত আর একটিও দেখিনি। একদিকে শিশুর মতো অসহায়, সরল, কোমল মন, অথচ যে কাজেই হোক, একবার মন স্থির ক'রে সুরু করলে তাতেই সফল হবার ক্ষমতা রাখত। কিন্তু যদি নিরুৎসাহ হ'ত কোনো কারণে, তাহ'লেই মুস্কিল। ছেলে-মানুষের মতো সবাইকে করত বিশ্বাস। ঠিক সেই পরিমাণে ছিল অবিশ্বাস নিজেরই উপর। তার একমাত্র কারণ জীবনে দশজনের মাঝে নিজেকে যাচাই ক'রে দেখবার সুযোগ পায়নি। সময় তো হ'ল না।"

রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে রেণু বলতে লাগল, "দিল্লিরই এক বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে বিমল যখন প্রথম যাতায়াত সুরু করে, বাড়িসুদ্ধ সকলের কী রাগ ! ওর বাবা তো জোর ক'রে ডিস্পেনসারীর কাজে বসিয়ে দিতে চান। মা ছিলেন ভারি বুদ্ধিমতী—শান্ত। কি জানি কী বুঝিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা করলেন। আশ্চর্য দেখ, দু'দিন পরে বিমল নিজেই বাবাকে বললে, 'আপনার কথামত দু'এক ঘণ্টা ক'রে

ডিস্‌পেন্‌সারীতে বসব। কিন্তু সারাদিনই ওকাজ নিয়ে থাকতে পারব না।' বাপ অগত্যা তাতেই রাজি। ছেলে যে বাড়াবাড়ি জেদটুকু অন্তত ছেড়েছে, একটু একটু ক'রে ভিড়ছে কাজের দিকে, এটা তিনি সুলক্ষণ ব'লেই মনে করলেন।—

এর পর যখন দেখা হল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'ডাক্তারি কেমন লাগছে ?'

হেসে বললে, 'কি জানো, বাবা বড্ড দুঃখ করছিলেন। গানের জন্যে সকাল সন্ধ্যেই যথেষ্ট এখন। পড়বারও সময় আছে ঢের। দেখলাম কয়েক ঘণ্টা স্বচ্ছন্দে দেওয়া যায় ডিস্‌পেনসারীর কাজে।'

'তা যায়। কিন্তু এমন দোটানায় থাকতে পারবেন ক'দিন ?'

'চলুক তো যদ্দিন চলে।'

রাগ ক'রে বললাম, 'এ কি রকম দায়িত্বহীনের মতো কথা ? যা করবেন, একটাই করুন। একবার এদিকে আবার ওদিকে—এত অস্থির-চিত্ত কেন ? শেষ পর্যন্ত আপনার ওপর আস্থা থাকবে কারো ? মা-বাপের মনেও মিথ্যে আশা—'

শেষের কথাটা গ্রাহ্যই করলে না। বাধা দিয়ে হেসে বললে, 'কারোরই আস্থা থাকবে না ? সত্যি বলছ নীলিমা ?'

সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জোর ক'রে মুখ তুলে বললাম, 'পরের আস্থা থাকুক বা যাক, তাতে এমন কী এসে যায় বলুন ? কিন্তু সংসারে আপনাকে থাকতে হবে যাদের নিয়ে—'

'তাঁদের কথা ভাবব পরে। কিন্তু যে আমায়—' একটু থেমে হঠাৎ বললে, 'কথাটা উঠেছে যখন, ব'লেই ফেলি। না না, ভয় নেই তোমার, যেও না। তুমি তো জানো না কতখানি বিতৃষ্ণা এ বুকে পাথরের মতো চেপে বসেছিল ! নীলিমা, ভাবিনি যে এ জীবনে আর কাউকে এতখানি বিশ্বাস করতে পারব। মানুষের ওপর ঘৃণা—সে

যে কী জিনিষ—ছেলেমানুষ তুমি, আশীর্বাদ করি কখনো যেন জানতে না হয়। এমনি থাকো, এমনি সরল, এমনি স্নেহময়ী! যেমন বাঁচালে আমায়—'

'কী বলছেন বিমলদা?'

'সাধে কি বলছি? সে অনেক কথা, এ জীবনেরই। কিন্তু মনে হয় যেন শত সহস্র জন্ম হ'য়ে গেছে তারপরে। একটা দুঃস্বপ্ন! কিন্তু থাক সে কথা। ভেঙে-চুরে নতুন হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছি! আজকাল আমি ভাবি কী জানো? তোমার মতো মেয়েও যদি ডাক্তারি পড়তে পারে—'

'আমার কথা আলাদা', হেসে বললাম, 'আমার কি কাব্যি-রোগ আছে, বিমলদা? একজনকে দিয়ে আর একজনের বিচার হ'তে পারে না। প্রত্যেকের স্বভাব যেমন, পথও তেমনি আলাদা।'

'সেই ভয়েই তো ডাক্তারিও ধরেছি। নীলিমা, জীবনের পথে তুমি চলবে একদিকে আর আমি আর একদিকে এ যেন ভাবতেই পারি নে।'

উঠে এলাম সেখান থেকে। জবাব দেব কি, নিজেকেই সামলাতে ব্যস্ত তখন।"

সুপ্রিয়ার কণ্ঠে আগ্রহ উদ্বেল হ'য়ে ওঠে, "বিশ্বাসের আর ভালোবাসার পাত্রের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে দেবার কী ক্ষুধা! বলো—তারপর?"

"বলছি, কিন্তু সংক্ষেপে। বিমলের ওস্তাদ মাঝে মাঝে ওকে বড় বড় গাইয়ে বাইজীদের কাছে নিয়ে যেতেন। ও নিজে মানুক বা না মানুক, তারা জানত কণ্ঠসঙ্গীতে বিমলের প্রতিভা কত উঁচুদরের। ওস্তাদেরই মধ্যস্থতায় তাদের একজনকে বাঙলা গান শেখাবার কাজ জুটে গেল। মোটা মাইনে; তাই, পছন্দ না হ'লেও বাড়ির লোকে

ঠিক আপত্তিও করল না। এসময় বিমল নিজে গানও শিখত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রতি রবিবারে সখ ক'রে গান শেখাত। সেটাই শেষে একটা ছোটখাট স্কুল হ'য়ে দাঁড়াল।

আমার সবচেয়ে সুখের বিষয় ছিল এই যে, ওর আত্মক্ষমতার ওপর বিশ্বাস গ'ড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। তাছাড়া, জনপ্রিয়তার জন্যেই হোক বা যে কারণেই হোক লোকে এখন অসুখে-বিসুখেও ওর পরামর্শ নিতে আসত, কেউ কেউ বাড়িতেও ডাকত। বিমল তাতে ভারি খুসী হ'ত।

সবই বেশ চলছিল। কিন্তু—" রেণু হঠাৎ থেমে বললে, "নির্মল তো এখনো ফিরল না?"

"কই, না। বোধ হয় সময় পেলেন না। নইলে ডেকের ওপর আমাদের না দেখলে এখানে একবার খোঁজ করতেন নিশ্চয়।"

রেণু ক্লান্তস্বরে বললে, "ও এখনো মিস রায়ানের কাছ থেকে ছুটি পায়নি, সু। তোকে একটা কথা বলে রাখি ভাই।"

"সঙ্কোচ কিসের?"

"কথাটা এই। যদি কখনো দরকার হয় আর সুযোগ পাস, নির্মলকে দেখিস একটু। আমি যদি নাও থাকি—"

সুপ্রিয়া রাগ করলে, "ওকি কথা হঠাৎ?"

রেণু লজ্জিত হ'য়ে বললে, "তা নয়। এই ধর্ না কেন, যদি আর কোথাও যাই—"

"সে কথা এখন কেন?"

"তোর রেণুদির জন্যে, আর—আর এক দুর্ভাগার কথা মনে ক'রে—ওকি রে? চোখে জল? তবে আর বলা হ'ল না।"

"না, না, বলো তুমি—"

"মৃত্যুর পরেও যদি কোথাও কোনো অস্তিত্ব থাকে, আর ক্ষমতা

থাকে এ পৃথিবীর কিছুই অনুভব করবার, তবে ঠিক জানিস—নির্মল মানুষ হ'লে ও সুখী হবে। কী ভালোই বাসত এই ছোট ভাইটিকে!"

"দিদি, বড় কষ্ট হ'লে আজ আর না-ই বা বললে। চলো একটু ওপরে ঘুরে আসি।"

"না রে কষ্ট আর কি! কোনো প্রতিকার নেই যার, সে দুঃখ কেমন যেন স'য়ে যায় মানুষের। দেখিস না, হেসে খেলেই তো কাটিয়ে দিই দিনগুলো।"

সুপ্রিয়া চুপ ক'রে থাকে।

"কী ভাবছিস? আমাকে একটু জল দে।"

জল খেয়ে শান্ত হ'য়ে আবার বলে, "শোন্ তারপর।

আমাদের সঙ্গে পড়ত সুপ্রভা, একদিন কথায় কথায় সে বললে, 'জানো রেণু, লতিকা ফিরে এসেছে।'

ওর বলার ধরণে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম, 'সে কি?'

'কে—, তুমি কি কোনো খবরই রাখো না? সহরসুদ্ধ সবাই জানে! স্বামীর সঙ্গে নাকি মোটে বনল না। তিনি গেলেন সাগর-পারে, আর ইনি ফিরলেন পুরানো আবাসে। ভেতরে কি সব নাকি—'

'রাগ ক'রে বললাম, মানুষের নামে এত বাজে কথাও রটাতে পারিস তোরা! স্বামী গেছেন হয়ত কি কাজে, বেচারী একলা—'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা—এই দেবু, দেববাঞ্ছা, শুনে যাও তো ভাই এদিকে।'

পাঞ্জাবী ছাত্রী দেববাঞ্ছা বালি হেসে কাছে এলো, 'কি রাতদিন দেবু দেবু করো! তোমাদের—বাঙালীদের জন্যে এমন সুন্দর নামটা আমার মাঠে মারা যেতে বসেছে। একটা-না-একটা নিক্‌নেম্ না হ'লে কিছুতেই চলে না তোমাদের, না?'

'হয়েছে, নামের গরব রাখ এখন। তবু যদি না বাপের বাঙালী বন্ধুই রাখত নামটি! আসে তোদের নিরামিষী মাথায় হরসিং, গোবিন্দ সিং, লালা রঞ্জিতলাল ছাড়া কোনো কবিত্বময় নাম বা ভাব, যে—'

'বটে! কী রেণু, তুমি যে খুব চুপিচুপি হাসছ? সুপ্রভা তো এদিকে যা মুখে আসে তাই ব'লে নিলঁ আমায়!'

'রাগ করিসনে ভাই। বাঙালী-পাঞ্জাবীর লড়াই না হয় আর একদিন হবে, এখন বল দেখি লতিকার সঙ্গে কবে তোর শেষবার দেখা হয়েছিল?'

'এই তো গেল রবিবারে। আহা বেচারী কী রোগাই হ'য়ে গেছে! স্বামীটি নাকি মোটেই ভালো লোক ন'ন, বুঝলে রেণু? রাতদিন কেবল মদ আর—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'থাক্ ভাই, এখনি কেউ শুনতে পাবে। কাজ কী পরের কথায়?'

দেববাঞ্ছা চ'লে যেতে সুপ্রভা বললে, 'দেখলি সত্যি কিনা? লতিকার আর সে জৌলুস নেই, কোথাও যায় না। এককালে কী গরবই ছিল মেয়ের!'

'যা যা, তুই দেখছি ভারি—'

'তুমি তো বলবেই, জানোনা কিনা কিছু। যতই ধমকাও না কেন আমায়, শুনলে স্বীকার করতেই হ'ত যে অতি দর্পের শাস্তি একটা আছেই। ধনের গর্বে, রূপের গর্বে মানুষকে চোখে দেখতে পায়নি, কথা দিয়ে কথা ভেঙে—'

'তুই চুপ করবি কি না? হ'ল কী তোর আজ বল্ তো?'

'না ভাই, সত্যি রাগ হয়। চারুর দাদা মরতে বসেছিল ওর জন্যে। আমি না জানি কী? বেচারা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ডাক্তারি পাশ করল, যেমন ক'রে হোক বিলেত যাবে—এরি মধ্যে

বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত! মেয়ে নিজে পছন্দ ক'রে এই সাহেবকে বরণ করলে, বললে—আগে কথা দিয়ে ফেলেছিল। কথা যে তুমি তারও আগে আরো একজনকে—কেন, জানোনা বুঝি এসব? চারু বলেনি কোনোদিন? তা বলবে কেন? তাছাড়া, জেগে যে ঘুমোয় তাকে জাগাবে কে রেণু? সহরসুদ্ধু বাঙালীর জানতে বাকি নেই যে লতা এককালে বিমলবাবুকে ভালোবাসত আর শুধু সেজন্যেই রায়বাহাদুর—লতার বাবা—'

'থাম্, থাম্ তুই—আমার আর এসব শুনতে ভালো লাগছে না!'

'তুই এতে অমন আকাশ থেকে পড়লি কেন বল্ দেখি? ওদের বাড়িতে তো প্রায়ই যাস! কেউ তোকে বলেনি কোনোদিন? সত্যি বলছিস?'

'একবার বিয়ের কথা উঠে প্রায় তখনি থেমে যায়, এইমাত্র।'

'তা বলবেই বা কি ক'রে বল্? এসব ঘেন্নার কথা কে কা'কে আহ্লাদ ক'রে বলতে যায়?'

'কাজ কি আর ওসব আলোচনায়? যা চুকে-বুকে গেছে—'

'চুকে গেছে?' সুপ্রভা মুখ টিপে হাসল, 'তুই চারুদের বাড়ি যাসনি কতদিন?'

'এবার অনেকদিন। পিসিমাদের সঙ্গে প্রয়াগে গিয়েছিলাম মনে নেই? কাল শুভা এসেছিল খবর নিতে। এই শনিবার যাবো কথা দিয়েছি!'

'যাস। সেইখানেই সব শুনতে পাবি। আমি বললে হয়ত এখুনি ধমকে উঠবি আবার।'

কিছু বললাম না, কিন্তু মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল!—

শনিবার ওবাড়িতে পা দিয়ে প্রথমেই দেখা বিমলের সঙ্গে। ডাক দিয়ে বললে, 'এসেছ তুমি? এদিকে যে অনেক খবর! আরো

একটা কাজ পেয়ে গেছি জানো? জল-টল খেয়ে একটু স্থির হও, বলছি সব।'

খাবার পরে কিন্তু চারু এসে টেনে নিয়ে গেল ছাদে। বললে, 'রেণু, দাদা তোমার কথা শোনে। বারণ ক'রে দাও ওকে যেন রায়-বাহাদুরদের বাড়ি গান শেখাবার কাজ না নেয়। এর ফল কিছুতেই ভাল হবে না ব'লে রাখলাম। এরই মধ্যে সহরে নানা গুজব রটেছে। দাদাকে কিছু বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবু বলেছিলাম; তাতে আমায় বললে কী জানো? বলে, লোকের কথার ভয়ে এতখানি প্রতিভা মাঠে মারা যেতে দেব? লতিকার গাইবার ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত, আমার একটু সাহায্যে সেটা যদি আরো খোলে, তাতেও আমি নারাজ হব শুধু তোদের ভালো লাগে না ব'লে?'

'ঠিকই তো বলেছেন।'

'তোমার মুখে এ উত্তর আশা করিনি নীলা! কিন্তু তোমারও বা দোষ কী? সব তো জানোনা! দাদার অনেক গুণ, নেই শুধু আত্মমর্যাদা-জ্ঞান!'

'যা-তা বলিসনে চারু!'

'আমি হ'লে করতাম কী শুনবে? এজন্মে আর ওবাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াতাম না। আমার ভাইকে কি তুমি আমার চেয়েও ভালো বোঝ? লতিও আমার ছেলেবেলার সই, জানি তো ওর মতন স্বার্থপর মেয়ে—'

'চারু!'

'দাদাকে বুঝিয়েছে কী? যে, ওর বাবা-মা-ই জোর ক'রে ওকে—বড়লোক জামাই পাবার লোভে—বিলেতফেরতা ব্যারিস্টারের হাতে গছিয়ে দিয়েছে। আর কেউ না জানলেও আমি জানি একথা কত মিথ্যে। আজ কিনা দাদার অনেক যশ, অনেক মান! কিন্তু একদিন যখন—শুনবি সব?'

'দরকার কী ?'

চারু রাগ ক'রে বললে, 'নিজের ভাই হ'লে দেখতাম কেমন ক'রে এত উদাসীন থাকতে।'

সন্ধ্যার পর বিমল এলো। ছাদে মাদুর পেতে ব'সে একেবারেই কথা পাড়লে, 'নীলিমা, তোমার মনে আছে একবার গানের আসরে লতিকা কেমন চমৎকার গেয়েছিল ? এখন আরো মিষ্টি হয়েছে ওর গলা। চাঁদনীতে সেদিন হঠাৎ দেখা। বললে, এখানে বড় একলা পড়েছে। গেলাম একদিন। যেতেই ধ'রে বসল গান শেখাতে হবে। ওর মত ছাত্রী পাব কোথায় ? ভালো ক'রে শিখলে একটা কাণ্ডই হ'ত ! কিন্তু মতলব ক'দিন ঠিক রাখবে কে জানে ?'

'আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন।'

'তোমরা কেউ বললে আরো ভালো হয়। ওর মতো ছাত্রীর জন্যে আমার সব শিক্ষা, সামর্থ্য অকাতরে ঢেলে দিতে রাজি।'

চারু অসহিষ্ণুভাবে ব'লে উঠল, 'তা যেন দিলে, কিন্তু এ বাড়াবাড়িতে লাভটা কী বলতে পারো দাদা ?'

বিমল আশ্চর্য হ'য়ে বললে, 'বলিস কী ? লাভ নেই ? সত্যিকারের রসজ্ঞ যারা, তারা নিজে যাতে রস পায় এমন জিনিষ কখনো একলা ভোগ করতে পারে ? দশজনকে দিয়েই সুখ তাদের। লতিকার সঙ্গীতের শক্তি ভালো বিকাশ পেলে বাঙলা দেশেরই লাভ। ওর টাকা আছে, পদ আছে—আছে দশজনার কাছে মান-সম্ভ্রম। ও ইচ্ছা করলে না পারে কি ?'

চারু বাঁকা হেসে বললে, 'ইচ্ছা করলে—'

বিমল খানিকক্ষণ একদৃষ্টে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কঠিনস্বরে বললে, কোনো "কোনো লোকের স্বভাব কি রকম জানিস ? যে কোনো ভালো কাজে, যে কোনো ভালো কথায় অনর্থক ব্যঙ্গ

করা, নাহক একটা বাধার সৃষ্টি করা। এরাই মানুষকে বড় হ'তে দেয় না। এদের ঠাট্টা টিটকারী সয়েও নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকা দুর্বল মানুষের পক্ষে সহজ নয়। ওরা তা জানে, জানে বলেই ঠিক জায়গায় ঘা দিয়ে নামিয়ে আনে তাকে।'

বলতে বলতে বিমল উঠে দাঁড়াল, 'এমন সব ছোট মন যাদের—'

বললাম—'কী বলছেন বিমলদা। দাঁড়ান, যাবেন না। হঠাৎ ওকে ভুল বুঝলেন কেন?'—কথার মাঝখানে চারু কেঁদে উঠে গেল।

দুঃখিত হ'য়ে বললাম, 'এমন তো কিছু বলেনি—'

'বলেনি? ও নিজে জানে। সত্যি বলছি নীলিমা, নানা কারণে এক একসময়ে আমার ইচ্ছা হয় এদেশ ছেড়ে পালাই। যাই চ'লে জাপানে বা ইউরোপে যেখানে মানুষ মানুষকে রাতদিন গলা টিপে মারতে আসে না; যেখানে স্বাধীনতার মাঝে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে স্বচ্ছন্দে নিজের কাজ করা যেতে পারে, লোকের মতামত পাগলা কুকুরের মতো পিছু-তাড়া ক'রে বেড়ায় না। এত সন্দেহ, এত সঙ্কীর্ণতার মাঝে আর যারই পোষাক, আমার যে পোষাবে না বেশিদিন, এ ঠিক।'

বললাম, 'আমি অবিশ্যি বিদেশের কিছুই জানি না, কিন্তু বইয়ে তো পড়া যায়—সেসব দেশেও আছে কত রকম মুস্কিল—'

বিমল প্রতিবাদ ক'রে বললে, 'মুস্কিল যতই থাকুক, এতটা হীনতা নিশ্চয় নেই। ওরা মানুষকে বড় হবার সুযোগ দিতে জানে। আর, জীবনে কেউ একবার একটা ভুল ক'রে ফেলেছে ব'লেই তারপর থেকে তার সব কাজকে ক্রমাগত সন্দেহের চোখে দেখে না।'

'মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে আমার—এ কি বক্তার নিজেরই কথা, না অন্য কারুর সাফাই?'

বিমল বলতে থাকে, 'লতিকা সেদিন নিজেই বলছিল—দেশে সঙ্গীতের প্রচার আর পুনরুজ্জীবনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে ইচ্ছা

করে ওর। হয়ত ভবিষ্যত জীবনটা একাজেই দেবে। কিন্তু তোমার কি মনে হয় ওর মনের বাসনা কখনো সার্থক হবে, যদি প্রতি পদে খুঁত-ধরার জন্যে একদল ক্রিটিক দিন-রাত পিছু-লেগে থাকে? পুরুষেই পারে না, তা মেয়ে! মানুষ হ'য়ে মানুষের জীবনটা সার্থক, সুন্দর হবার পথ চারদিক থেকে এমন বন্ধ ক'রে দেওয়া—এর কী নাম দেবে তুমি? সুবিচার?'

নিরুত্তরে শুনতে লাগলাম।

বিমল নিজেই তখন সুর একটু খাদে নামিয়ে বললে, 'কেন সবাই এত অবিশ্বাস করে ওকে, তা কি আমি জানি না? না, আমারই সহজে বিশ্বাস হয়েছিল? কিন্তু পরের একটা দোষ, একটা ত্রুটিকে চিরকাল ধ'রে থেকে তাকে কঠোরভাবে বিচার করবার, চিরদিন একই কারণে তার আর সব সদুদ্দেশ্যকে ব্যঙ্গ ক'রে উড়িয়ে দেবার কী অধিকার আছে আমাদের? এটা কেন আমরা ভেবে দেখি না, অতি মন্দর মধ্যেও কিছু-না-কিছু ভালো থাকেই! তাছাড়া, লতিকা এমন কিছু ভয়ানক অপরাধ করেনি যার জন্যে—' ব'লে থেমে, একটু ভেবে আস্তে আস্তে বললে, 'আর করলেও, তার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জবাবদিহি করবে কেন?' বিমল খুব সাবধানে একটা নিশ্বাস ফেললে, কিংবা হয়ত সেটা আমারই কল্পনা।

একটু পরে বললে, 'আমি তো জানি কত দুঃখ পেয়েছে! মেয়েদের এর চাইতে দুঃখ আর—ও কি?'

'কিছু না। গ্লাসটা হাতে ঠেকে প'ড়ে গেল।'

'একলা একলা দিন কাটে, কোথাও যেতে পায় না, কেউ যায় না ওদের বাড়ি—দু'একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া।......নীলিমা!'

'কী বলছেন?'

'যাবে একদিন আমার সঙ্গে?'

'কোথায় ?'

'ওদের বাড়ি। ভারি খুশী হবে। যাবে না ?'

'আচ্ছা।'

'তবে কালই চলো।'

'কালই ? মাসীমাকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে না ?'

বিমল গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'বেশ তো, করো।'

লতিকাকে একদিনও দেখতে যাননি, মায়ের উপর ছিল এই অভিমান।"

সুপ্রিয়া হঠাৎ বাধা দিয়ে বললে, "রেণুদি, একটা কথা। বিমলবাবু যে লতিকাকে এত ভালোবাসতেন, তার প্রমাণ এখন হাতে হাতে পেয়েও কোনো কষ্টই হয়নি তোমার মনে ?"

ম্লান হেসে রেণু বললে, "হ'লেও উপায় কী ? চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর কী করা যায় ?"

"তা বটে। যেখানে ভালোবাসাই নেই ব'লে মনে হয়, সেখানে মান-অভিমান করতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা কী আছে আর !"

রেণু চুপ ক'রে রইল।

সুপ্রিয়া বললে, "তারপর ? গেলে লতিকাদের বাড়ি ?"

"গেলাম—পরদিন ! মনকে বোঝালাম, 'কেনই বা যাবো না ? লতিকা তো আমার শত্রু নয় ! ওরা ভালোবাসত পরস্পরকে সেই ছেলেবেলা থেকে। মাঝখানে দু'দিনের ছাড়াছাড়ি। এখন আবার যে-কে সেই। ওদের সুখে একটুও ঈর্ষার প্রশ্রয় দেওয়া আমার নিজেরই ক্ষুদ্রতা।'…

লতিকা আমায় কত সমাদর ক'রে বসালে, বললে, 'রেণু, বিমুদার কাছে তোমার কথা প্রায়ই শুনি। তাছাড়া তুমিও তো আমার পর নও। এসো না কেন মাঝে মাঝে ? চারুকে বলতে

সাহস পাই না। কিন্তু এখানে সঙ্গীহীন দিনগুলো যেন আর কাটতে চায় না।'

ও স্বভাবতই মিশুক। তার উপর, এ কয়দিন কলকাতার সমাজে মেলামেশা ক'রে একেবারে ওস্তাদ ব'নে গেছে মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে, আদব-কায়দায়। সুন্দরী চিরকালই, কিন্তু এখন কী যে একটা শ্রী দেখলাম ওর চোখে-মুখে, মনে মনে নিজের কাছে নিজে একেবারে ছোট হ'য়ে গেলাম। মিনিটখানেকের জন্যেও যে কোনো দুরাশা মনে স্থান দিতে পেরেছিলাম, তা-ই ভেবে এখন অবাক লাগল। মনে হ'ল, যে একবার এই লাবণ্যময়ীকে ভালোবেসেছে, সে কি কখনো ভুলেও আমার মতো—"

"রেণুদি!"

"না রে, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। লতিকার মতো মিষ্টি চেহারা—"

"তাহোক, তুমিও এমন কিছু কালপেঁচা বা চোখের-বালি নও, দিদি আমার!"

"লতিকাকে দেখিসনি কিনা! দেখলে বুঝতিস। যাক, রূপ নেই, তার জন্যে আফশোষ করে লাভ কী? কী বলছিলাম? হ্যাঁ—সেদিন বাড়ি ফিরবার আগে মনে মনে এক সংকল্প করলাম।

যাবার সময় লতিকা হাত দু'খানি ধ'রে বললে, 'আবার কবে আসবে রেণু? আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব তোমার বোর্ডিংএ। আসবে তো?'

এমন ক'রে বলল যে এড়াবার যো-নেই। রাজি হলাম।

সুপ্রিয়া, আমার মনের সেই গোপন সঙ্কল্প আর লতিকার কাছে এই প্রতিশ্রুতি, এ দু'টোই হ'ল আমার—কাল। কিন্তু বড্ড যে রাত হ'য়ে যাচ্ছে রে, ঘুম পায়নি তোর?"

"না। আজ রাত জেগে হ'লেও শুনব সব, যদি তোমার কোনো কষ্ট না হয়।"

"তবে তাড়াতাড়ি শেষ করি।...

আমার সঙ্কল্পটা কী জানিস? চারুদের বাড়ি আর ওর দাদার সংস্রব থেকে এখন নিজেকে যথাসাধ্য দূরে রাখা। মনে মনে বললাম, 'তুমি অনাথা মেয়ে, পরের সাহায্যে পড়তে এসেছ। তোমার কি কোনোরকম ভাব-বিলাসিতা কিংবা শোকে-দুঃখে মাত্রার অতিরিক্ত হা-হুতাশ করা সাজে? দুঃখকে যদি প্রশ্রয় দিতেই চাও, নিজের ঘরে ব'সে দিয়ো। বাইরে কোথাও কাঙাল-পনা করতে যেও না।'

চারুর মা নিতে লোক পাঠালে জবাব দিতাম, 'মাসীমাকে বোলো —পড়ার চাপ দিন-দিনই বাড়ছে যে।' ভালোমানুষ তিনি, লিখতেন, 'তাও বটে, সোজা পড়া তো নয় মা। তা, তোমার যখনই সময় হয় একটা পোস্টকার্ড লিখে দিয়ো। কেউ গিয়ে নিয়ে আসবে।'

এদিকে চারুর তখন বিয়ের কথাবার্তা চলেছে। হুকুমের ওপর হুকুম আসতে লাগল একবার যাবার জন্যে। শেষটা চির-জীবন আড়ির ভয় দেখালে। ভয়ে না হোক, ওরা সবাই বিয়ের জন্যে কলকাতায় চ'লে যাবে শুনে একদিন দুপুরবেলা গেলাম ওবাড়ি। ইচ্ছে ক'রেই এমন সময় গেলাম যখন বিমল বাড়ি থাকে না ব'লেই জানতাম। কিন্তু গাড়ীর শব্দ শুনে প্রথমেই যে বারান্দায় বেরিয়ে এলো, সে আর কেউ নয়—বিমল।

এক সেকেণ্ড মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন একটু হেসে বললে, 'কী, ভয়ে যে একেবারে পাংশু হ'য়ে গেলে! ভূত দেখেছ নাকি?'

সামলে নিয়ে বললাম, 'কী যে বলেন, এসময় আপনি বাড়ি থাকেন না—'

'তাই তুমি ঠিক সে সময়টা বেছেই এসেছ? ভালো!'

উত্তরে কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, বিমল চোখ তুলে তাকাতে মিথ্যে কথা আর মুখ দিয়ে বেরোল না।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, 'যাক, এসে ভালোই করেছ। বিকেলে থেকো আজ, গোটাকতক কথা আছে।' ব'লেই উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না ক'রে চলে গেল।

হঠাৎ আমার ভয়ানক অভিমান হ'ল ওর ওপর, ওদের বাড়ির সকলের উপর। দরকারের সময়ই কেবল রেণু! রেণুকেই দেখি সবাই অবাধে হুকুম করে!—কেন, ওর নিজের কি কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নেই? সুখ-দুঃখ, মান-অপমান-বোধ থাকতে নেই? রাতদিন কেবল পরের হুকুম তামিল ক'রে নিজের ক্ষতি ব'য়ে বেড়াবে? ওর ভালো কেউ দেখবে না, ও-ই কেবল সবাকার মন যুগিয়ে চলবে সারাজীবন?—না, রেণু এত বোকা নয়! যেখানে থাকলে, যার সংস্রবে এলে সব ডুববে ওর—দু'দিন পরে হয়ত অবশিষ্ট আত্মমর্যাদাজ্ঞানটুকুও ফেলবে হারিয়ে, সেখানে ও কিছুতেই কারো কথা শুনবে না আর।...

বিকেলের ঢের আগেই চারুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে এলাম।"

রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বিষণ্ণ ম্লানস্বরে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "ভালোবাসার ক্ষেত্রে দর্প, অভিমান, অহমিকার বাড়া শত্রু আর নেই। যে মুহূর্তে আমার 'আমি'-টাই ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে—" এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে কষ্টে নিজেকে সংবরণ ক'রে বলে, "প্রতি পদে কেবল মেপে মেপে এগুনো—'এত যে দিলাম, তার বদলে পেলাম কতটুকু?' এরকম ক'রে যে ভাবতে পারে, সে ভালোবাসার কী জানে? সে—"

"কিন্তু রেণুদি—"

রেণু মাথা নেড়ে বললে, "এর মধ্যে কিন্তু-টিন্তু নেই সুপ্রিয়া। ফুলটি যেমন ফোটে ফুটবার জন্যেই, ভালোবাসাতে হয় শুধু ভালোবাসবারই

জন্যে—এই একান্ত সহজ সরল কথাটা কিছুতেই কি সেদিন আমার মাথায় ঢুকতে পারল? পারল না ব'লেই না সারাজীবন ধ'রে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত—"

"নিজের এত কঠোর বিচার ক'রো না দিদি, হাজার হোক মানুষ তো!"

রেণু ক্ষোভের হাসি হাসলে, "মানুষ—মানুষ!—এই ব'লে কখনো করি আমরা বড়াই, কখনো বা আত্মগ্লানির হাত থেকে আত্মরক্ষা! কিন্তু বুকের মাঝে ব'সে যে অহর্নিশি সূচ ফুটায়, এতটুকু মিথ্যে বরদাস্ত হয় না যার, কী বলিস তাকে তোরা? বিবেক, ভগবানের বাণী, না—কী? যাই হোক, পারিস তাকে থামাতে, পারিস তাকে ভুল বোঝাতে?"—সেই আধ-আলো আধ-আঁধারে রেণুর চোখ দু'টো কেমন পাগলের মতো জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে। সুপ্রিয়া মনে মনে ভয় পায়!

"মনে রাখিস সু, তোর রেণুদির ভুলে-ভরা ক্ষত-বিক্ষত জীবনের পরম আর চরম শিক্ষা—খাঁটি প্রেমের লক্ষণ আত্মদান, আত্মতৃপ্তি নয়!"

দুজনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থাকে। দূরে সমুদ্রের একধারে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড-চাঁদ সলিলশয্যা থেকে ধীরে ধীরে উর্ধ্বে উঠে কেবিনের জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। ডেকের উপর মাঝি-মাল্লার ত্রস্ত পদক্ষেপ, দড়াদড়ি টানাটানি, কাপ্তেনের গম্ভীর গলার হুকুম ও পরিশেষে siren-এর গুরু গাঢ় আওয়াজ শোনা যায়। একটু পরেই কম্পন সুরু হয় জাহাজের গায়ে।

সুপ্রিয়া জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখে বললে "স্টীমার ছাড়ল।"

"তাহ'লে, জানালাটা খুলে দে এবারে। আর তো আরবদের ভয় নেই? বাঃ, সুন্দর চাঁদ উঠেছে রে! কোথায় তোকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে বেড়াব, তা না—এমন রাতে নিজের দুঃখের কাহিনী ব'লে মিছেই কষ্ট দিচ্ছি। যা না একটু ওপরে।"

"না।"—সুপ্রিয়া জানালার কাছ থেকে স'রে এসে ওর শিথিল হাতখানি হাতে তুলে নেয়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রেণু বলে, "তবে শোন্!

সেই যে চ'লে এলাম চারুদের বাড়ি থেকে, তারপরে মাসখানেক গেল কেটে। মাঝে আর একবার মাত্র গিয়েছিলাম চারুকে বিদায় দিতে, বা নিতে। মেসোমশায়রা গেলেন দেশে ওর বিয়ে দিতে, বাড়ি আর ডিস্‌পেনসারীটা আগলে থাকতে হ'ল বিমলকে।

এরই মধ্যে একদিন বিকেলে ও এলো বোর্ডিংয়ে। জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন আছ নীলিমা? ব্যাপার কী বলতে পারো?'

বললাম, 'কেন, কী হয়েছে?'

'সে জানো তুমি, আর জানে আমার ভাগ্য!'

ভালো ক'রে চেয়ে দেখলাম—এ কী হয়েছে! এ-ক'দিন এমন কী ঘটল যাতে—হঠাৎ ও মুখ ফেরাতেই চোখোচোখি। আত্মবিস্মৃত হ'য়ে বলে ফেললাম, 'কী হয়েছে বিমলদা?'

'হবে আবার কী?'

'নিশ্চয় কিছু হয়েছে। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারো তুমি! বলো, নইলে—'

'নইলে?'

'আমায় বাধ্য হ'য়ে যেতে হবে তোমার বাড়ি। দেখে আসব—'

বাধা দিয়ে বললে, 'যেতে হবে আমার বাড়ি! আমার বাড়ি যাওয়া কবে থেকে তোমার কাছে এত দুরূহ ব্যাপার ব'লে মনে হ'তে সুরু হয়েছে, শুনতে পাই কি নীলিমা?··· না, থাক্ কিছু বোলো না। কেন মিথ্যে কতগুলো বানিয়ে বলবে—সত্যি কথা স্বীকার করতে যখন পারবেই না!—'

তোকে বলব কি সুপ্রিয়া, শুনতে শুনতে আমার হাত-পা যেন

অসাড় হ'য়ে এলো! বিমলদা তাহ'লে সব টের পেয়েছে! গোপনতার আড়াল আর স্বস্তিটুকুও রইল না আর!—নিজের জন্যে লজ্জায় আমার চোখ ফেটে জল এলো। এ মাথা যেন আর কোনোদিনই তুলতেই পারব না, এমনি—

পায়ের শব্দে চোখ তুলে দেখি বিমল আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত দুই চোখের দৃষ্টি মুখের 'পরে স্থির ক'রে জিজ্ঞেস করলে, 'তাহ'লে সব সত্যি?'

একটুখানি অপেক্ষা ক'রে, যেন আপন মনেই বললে, 'সব সত্যি! আশ্চর্য!—অথচ ও যখন বললে, প্রথম যখন শুনলাম একথা, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি। বললাম, এমন হ'তেই পারে না, নীলিমা কখ্‌খনো আমার—আমায়—' যেন কতবড় ধাক্কা একটা সামলে নিচ্ছে, এমনিভাবে থম্‌কে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ—কিছু না বলেই—ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একশ'বার নিজেকে মনে মনে বললাম, 'হ'ল তো রেণু!—হতভাগী, তুই জন্মাবার আগে বাপকে, জন্মাবার পরে আঁতুড়েই মাকে খেয়েছিস, আপন বলতে তোর কোথাও কাউকে থাকতে দিসনি। বন্ধুর মতন বন্ধু যে একজনকে পেয়েছিলি, সেও সইল না!'

এর পরে দিল্লিতে থাকা অসহ্য হ'য়ে উঠল। মনে নেই শান্তি, বাইরে নেই কোনো দরদী। কী করি, কোথায় যাই—এমনি যখন মনের অবস্থা, একদিন লতিকা দিল গাড়ী পাঠিয়ে। সঙ্গে এক চিঠি দরোয়ানের হাতে—অতি অবিশ্যি যেন একবার আসি, বিশেষ দরকার।

ব্যাপার কী ভাবতে ভাবতে গেলাম ওর বাড়ি। লতিকার প্রফুল্ল মুখ দেখে মনে হ'ল না বিশেষ কিছু ঘটেছে। নিজের হাতের তৈরী কেক, বিস্কুট, গোলাপজলের সরবত খাওয়ালে, যেচে গান শোনালে

কতরাজ্যের কতরকম গল্প, দেশ-বিদেশের খবর, আগ্রা আর দিল্লি-শহরের ছোট বড় সকল বাঙালী পরিবারের প্রায় দৈনন্দিন ইতিহাস—লতিকা না জানে কী? মনে পড়ে, একদিন ওখানকার এক বিচক্ষণ উকিলকে বলতে শুনেছিলাম—রাজ-রাজড়ার ঘরে জন্মাত যদি এ মেয়ে, তাহ'লে অনেকের দণ্ডমুণ্ড নির্ভর করত ওরই মেজাজ আর ইচ্ছার ওপর—On her sweet will only. সেদিন বুঝতে পারিনি কথাটা। কিন্তু—বড্ড যে রাত হ'য়ে যাচ্ছে সু!"

সুপ্রিয়া বললে, "তা হোক, সবটা না শুনলে আমার ঘুম হবে না।"

"শুনলেও হবে না। যাক, শোন্ তবে।

একথা-সেকথা নানান্ কথার পর চারুর বিয়ের বিষয়ে কি-একটা বলতে গিয়ে এক সময় নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে লতিকা ব'লে ফেলল, 'তোমাকে কিন্তু আমি ভারি শ্রদ্ধা করি রেণু। এ যুগে এরকম মেয়ে কি পথে-ঘাটে মেলে? যেমন কর্তব্যে দৃঢ়, তেমনি আশ্চর্য আত্মসংযম! আমি হ'লে কখনো এতটা সহ্য করতে পারতাম না, এই তোমায় ছুঁয়ে বলছি—বিশ্বাস কোরো ভাই। কতখানি ভালোবাসতে ওঁকে, তবু—। শুনেছি তো তোমার সব কথা!'

'কী শুনেছ আমার সব কথা?'

'আহা, চটো কেন? এ তো সবাই জানে। ওঁর জন্যে তুমি না করেছ কী? কিন্তু প্রতিদানে কী-ই বা পেলে বলো?'

'আমার সম্বন্ধে এত মাথা ব্যথা কার? কেন তারা—'

'রাগ করো কেন রেণু? বিমুদা নিজেই তো তোমার কথা কত বলেছেন আমায়। তুমি ওঁকে এত ভালোবাস, অথচ—'

রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'বিমলদা নিজে? তোমার কাছে? সত্যি বলছ?'

লতিকা আহত সুরে বললে, 'মিথ্যে ব'লে আমার লাভ? আমি

শুধু বলছিলাম কী—তোমার ভাগ্য ভালো যে নিজেকে ছোট হ'তে দাওনি। যেদিন নাকি প্রথম শুনলে'—চুপি চুপি বললে, 'অত কি জানতাম? সহরে কাণাঘুষো চলেছে অনেকদিন। কে নাকি বাইজী —যাই বলো রেণু, পুরুষমাত্রেই ওরকম। আজ একে, কাল তাকে—'

উঠে পড়লাম। মাথায় তখন আগুন জলছে, বললাম, 'দরোয়ানকে বলো একটা গাড়ী ডেকে আনুক। আমায় শীগ্‌গির ফিরতে হবে।'

'ঘরের গাড়ীই দিয়ে আসবে এখন, ব্যস্ত কী? আয়া, রামখেলানকে খবর দাও। রেণু, চলো ততক্ষণ আমরা বাগানে গিয়ে দাঁড়াই ··· তোমায় বলব কি ভাই, আজকাল ওঁকে দেখলেই আমার রাগ হয়। এখানে প্রায়ই আসেন, বলতেও পারি না যে এসো না— কতকালের আলাপ!'

লতিকা কী যে ব'লে যাচ্ছে—কলের পুতুলের মতো শুনছি মাত্র। মনের সে অবস্থা নয় যে মানে বুঝব। রুদ্ধরোষে ভেতরটা কেবল ফুলে ফুলে উঠছে—এত ছোট বিমলদা, এত অনুদার ওর মন! ভালোবাসি ওকে, সেকথাটা শুধু নিজে জেনে তৃপ্তি হয়নি, বড়াই ক'রে বলতে গেছে, তাও লতিকার কাছে!

'জানো রেণু, একসময় এই আমাকেই নাকি এত ভালোবাসত', একটুখানি বাঁকা হেসে লতিকা বললে, 'অথচ বছর না ঘুরতে আর একজনকে—না না, তোমায় কটাক্ষ ক'রে একথা বলিনি। তোমার দোষ কী, কিছু তো জানতে না তখনও! ওমা, এই যে গাড়ী এসেছে, এক্ষুনি যাবে? বসবে না আর একটু? আচ্ছা চলো। ··· যাই বলো ভাই, আগে কিন্তু এত বাড়াবাড়ি ছিল না। এখন নামেই খেয়েছে। পুরুষমানুষের মাথা তো, যাকে না বিগ্‌ড়ে? সহরসুদ্ধ সবাই যেন ওকে মাথায় তুলে নাচছে, বিশেষ ক'রে যে-বাড়িতে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে

রয়েছে—তুমি তো নিজেই জানো সব। সেদিন আমার মুখের ওপর বললে,—এ কি, আপনি যে? হঠাৎ কী মনে ক'রে?"

ফিরে দাঁড়াতেই দেখি সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে—বিমল। কতদূর শুনেছে কে জানে! লতিকার মুখের ভাব পলকে বদ্‌লে গেল, ব্যস্ত হ'য়ে বললে, 'কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন! আয়াটা যে কী, একটা খবরও কি দিতে নেই? দেব কালই ওটাকে বিদেয় করে—'

বিমল শান্তভাবে বললে, 'আয়ার দোষ নেই, ওরা কেউ আমায় দেখেনি', ব'লে আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো, কিন্তু কিছু বলবার আগেই লতিকা আবার বললে, 'নীলিমাকে জোর ক'রে ধ'রে এনেছি আজ, আসতে কি চায়।'

একটা কথাও না ব'লে গাড়ীতে উঠে বসলাম। রাগে অপমানে বুকের ভিতরটা তখন আমার পুড়ে যাচ্ছে। বিনাদোষে পরের কাছে একটি অসহায় মেয়েকে চিরদিনের মতো উপহাস্য ক'রে এত আনন্দ তোমার!

গাড়ীতে উঠে বসতেই বিমল ছুটে এসে ডাকল, 'নীলিমা!'

ঝুঁকে প'ড়ে দরোয়ানকে বললাম, 'জোরে হাঁকাতে বলো।'

'দিদিমণি, বাবুজী—'

'সময় নেই—সময় নেই আমার!'

গাড়ী ছুটে চলল।

পিছনে, একবার ফিরে দেখলাম—ভূতাবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিমল।"—রেণুর গলার স্বর ভেঙে পড়ল। সুপ্রিয়া সাবধানে দু'ফোঁটা চোখের জল মুছে আরো কাছে স'রে এলো, বললে—"তারপর?"

"তারপর—দু'টো দিন যে আমার কি ক'রে কাটল!

পরের দিনটা ছিল রবিবার। ঠিক করলাম আজ দুপুরে প'ড়ে

প'ড়ে কেবল ঘুমোব। এই ঘুমের মধ্যে দিয়ে ভুলব আমি অতীতের সকল জ্বালা যন্ত্রণা, নিরাশা আর অপমান। কাল থেকে নবজীবন! মনকে বারবার বোঝালাম, ভালোই হ'ল যে ওর উপর যত শ্রদ্ধা যত বিশ্বাস ছিল, সব এমন নিমেষে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল! এখন থেকে জানব, অপাত্রে ন্যস্ত করেছিলাম সেসব।—

কিন্তু মন কি বোঝে? সারা দুপুর ছটফট ক'রে বিকেলের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাইরে থেকে কাদের ডাকাডাকি চেঁচামেচিতে বিরক্ত হ'য়ে দরজা খুলে দিতে হ'ল।

ফিরে এসে বিছানায় বসতেই মনে পড়ল এইমাত্র কত কী স্বপ্ন দেখছিলাম, অস্পষ্ট, টুকরো টুকরো!…জলের ধারে ঝোপঝাড়ের ভিতর বিমল যেন উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে। ডাকলাম—সাড়া নেই। আস্তে পিঠে হাত দিতেই রাগ ক'রে জলে ঝাঁপ দিল। কতবার ডাকলাম, কিছুতেই আর উঠল না। স্বপ্ন মনে পড়তেই মনটা খারাপ হ'য়ে গেল! ওদের বাগানের সেই নির্জন অংশটাতে কতবার মুখ গুঁজে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে থাকতে দেখেছি—সেই অনেক-কাল আগে, যখন রাতদিন মন খারাপ ক'রে বেড়াত।

নিশ্বাস ফেলে ভাবলাম, কিন্তু এখন আর সেদিন নেই যে অসঙ্কোচে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি—সান্ত্বনা দেওয়া তো দূরের কথা। যতই ভাবি, ভারি একটা অনুতাপের সঙ্গে মনে হয়—কেন সেদিন লতিকার সামনেই অতটা তাচ্ছিল্য দেখিয়ে এলাম! যে অভিমানী, হয়ত কত কষ্টই পেয়েছে! ঠিক করলাম—সকালে উঠেই একটা চিঠি লিখে দেব। কী লিখব ভাবতে ভাবতে অনেক রাত অবধি ঘুম হ'ল না। ভোরের দিকে আবার কত কী দুঃস্বপ্ন! মনে পড়ল, অনেক লোকের মাঝে দাঁড়িয়েও বিমল যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। কী

অদ্ভুত সে দৃষ্টি! চোখে যেন পলক নাই, কেবল বেদনাভরা ম্লান ভৎর্সনা। দেখতে দেখতে ছায়াবাজির মতো সব মূর্তি মিলিয়ে এলো। শূন্যে ভেসে রইল কেবল দু'টি চোখের স্থির, অস্বচ্ছ দৃষ্টি।...সারা সকালটা এই স্বপ্নের স্মৃতিতে মন আমার ভার হ'য়ে রইল।

প্রায় দশটা তখন। প্রিন্সিপাল নিজে একখানা চিঠি দিয়ে গেলেন আমার হাতে।—

চিঠি বিমলের।" রেণু চুপ করল।...

অনেকক্ষণ পরে সুপ্রিয়া আস্তে আস্তে ডাকল, "দিদি!"

"আলোটা জ্বাল সু।......এই ছোট সুট-কেসটায় একেবারে নীচের দিকে একটা মোটা খাম আছে।...হাঁ, ওইটেই। নে, তুইই পড়।"

অনেক কালের পুরানো চিঠি। খুলে পড়তে গিয়ে সুপ্রিয়ার হাত কাঁপতে লাগল।

গোটা গোটা সুন্দর অক্ষরে লেখা—

"নীলিমা, দেখা হয়ত করবেই না, তাই বাধ্য হ'য়ে চিঠি লিখতে হ'ল। বিরক্ত হবে, জানি। তবু, একেবারে কিছুই না ব'লে যেতেও পারলাম না।

আমার স্বভাব তোমার অজানা ছিল না, বরং খুব ভালোরকমই জানতে আর বুঝতে আমায়, এতদিন এ ধারণাই ছিল আমার। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে, জীবন আর জগত সম্বন্ধে সব ধারণাই গেছে আজ উল্টে। জীবনে এই দ্বিতীয়বার সবার ওপর সব বিশ্বাস হারিয়েছি। কিন্তু এই-ই শেষবার। যা গেছে, চিরদিনের জন্যেই গেছে।

মানুষকে ঘৃণা করা—সে যে কী, জানো কি? নারীর ছায়াও অসহ্য হওয়া? মুখের দিকে তাকালে, সব লাবণ্য আর লালিত্যের পেছনে শ্রীহীন প্রেতিনীর মূর্তি দেখা? বোঝ কি এসব?......

তোমরা—শিক্ষিতা মেয়েরা, সোসাইটি-লেডি রঙীন প্রজাপতি —বাইজীদের চেয়ে নিজেদের এতই উঁচু ভাবো? একটি ; যাকে তোমরা ওই নামে ডাকো, তাকে আমি গান শেখাই, তার াড়ি যাতায়াত করি, সঙ্কটাপন্ন অসুখের সময় রাত জেগে শিয়রে ব'সে তার সেবা করেছি—এই অপরাধে, আপন শিক্ষা-দীক্ষা বুদ্ধির অভিমানে তুমি, রূপ আর আভিজাত্যের অহঙ্কারে তোমাদেরই আর একজন, বনা-বিচারে আমায় দণ্ড দিয়েছ—ত্যাগ করেছ! কী করছ তা একবারও ভেবে দেখলে না? একবারও মনে হ'ল না যে আমি ডাক্তার, রোগী যে-ই হোক ডাকলে যেতে বাধ্য?

ভালো, তোমাদের দণ্ড আমি মাথায় তুলে নিয়েছি।

তারপর—

তোমরা আমাকে যা মনে করেছিলে আজ সত্যিই তা-ই আমি। শুনে সুখী হ'লে তো? যাও এবার, গিয়ে দেশসুদ্ধ সবাইকে বলো—বিমল মগুপ, বিমল চরিত্রহীন। বিশ্বাস না হয়, এই দেখ তার নিজের হাতের লেখা স্বীকারোক্তি। তাও বিশ্বাস না হয়, যাও দুর্গাবাই-এর কাছে, জিজ্ঞেস করো গিয়ে তাকে। দেখবে—আমরা কেউ ভুল করিনি ওর সম্বন্ধে।'…

ভুল করোনি! কিন্তু এই ভুলের পথে আমায় ঠেলে দিলে কে? কে আমায় বাধ্য করলে এমন কাজ করতে? নীলিমা, জানো—কে? তুমি। তুমিই—আর কেউ নয়। শেষ পর্যন্ত যুঝেছিলাম আমি, লোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ করিনি। কিন্তু সেদিন—লতিকার সামনেই যে অপমান—

একদিন আমায় এমন তুলে ধ'রেছিলে, মনে হ'ত স্বর্গের দেবতা হ'তেও বাধবে না আর। উপরের সুনীল আকাশ, সন্ধ্যার উজ্জ্বল গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে ছিল আমার মিতালি। আমার প্রতি তোমার

নির্ভর, তোমার বিশ্বাস আর ভালোবাসার ওপর খাড়া করেছিলাম আমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন-প্রাসাদ। সেই তুমিই এত ছোট? এত সন্দিগ্ধ তোমার মন?

অক্লেশে বিশ্বাস করতে পারা—এর বেশি তোমার কাছে কোনোদিন কিছু চেয়েছি আমি?' ভেবে দেখ তো!—প্রথম যৌবনে একজায়গায় ধাক্কা খেয়ে, অনর্থক প্রতারিত হ'য়ে—না, থাক। লাভ কী! কারুর করুণার ভিখারী তো নই আমি! আর তুমি যে কতবড় করুণাময়ী তা কি আমি জানি না!

লতিকার কাছে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম—তুমিও আমায় দুর্গাবাইয়ের সম্বন্ধে সন্দেহ করো, আর সেজন্যই আমাদের বাড়ি আসা, এলেও আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা ছেড়ে দিয়েছ, বিশ্বাসই হয়নি। কিন্তু সেদিন বোর্ডিংএ একটিবারও যখন প্রতিবাদ করলে না, তারপর কাল নিজের চোখেই দেখলাম—কতখানি অশ্রদ্ধা ক'রে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলে, এত ক'রে ডাকলাম, একটিবার দাঁড়ালে না, এমন কি মুখের ওপর গাড়ী হাঁকিয়ে চ'লে গেলে—" সুপ্রিয়া ঝর ঝর ক'রে কেঁদে বললে, "দিদি, আর তো আমি পড়তে পারছি নে!"

রেণু গাঢ়স্বরে বললে, "থাক তবে, সবটা পড়ার দরকার কী? ওগুলো বাদ দিয়ে শেষের দিকটাই দেখ।"

শেষের দিকে লিখেছে বিমল—"তাহ'লে দুর্গাবাই কেমন মেয়ে একবার খোঁজ নিলে না কেন? কপালদোষে ও এখন বাইজী, কিন্তু ছিল ভদ্রঘরেরই মেয়ে। ছেলেবেলায় স্বামী মারা যায়, শাশুড়ী আর ননদের অত্যাচারে কুলত্যাগিনী হয়। কিন্তু তার কথা থাক। শুধু জেনো, যে চোখে পাঁচজনে দেখেছে তাকে, সে-চোখের দৃষ্টি বিজ্ঞ হ'তে পারে, কিন্তু মুক্ত নয়।

তবু, তোমরাই যদি আমাকে ঠেলে না দিতে ঐদিকেই, এমন কাজ

আমি পারতাম না করতে। উপরের নোঙর কাটলে তোমরা তারপর ডোবা ছাড়া আর আমার গতি রইল না।

কিন্তু পাতালে নামলেও আকাশের স্মৃতি আমি হারাইনি।...এর পরে আর আমার বাঁচা চলে না। মানুষের সাহচর্যে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়—"

সুপ্রিয়া চিঠি পড়া বন্ধ ক'রে জিজ্ঞাসুভাবে রেণুর মুখের দিকে তাকাল।

ক্লান্তকণ্ঠে রেণু উত্তর দিল, "দিন দুই পরে, আগ্রায় যমুনার ধারে ঝোপের মধ্যে ওকে পাওয়া যায়।"

"জলে ডুবে?"

"না। বিষ......।"

রাত তখন তিনটা।

রেণু অন্ধকারে ঠাহর ক'রে সুপ্রিয়ার মাথায় হাত রেখে বললে, "জেগে আছিস? চল্, এই বালিস দুটো নে। কেবিনে বড্ড গরম। এসময় ডেক-এ শুলে কেউ দেখবে না।"

সুয়েজের ভিতর দিয়ে চলেছে জাহাজ, ধীর মন্থরগতিতে। উভয় তীরের তপ্ত বালুর রাশি দুপুরের খর রৌদ্রে চিক্ চিক্ করছে। সারা সকালটা যাত্রীরা প্রায় সকলেই ডেকের উপরে ছিল। এখন কেউ লাউঞ্জে, কেউ স্মোকিংরুমে, কেউ বা ডাইনিংরুমে জানলা বন্ধ ক'রে সব ক'খানা ফ্যান খুলে দিয়ে যার যার রুচি-অনুযায়ী আড্ডায় বসেছে।

নির্মল খাবার পর থেকে, ঘুমোবার বৃথা চেষ্টা ক'রে অবশেষে বিরক্ত হ'য়ে উঠে পড়ল। একখানা ইংরেজী নভেল হাতে নিয়ে, নরম চটি জোড়াটা পায়ে দিয়ে, যেমন ছিল ঠিক সেই বেশেই চলল ডেক-এ। উপরে উঠেই নজর পড়ল, এককোণে একটুখানি ছায়ার আড়ালে ইজিচেয়ার পেতে সুপ্রিয়া শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে কি জেগে আছে ঠিক বোঝা গেল না। একটুখানি ইতস্তত ক'রে চলে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াতেই পায়ের শব্দে সুপ্রিয়া চেয়ে দেখলে। নির্মল কাছে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

"দেখে মনে হ'ল হয়ত বা ঘুমোচ্ছ। অসহ্য গরম! কাল রাত্রে ঘুম একটুও হয়নি।"

"এখন পুষিয়ে নিলেন না কেন?"

"সাধ্য কি! এতক্ষণ তো সে চেষ্টাতেই ছিলাম। তোমাকে অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?"

"ঐ একই কারণ। রোদের তাপে নিশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আসতে চায়!"

"অথচ দেখ, তবু বেশ লাগছে আমার। যেদিকে তাকাই ধূ-ধূ বালু আর বালু! এই তো প্রথম দেখছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সব কত-কালের চেনা। এই খাল, ঐ মরু, ঐ উট, মায় ওর মালিকটি পর্যন্ত। ভাবছি কী জানো? আরব ছিলাম না তো কোনো এক জন্মে?"

সুপ্রিয়া হেসে বললে, "অসম্ভব নয়। অন্তত কল্পনা করা যায় বটে। আরব বেদুইনের মতোই প্রকৃতি কিনা! পূর্বজন্মের সংস্কার না থাকলে কি এতটা—"

নির্মল হাসল, কিন্তু তখনই গম্ভীর হ'য়ে বললে, "না, ঠাট্টা নয়। আমার সত্যিই কেমন অদ্ভুত লাগছে সব। ঐ দেখ, ঐ যে কাঁটা-ঘাস খাচ্ছে উটটা, তাও যেন আগে দেখেছি। অথচ, সত্যি বলছি তোমায়, এক চিড়িয়াখানায় ছাড়া উট কোথাও দেখিনি আমি আজ পর্যন্ত। এমন ক'রে চরতে তো নয়ই। ওধারে কাছেই মিশর আর তার চিরবিখ্যাত নীলনদ, ভাবতেও খুসীতে ভ'রে উঠছে মনটা। এমন কেন হয় বলতে পারো?"

সুপ্রিয়া অন্যমনস্কভাবে বললে, "কি জানি। ইতিহাস পড়ার ফলই হবে বা। গল্প কবিতা তো আছেই।"

"জন্ম-জন্মান্তর মানো না?"

"আমি মানলেও শুনছে কে?, প্রমাণ তো নেই হাতের কাছে!"

"পরের কথা থাক। তুমি মানো কিনা তাই বলো।"

"দেখুন নির্মলদা, গায়ের জোরে কিছু মানা বা না-মানার কোনো মূল্য আছে কি? বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উত্তর দিলেন—'কি জানি মা, আমি তো নাস্তিক মানুষ। তবে বুদ্ধদেবের সত্যবাদিতার ওপর আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে আমার। আবার এদিকে

গীতার লেখক—বা বক্তার—বুদ্ধিমত্তাও সাধারণ শ্রেণীর ব'লে মনে হয় না। ওঁরা দুজনেই পুনর্জন্ম স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেটা যে বাস্তবিক কী বস্তু, তা আমার এই বুদ্ধিতে তো বুঝে উঠতে পারি না; পারবার কথাও নয়। অনেক ভেবে তাই আমি এই ঠিক করেছি যে, যা জানি না, জানার উপায়ও পাই না খুঁজে, তা নিয়ে মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে কী হবে? সম্প্রতি এই মাত্র দেখছি যে আমার পুনর্জন্ম তোরাই—আমারই সন্তান-সন্ততি—' ব'লে হেসে ঘর ফাটিয়ে দিলেন। কিন্তু একথা আপনাকে বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে বাবার যুক্তিই অকাট্য ব'লে মেনে নিতে হবে। আমার এত কথা বলার মানে হচ্ছে, আমি শুধু একটা অন্ধ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর ক'রে কোনো কিছুকেই একান্ত সত্য ব'লে গ্রহণ করতে রাজি নই। প্রত্যক্ষ না হ'লে—"

"কিন্তু"—নির্মল বাধা দিয়ে বল্‌লে, "প্রত্যক্ষ যাঁদের হয়েছে, তোমার চেয়ে জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান যাঁরা তাঁদের কথার বা অভিজ্ঞতারও কি কোনো মূল্যই নেই? গীতাকার—"

"তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তবেই তো বুঝতাম! মুখোমুখি সমস্ত জিজ্ঞাসা ক'রে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করতাম।"

"তা হবার যখন উপায় নেই?"

"তখন, হয় চুপ ক'রে থাকা, নয়তো অপেক্ষা করা।"

"কিসের?"

"নিজেরই অভিজ্ঞতা হওয়ার। একদিন তাঁর দেখা যাতে পাই—"

"কার? শ্রীকৃষ্ণের?"—নির্মল মুখ টিপে হাসে।

সুপ্রিয়া চুপ ক'রে থাকে।

"তুমি দেখছি একটা আস্ত পাগল, সুপ্রিয়া। হয় পাগল, নয় তো—"

"নয় তো—কী?"

"যা তোমার নেই বলছ তা-ই দিয়ে ভরা তোমার মনটা। অন্ধ

বিশ্বাস! নইলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হওয়াটাও সম্ভব ব'লে মনে করো ?"

সুপ্রিয়া নিরুত্তর।

"জানো সুপ্রিয়া, তোমার কথা শুনে আমার মনে প'ড়ে যায় আর একজনের পাগলামী। আমার বড়দা নাকি শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেত। নিজেই বলেছে আমায়।"

"দেখতে পেতেন ? সব সময় ?"

"তা কি হয় ? মাত্র একবার কি দু'বার দেখেছিল। শুনবে সে কথা ?"

সাগ্রহে সুপ্রিয়া বললে, "শুনব। এখনই বলুন না।"

"কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো আর কাউকে কখনো বলবে না ?"

"কেন ?"

"বড়দা' বারণ করেছিল। যাক, শোনো। সেদিন তোমায় বলেছি যে ও মারা যাবার পরে, জীবনে আমার সম্বল বা অবলম্বন বলতে দিনকতক কিছুই যেন ছিল না। খুব যখন খারাপ লাগত, মনে মনে ওর এই কথাগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখতাম। মিথ্যে বলবার ছেলে ছিল না তো!"

"তারপর ?"

"ওর এই খোলা-চোখে প্রত্যক্ষ দেখার কথা মনে ক'রে তখন পেয়েছি বাঁচবার জন্যে মনের বল, আর আজও—সত্যি বলতে কি, যখন ভাবি সে সব কথা, মনে হয় সবটাই ছেলেমানুষের কল্পনা না-ও হ'তে পারে।"

"এইমাত্র বললেন, বড়দা' মিথ্যে কখনো বলত না। তবু সন্দেহ ?"

"ও কখ্খনো মিছে কথা বলেনি। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু—কী জানো ? যতই বয়স হচ্ছে, দশরকমটা দেখি আর শুনি,

ততই—যাক সে সব। কিন্তু optical illusion ব'লেও তো কথা আছে একটা ?"

"সে বিচার পরে হবে। এখন শুনিই না ব্যাপারটা।"

"ছেলেবেলায় নাকি বড়দার একটা দোষ ছিল। ওর জ্বালায় বাড়িতে দু'টি জিনিষ বাক্সে বন্ধ ক'রে রাখা ছাড়া রাখবার যো ছিল না। পেলেই চুরি করত। এক—আতর এসেন্স, সুগন্ধি-জাতীয় যে-কোনো জিনিস। দ্বিতীয়—ফুল। আর কিছুই কিন্তু ছুঁয়েও দেখত না, না খাবার জিনিষ, না টাকা পয়সা। সেণ্ট চুরি করলেই ধরা পড়ত। কারণ এই বুদ্ধিটুকু ওর ছিল না যে ও-জিনিষ আপন গন্ধেই চোরকে হাতে-নাতে ধরিয়ে দেয়। মেখে বেড়াত, আর মার খেত।"

সুপ্রিয়া হেসে বললে, "আহা ভারি ছেলেমানুষতো! বয়স কত তখন ?"

"এই—বছর আট কি নয়।—কিন্তু বোকামির শেষ ওর এখানেই। মামীমা বলতেন, ফুল-চুরির বেলায় ওর মতো ওস্তাদ নাকি দিল্লিতে আর দু'টি ছিল না। এত খবরও রাখত কি ক'রে কে জানে। যে বাগানের মালী একটু অসাবধান, একটু নিরীহ, সে বাগান থেকে একটু ফুটতে-না-ফুটতে অন্তর্ধান হ'ত তার সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে মিষ্টি-গন্ধওয়ালা গোলাপটি, বেলাটি। ফুলের বেলায়ও ছিল আশ্চর্য সৌখীন। নির্গন্ধ ফুল ভুলেও নিত না।

"একবার কোনো মন্দিরের বেড়া ডিঙিয়ে ফুল ছেঁড়া আর গোলাপের ডাল ভেঙে দেওয়ার অপরাধে মামাবাবু ওকে ভয়ানক শাস্তি দেন। বড্ড যখন কাঁদতে লাগল, মামীমা এসে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন; 'ছি বাবা, ঠাকুরের ফুল কি নিতে আছে ?'

'কেন নিতে নেই ?'

'অপরাধ হয় যে, ঠাকুর রাগ করেন।'…

"প্রায়ই নাকি যেত সে মন্দিরে। একদিন সন্ধ্যার আরতির পরে ওর নজর পড়ল ঠাকুরের ঠিক সামনে রাখা টাটকা কয়েকটি বেলফুলের ওপর। লোভ সামলানো দায়! খানিক উসখুস ক'রে শেষটায় প্রদীপের আলোতে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শুধু একটা ফুল! নেব গোঁসাই একটা? রাগ করবে নাকি তুমি?'

"ধবধবে শ্বেতপাথরের বিষ্ণুমূর্তির মুখের ওপর হাসির ছটা খেলে গেল। সাহস পেয়ে বড়দা সবচেয়ে বড় বেলাটি তুলে নিয়ে ভয়ে ভয়ে আবার চেয়ে দেখলে। ঠাকুরের মুখে তখনও হাসি। কী যে হ'ল তখন, ফুলটি নিয়ে অন্য দিনের মতো পালিয়ে না গিয়ে সামনেই মাটিতে ব'সে একমনে ঠাকুরকে দেখতে লাগল। যত দেখে ততই ভালো লাগে। মনে হ'ল—'এ ঠাকুরতো ভারি সুন্দর! কেন মিছামিছি ওরা ভয় দেখালে আমায়?' কতক্ষণ যে একভাবে বসেছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখে—ঠাকুরের রাঙা ঠোঁট দুখানি মৃদু মৃদু কাঁপছে, মধুর হাসিতে সমস্ত মুখ উজ্জ্বল, ওষ্ঠাধর ঈষৎ প্রসারিত, একাগ্র নত-দৃষ্টি প্রতিদিনকার মতনই সামনের পুষ্পাদি পূজা-সম্ভারের উপর নিবদ্ধ, কিন্তু আকর্ণ-বিস্তৃত ধ্যানময় চোখদু'টি থেকে ঠিক যেন অমৃত বর্ষণ হচ্ছে!···বড়দা আমায় বললে, 'মণি, তখন এত সরল ছিলাম যে একবারও মনে হয়নি অলৌকিক কিছু দেখছি। একথা যে কাউকে বলবার মতন, তাও মনে হয়নি। আশেপাশে কোথাও কেউ ছিল না তখন। অনেকদিন পর্যন্ত জানতাম—এমনই হয়, ঠাকুর এমনি ক'রেই সবাইর সঙ্গেই হাসেন, ফুল চাইলে নিতে বলেন। যখন জ্ঞান হ'ল, বুদ্ধি হ'ল, তখনই বুঝতে পারলাম এ শুধু সরল বিশ্বাসী শিশুর প্রতি ঠাকুরের অপার করুণা। আর ঠিক তখন থেকেই একথা যত্নে গোপন ক'রে চলেছি। আজ প্রথম এই তোকেই বললাম।' আবেগে নির্মলের চোখ ছলছল ক'রে এলো।

একটু পরে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা নির্মলদা, আপনার কি মনে হয় না ভগবান সত্যিই আছেন?"

নির্মল একটু হেসে বললে, "এতক্ষণ এত পাকা পাকা কথা ব'লে হঠাৎ ছেলেমানুষের মতন এ প্রশ্ন কেন? অর্থাৎ কিনা—বোকার মতন?"

"তা হোক। আমার কিন্তু ভারি জানতে ইচ্ছে হয় ভগবান সত্যিই আছেন কিনা, থাকলে তিনি কী বা কে! এমন কেউ কি নেই এ সংসারে যিনি আমায় বলতে পারবেন—কী করলে তাঁকে পাওয়া যায়?"

"সুপ্রিয়া, অকপট প্রশ্নের অকপট উত্তরই দিতে হয়। কিন্তু সে কি আমার দ্বারা সম্ভব? আমি এসব বিষয়ে আজকাল কদাচিৎ ভাবি, কারণ—কেন জানি না, ওতে আমার মন ভারি খারাপ হ'য়ে যায়। লেখাপড়া, আমোদ-আহ্লাদ কিছুই তখন ভালো লাগে না। যে বিষয়ে আমরা কেউ কিছুই জানি না, তা নিয়ে বৃথা বাগ্বিতণ্ডায় ফল কি? তবে তুমি এক কাজ করতে পারো। কতগুলো বই আছে—"

পিছন থেকে একজন খালাসী এসে জিজ্ঞাসা করলে, "সেলাম কর্তা, বোস সাহেব কি আপনারই নাম?"

"হাঁ। কি চাই?"

"ডাকতেছে ওই মিসিবাবা, তেনাদের সঙ্গে কি নাকি খেলবার কথা ছিল—"

"ওঃ, যাচ্ছি বলো গিয়ে। কী বলছিলাম? হাঁ—এই বইগুলো পড়ো তুমি। রোলাঁর 'জন্ ক্রিষ্টফার', এ-ই-র Candle of Vision, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী। দেখো যদি কিছু পাও ওতে। এর বেশি আমি আর কী বলব বলো।"

"আপনার আছে বইগুলো?"

"আছে। আরো অনেক বই-ই আছে, চাও যদি দিতে পারি। ভালো কথা, দিদিকে একবারও দেখলাম না যে?"

"খাবার পরেই মিসেস হ্যামণ্ড ধ'রে নিয়ে গেলেন ব্রিজ্ খেলতে। একবার বসলে কি আর চায়ের আগে ওঠেন ওঁরা ?"

"আমিও তো চললাম। তুমি একলাটি এখন করবে কী ? দাঁড়াও না হয় বই ক'টা দিয়েই যাই। না ?—কেন ?"

"চায়ের পরে দিলেও হবে, তার তো বেশি দেরি নেই আর।"

"আচ্ছা চললাম তাহ'লে, কিছু মনে কোরো না।"

স্থপ্রিয়া ব'সে ব'সে কত কী ভাবে ! সবাই আছে নিশ্চিন্ত, সবাই থাকে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। কেউ বা রয়েছে খেলাধুলায় মত্ত। ওই যে রেণুদি—কত বড় কত ভয়ানক মূল্য দিয়ে কিনতে হয়েছে তাকে জীবনের সব চেয়ে বড় অভিজ্ঞতা ! ওর মনের বেদনা আজ তো আর স্থপ্রিয়ার অগোচর নেই ! তবু দেখ, স্নেহে উদারতায় সরল হাসিখুসিতে ভরা ও-মেয়েটিকে দেখলে কারো কি সন্দেহ করবার যো আছে—কী রয়েছে ওর বুকের ভিতর ? ··· আর ওই নির্মল। ও ভাবতে জানে, বুঝতে জানে, জানে উচ্চ জিনিষের আদর করতে। তবু আপনাকে আপনি ভুলে প্রায় সারাক্ষণই আছে একটা-না-একটা লঘু আমোদ নিয়ে। দু'মিনিট যদি গম্ভীরভাবে থাকতে হয়, তবে তার শোধ তোলবার জন্যেই যেন হালকা হেসে নেয় দু'ঘণ্টা।

স্থপ্রিয়া ভাবে, এরা কি ক'রে জীবনকে মেনে নিয়েছে এত সহজে ? মনের দুঃখ মনে চেপে খাসা নিশ্চিন্তভাবে একজন খেলছে তাস; মহত্তর প্রেরণা, গভীর চিন্তা ও উচ্চতর আবেগকে সভয়ে এড়িয়ে আর একজন গেছে নারীর মনোরঞ্জনবৃত্তিতে হাত পাকাতে। ওরা কি সত্যিই স্থখ পায় এসবে ? স্থপ্রিয়া কেন পায় না ? কেন ওর মনটা থেকে থেকে অকারণে কেঁদে ওঠে ? মনে হয়, জীবনটা আগাগোড়া এক ফাঁকির ব্যবসা, আপনাকে ফাঁকি, পরকে ফাঁকি—ফাঁকি ছাড়া এর মধ্যে সত্য

কোথাও নেই! কিন্তু তা-ই যদি হয় তবে সে-ই বা কেন কেঁদে মরে? কেন ওদেরই মত হাসি খেলা গল্পগুজবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারে না? কিসের জন্যে মনটা ওর সারাক্ষণ এমন ব্যাকুল, এমন কাতর হ'য়ে থাকে? কেবল মনে হয়— কেন জন্মালাম, কী আমার কাজ, কোন্ পথ আমার সত্যপথ? নিজেকে নিজে বুঝি না, এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কী আছে? রেণুর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছে বটে—দেশের সেবা, স্বামীর অনুগামিনী হওয়া এই-ই ওর ধর্ম, ওর আদর্শ, ওর পথ। কিন্তু তা-ই যদি সত্যি হবে, তাহ'লে নিজের মনের ভিতরটা শত সন্দেহে ক্ষত-বিক্ষত কেন?

মনে পড়ে, একদিন ওর বাবাকে যখন বলেছিল এই অশান্তির কথা—যার কারণ সে খুঁজেই পায় না—তিনি সভয়ে বলেছিলেন, "মিনু মা, তবে তোর বিয়ে দিয়ে দিই শিগ্‌গির, কি বলিস?"

সুপ্রিয়া ততোধিক ভয়ে বলেছিল, "সে কি, এতে বিয়ের কথা আসে কোত্থেকে?"

"আসে মা, আসে। তুই আমারই মেয়ে তো! তোর বয়সে আমি পড়েছিলাম এক বেদান্ত-প্রচারক সন্ন্যাসীর পাল্লায়। না রে না, তাঁর সম্বন্ধে অসম্মান ক'রে একথা বলছি না, তিনি ছিলেন বাস্তবিক সচ্চরিত্র সত্যবাদী লোক। কিন্তু কী যে সব পরামর্শ দিলেন আমায়, ধ্যান-ফ্যান কত কী করবার মতলব!—দু'দিন না যেতে দেখি আমার আর দুনিয়ার কিছুই ভালো লাগে না। পড়াশুনো গেল গোল্লায়— বি-এ পড়ছিলাম তখন—কে বা যায় কলেজে, আর কে-ই বা ভাবে পরীক্ষার কথা? গেল সে বছরটা মাটি হ'য়ে। বাবা চোখ রাঙালেন, মা কত কাঁদলেন। আমার কিন্তু ঐ এক কথা—সন্ন্যাসী হব। ক'ষে সংস্কৃত শিখতে সুরু করলাম বেদ-বেদান্ত পড়ব ব'লে। ঘরের দোর বন্ধ ক'রে ধ্যান করতাম।"

"তারপর ?"

"আমার এক বন্ধু ছিল—নিখিল। সে আবার আমার চাইতেও এক কাঠি বাড়া। আর্টস্কুলের ছাত্র, বড্ড গরীব, বাপ কষ্টে খরচ জোগাতেন। চেহারাখানা ছিল, তোকে বলব কি মিনু, ঠিক যেন রাজপুত্তুর। দিন নেই রাত নেই, যখন-তখন আসন পেতে ব'সে এমন ধ্যান করা সুরু করলে যে দু'দিনে ওর মুখের রঙ হ'য়ে উঠল লাল টকটকে, ঠিক যেন রক্ত লেপে দেওয়া হয়েছে। সন্ন্যাসী তখন কলকাতায় ছিলেন না। আনাড়ি আমরা মনে করলাম নিখিলের খুব উচ্চ অবস্থা। কারো সঙ্গে কথা বলত না, চোখ তুলে চেয়েও দেখত না। খাওয়া দাওয়া গেল ঘুচে। আমরাও জোর করতে সাহস করতাম না।"

সুপ্রিয়া আগ্রহে পায়ের কাছে ঘেঁসে ব'সে তাগিদ দিয়ে বলেছিল, "তারপর কি হ'ল বাবা ?"

"একদিন নিজের ঘরে ধ্যান ক'রতে বসেছি। সারাদিনটা আমার এমনিতে একটুও ভালো লাগত না, কিন্তু যেই ধ্যানে বসতাম অমনি কোথায় যেন ডুবে যেতাম। এক অদ্ভুত শূন্যতা আর শান্তি ছাড়া অন্য কোনো বোধ থাকত না। সেদিনও এভাবে ব'সে আছি। হঠাৎ বাইরে থেকে দোরে এমন ঘা পড়ল—মনে হ'ল মাথাটা আমার বোধ হয় এখনি ছিঁড়ে যাবে। সে যে কি যন্ত্রণা! দু'হাতে মাথা চেপে ধ'রে দোর খুলতে যাকো, দমাদম্ লাথির ওপর লাথি।"

"তারপর, বাবা ?"

"অনেক কষ্টে দরজা খুলে দেখি—নিখিল। একেবারে বেদম পাগল হ'য়ে গেছে।" উমাশঙ্কর হাত বাড়িয়ে সুপ্রিয়ার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন, "কত ওষুধ কত কী, কিছুতেই কিছু হ'ল না, নিখিলের পাগলামি এজন্মে আর সারল না। সেই থেকে আমি ধ্যানের কথা ভাবতেও ভয় পেতাম। একে একে সব ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু মনের অশান্তি আর ঘোচেই না। সুখ কাকে বলে জানলাম কখন্ থেকে জানিস মা? যখন তোকে পেলাম এ-বুকে। তাই বলছি, সন্তানের মুখ না দেখলে কি টিঁকতে পারা যায় এ সংসারে? এখানে আছে কী? ··· পলে পলে আপন বুকের স্নেহ দিয়ে, দরদ দিয়ে সন্তানকে মানুষ ক'রে তোলা; দশের মধ্যে একজন যাতে হ'তে পারে সেই শিক্ষা দেওয়া, তার গৌরব আর প্রতিষ্ঠা দেখে জীবনের শেষভাগে নিশ্চিন্তে চোখ বুজে চ'লে যাওয়া—এর বেশি আমি তো আর ভাবতেই পারি না আজকাল।"

"বাবা, এই বুঝি তোমার আদর্শ?"

"না, মা, এ-ই আমার কর্তব্য। বাপ হওয়ার দায়িত্ব কি সহজ রে মিনু? যা কিছু করি, তোদের কথা ভেবেই করি। লোকে বলে, 'উমাশঙ্করের তুল্য চরিত্রবান পুরুষ একালে দেখা যায় না', কেউ বা বলে, 'ওর সততার সীমা নেই।' কিন্তু আমি তো মনে মনে জানি কী ভেবে চরিত্র রক্ষা করি, কোন্ উদ্দেশ্যে সততা ন্যায়পরতা ইত্যাদি আদর্শকে জীবনের মূলমন্ত্র ক'রে চলেছি। পরকাল মানি না আমি, ঈশ্বর আছেন কিনা তাও জানি না। এ জগতের কর্তা কেউ একজন আছেন জানলে বা অনুভব করতে পারলে কী করতাম কে জানে। কিন্তু হাজার চেষ্টা ক'রেও কোনোদিন কিছুই পাইনি; ধ্যানে শান্তি পেলেও ধ্যান ছেড়ে উঠলেই অশান্তি—অকারণ, অহেতুক ব্যাকুলতা! এদিকে নিখিল পাগল, ওদিকে সন্ন্যাসরোগে বাবা গেলেন হঠাৎ মারা। ঋণগ্রস্ত অন্তশ্ছিদ্র বিরাট জমিদারী আমার অনভিজ্ঞ কাঁধে। সব-রকমে দিশাহারা হবার উপক্রম! তোকে না পেলে কি করতাম ভাবলেও ভয় হয়। আদর্শের কথা বলছিস্ মিনু? তোকে কেন্দ্র ক'রেই আমার জীবনের সব আদর্শ গ'ড়ে উঠেছে মা।"

সুপ্রিয়া সভয়ে বললে, "কিন্তু বাবা, সন্তানও তো মানুষ! তাছাড়া রোগ আছে, মৃত্যু আছে—"

উমাশঙ্কর চোখ বুজে স্থির হ'য়ে রইলেন।

একটু পরে সুপ্রিয়া বাবার পায়ে হাত বুলিয়ে বললে, "কিন্তু বিয়ে হ'লে, সন্তানের মুখ দেখলেই যে সবাই শান্তি পায় তাও তো নয় বাবা? কত লোক আছে—"

"কত লোকের কথা হচ্ছে না মা। যা তা ক'রে জীবনটা যারা কাটিয়ে দিতে পারে না, সেরকম মনের গড়নই যাদের নয়, তাদের বাঁচবার আর বেঁচে থেকে সৎভাবে চলবার, সৎকর্ম করবার একটা কারণ তো থাকা চাই। আমার না আছে ভক্তি—কারণ, ভক্তি করব কা'কে?—না জ্ঞান। আমি জানি শুধু এক—কর্ম। নিজের জন্যে কর্ম ক'রে যে শান্তি নেই, আছে সাধ্যমত পরের কল্যাণের জন্যে সর্বস্বদানে—শক্তি, সামর্থ, অর্থ, বিদ্যা, প্রতিপত্তি সবই—ধ্যানে ধর্মে তো এ শিক্ষা আমায় দিতে পারেনি মিনু। সে শিখেছি আমি শুধু সন্তান-স্নেহের ভিতর দিয়ে।"

সুপ্রিয়া বরাবর নিঃসঙ্কোচে তর্ক করে। কিন্তু ওর অভিজ্ঞতাও হয়নি, জ্ঞানও নেই। তবু আর একবার শেষ চেষ্টা করলে। বললে, "কিন্তু বাবা, আমার তো মা হবার জন্যে এতটুকু আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ নেই! বরং কেমন একটা বিতৃষ্ণা। কী ক'রে বলতে পারো তুমি যাতে সুখী হয়েছ আমিও হব তা'তে?"

"সে-ই তো আমার একমাত্র ভয়। তাই জোর করতে চাইনে। কেবল একথা কোনোদিন ভুলিসনে মা, বাপ তোর কেবল বাপই নয়, তোর বন্ধুও। তেমন দিন কখনো যদি আসে, খুলে বলতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করিসনে।"

সুপ্রিয়ার চোখে জল আসে।

উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন তোর কী করতে ইচ্ছা হয়, বল দেখি মিনু? যা করলে তোর মনটা শান্ত থাকে, আমি তাতেই রাজি।"

"বাবা, তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারোনি। সব সময়েই যে খারাপ লাগে, তাতো নয়! বরং পড়াশুনো নিয়ে বেশ থাকি। তবু, থেকে থেকে মনে হয়—এ আমি কী করছি, আমার দিন যে বৃথায় কাটল, জীবনটা সত্যি সত্যি সার্থক হবে কিসে?"

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, অনেক ভেবে, পরিশেষে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বাবা বলেছিলেন, "এতক্ষণ পিতৃত্বের বড়াই করছিলাম মিনু, কিন্তু দেখ, হার মানতে হ'ল। সার্থকতার পথ কী? কি ক'রে বলব বল? এতো সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া নয় যে হাততালি আর বাহবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেজ থেকে নেমে এসে কী বললাম আমিও ভুলে যাবো, কী শুনল দু'দিন পরে লোকেও মনে রাখা দরকার বোধ করবে না। এ যে বড় শক্ত জায়গায় ঘা পড়েছে মা। বাপ হ'য়ে কি ক'রে নিজের খুসীমত যা-তা বলি? তার চাইতে এক কাজ কর। নানা রকম ভালো ভালো বই পড়। ইংরেজী, সংস্কৃত, দেশবিদেশের কাহিনী আর খবর। ক্রমে বুঝে দেখতে চেষ্টা করিস কী তোর ভালো লাগে, কোন্ কাজ করতে ইচ্ছা করে। আমি বাধা দেব না।"

"সত্যি বলছ, বাবা?"

"সত্যিই বলছি।"

সোৎসাহে সুপ্রিয়া বললে, "তবে প্রথমে আমাকে অনেকখানি লেখাপড়া শেখাও। তার পরে—"

উমাশঙ্কর মেয়েকে নীরব দেখে একটুখানি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "পরে—?"

"ইউরোপে পাঠাবে?"

"তুই যে ভারি ছেলেমানুষ মিনু, এখনো সংসারের কিছুই বুঝিস না! তাছাড়া একলা অত দূর-বিদেশে পাঠিয়ে আমিই কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব?"

সুপ্রিয়া সাভিমানে বললে, "মেয়ে না হ'য়ে যদি ছেলে হতাম তা'হলে কি করতে বাবা?"

কথাটা উমাশঙ্করের মনে লেগেছিল এবং তারই ফলে, প্রথম সুযোগেই বিজয়িনী চলেছে অনেকদিনের কামনার দেশের কাম্য-পথে। তবু কেন আজও এ অশান্তি? কেন মনে হয় এই কি সেই, যা এমন একান্তভাবে চেয়েছিল? এপথেই কি মিলবে সে সার্থকতা যার জন্যে ওর অন্তর ক্ষুধিত তৃষিত হ'য়ে আছে? যদি তা-ই হয় তবে কী সে? বিদ্যা ও জ্ঞান-অর্জন? অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কর্মশক্তি লাভ? কী সে পরম ও চরম ধন যা ওর জীবনকে প্রস্ফুট ফুলের মতো পূর্ণ-বিকশিত ক'রে তুলবে?

ওর মন বলছে, এই যে গৃহ ছেড়ে পথে বেরিয়ে এলো, এ যেন ওর 'অভিনিষ্ক্রমণ'। কিন্তু কিসের জন্যে?……

নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায় সুপ্রিয়া। তপ্ত ডেকের এধার থেকে ওধারে অন্যমনস্কের মতো পায়চারি করতে করতে ভাবে, "বাবা হয়ত ঠিক বলেছেন। মেয়েদের জীবনের শূন্যতার হাহাকার দূর করবার একমাত্র উপায় হয়ত—স্বামী আর সন্তান।"

স্বামী আর সন্তান! ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ গৃহকোণ!! এরই জন্যে এত ব্যাকুলতা, উদাস অশান্তি?—কিন্তু সে চিন্তায় মন কেন ভ'রে ওঠে না তাহ'লে? ছোট থেকে যা কিছু করেছে, যা কিছু চেয়েছে তার লক্ষ্য ছিল ওই মাত্র—স্বামী আর সন্তান, সন্তান আর আরাম—অবশেষে এ-ই কি বিশ্বাস করতে হবে ওকে?

কিন্তু সুপ্রিয়ার স্বভাবে এতে এত বিদ্রোহের ভাব আসে কোথা থেকে এবং কেন ? এই-ই যদি সত্য হয় ওর পক্ষে, তবে তাকে মেনে নিতে বাধা কী ? কেন অহঙ্কার মাথা তুলে দাঁড়ায় ভাবতে—'সকলে যা করছে আমিও কিনা শেষটা তা-ই—!' ওরে গরবী মেয়ে, কে কী করছে বা করছে না তা ভেবে তুইও কি নিজের কল্যাণকে দিবি দূরে ঠেলে ? হ'লই বা সামান্য, হ'লই বা গৃহকোণ—তোর-জন্যে তাই যদি হয় ভগবানের অভিপ্রেত—

ভাবতেই সুপ্রিয়া চমকে উঠে ; 'ভগবান' ! ভগবানের অভিপ্রেত ! কিন্তু তা-ও বা জানতে পারি কই ? কে বা ভগবান, কোথায় বা তিনি, কী-বা আমার জন্যে তাঁর অভিপ্রায় ! যদি বুঝতে পারতাম—

"বাবা ! তুমি সেই থেকে এখানে ব'সে আছ ? আচ্ছা কবি তো ! নইলে সুয়েজের তপ্ত বালুতটেও এমন কী মাণিকের সন্ধান পেয়েছ যে চা খেতেও একবার নীচে এলে না ? আমরা কত ফুর্তি ক'রে এইমাত্র উঠলাম টেব্‌ল থেকে। ব্রিজে রেণুদির পার্টিই জিতেছে, মিসেস হ্যামণ্ড তাই ওকে পীড়াপীড়ি করছেন আর এক হাত খেলবার জন্যে। দেখে এলাম সব। কিন্তু তোমার হয়েছে কী বলো তো ? এত ভাবনা কিসের ?"

"ভাবনা কি একটা যে নাম ক'রে বলতে পারব ?"

নির্মল না ভেবে-চিন্তে ফস্‌ ক'রে ব'লে ফেললে, "যাকে-তাকে পথের লোককে বলতে পারবেই বা কেন ? মনের মতো লোক যোগাড় হোক আগে, দেখব তখন।"

অসহ্য বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে সুপ্রিয়া বললে, "কী ? কি বললেন ?"

নির্মল চুপ।

ক্রোধে সুপ্রিয়ার মুখ লাল হ'য়ে উঠল। কঠোর কণ্ঠে বললে, 'ভেবেছেন সবাই মিস রায়ান? তাই হালকা টোনে ফ্লার্ট করতে এসেছেন?"

স্তম্ভিত নির্মল একটা কথাও বলতে পারল না।

অধিকতর তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুপ্রিয়া বললে, "আশ্চর্য এই আজকালকার ছেলেগুলো! না দেশী, না বিদেশী! এদের ভালোটাও নেই, ওদের ভালোটাও নিতে জানে না। মেয়ে দেখলেই মনে করে খেলার বস্তু যাদের কাছে প্রশ্রয় পায় রাতদিন, পৃথিবীসুদ্ধ সব মেয়েকে সেই একই দলে ফেলে, ইতর-বিশেষ ভুলে গিয়ে—"

রাগের মাথায় সুপ্রিয়া আরো কী যে বলত কে জানে। নির্মলের ঠোঁটদু'টো থরথর ক'রে কেঁপে উঠে একবার, তারপরেই কোনোদিকে না তাকিয়ে কথার মাঝখানেই দ্রুতপদে নীচে নেমে যায়।

কেবিনের দুয়ারে খিল এঁটে দু'হাতে মাথা চেপে ধ'রে আপনাকে আপনি শতবার প্রশ্ন করে নির্মল,—এর পরে ওদের সামনে মুখ দেখাবে কি ক'রে? রেণুদির কাছেও মাথা তুলে দাঁড়াবার পথ রইল না। ছি ছি, কেন হঠাৎ ওকথা বলতে গেল সে? সুপ্রিয়ার সঙ্গে ক'দিনেরই বা আলাপ? এমন লঘু-চরিত্র কেন ওর? আর কি সুপ্রিয়া ভুলেও ফিরে চাইবে ওর পানে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনের কোণে তীব্র অভিমান জ'মে ওঠে।— না হয় একটা কথা ব'লেই ফেলেছে, তাই ব'লে এত রাগ! যা মুখে আসে তা-ই ব'লে গেল! এতদিনের হৃদ্যতা কর্পূরের মতো এক নিমেষে গেল উড়ে?—যত ভাবে ততই মনে হয়, সুপ্রিয়াও কিছু কম বলেনি একটার বদলে দশটা কথা দিয়েছে শুনিয়ে। আর কী বিশ্রী

বিশ্রী কথা! নির্মল মেয়েদের 'খেলার বস্তু' মনে করে? নির্মল সবাইর সঙ্গে 'ফ্লার্ট' ক'রে বেড়ায়?—এমন সব কথাও বলতে পারল সুপ্রিয়া?

কপালের শিরা দু'টো দপ্ দপ্ ক'রে ওঠে, কেবিনের গরমে অসহ্য বোধ হয়। তবু বাইরে যাবার কথা নির্মল ভাবতেও পারলে না। উঠে ফ্যানটা খুলে দিয়ে খানিকটা অডিকলোন কপালে ঢেলে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো।—এ জগতে কেউ কারো নয়। এতটুকু ভুল করো, এতটুকু ত্রুটি হোক, কেউ সুবিচার করবে না। উল্টে দ্বিগুণ শোধ নেবে যেমন নিল সুপ্রিয়া। কিন্তু মেয়ে ব'লে ওর সাত খুন মাপ। যত দোষ কি কেবল ছেলেদেরই? সুপ্রিয়ার ব্যবহারে কি প্রমাণ হ'ল যে মেয়েরা খুবই শান্ত? ব'য়ে গেছে নির্মলের ও নিয়ে এত মন খারাপ করতে। কথা বলবে না? না-ই বা বললে! বেশ তো মিস রায়ানের কাছেই যাবে সে। ও যদি মন্দ ছেলে হয়, মন্দ মেয়েদের সঙ্গেই মিশবে, ভালো মেয়েরা ওর কাছ থেকে থাক দূরে।—

বেঞ্চির উপর উঠে নির্মল দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। অন্ধকারে একেবারে রেণুর সঙ্গে মুখোমুখি। ঠাহর ক'রে দেখে বললে, "কে, নির্মল? এইটেই তোমার কেবিন? খুঁজে খুজে হয়রাণ। করছিলে কী এতক্ষণ?"

আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "কই দেখি মুখখানা? হয়েছে, আর রাগ করতে না, চলো এখন ওপরে, আমাদের পোর্ট সৈয়দ দেখিয়ে আনবে চলো।"

"দরকার নেই দিদি, ভালো লোক কাউকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমরা সব মন্দ ছেলে—"

রেণু মুখ টিপে হেসে বললে, "রাগ তো কম নয় ছেলের!"

"মেয়েদের থেকেও বেশি নাকি?"

সান্ত্বনার সুরে রেণু বললে, "তুমিও যেমন! এখনও ওকে এটুকু চিনতে পারোনি? ও হচ্ছে জাত-এ্যারিস্টক্র্যাট্, একটুখানি মানে ঘা লাগলে বা এতটুকু খারাপ কথা শুনলে কেউটের মতো ফণা তুলে দাঁড়ায়। নইলে ভারি লক্ষ্মী মেয়ে, সত্যি বলছি। তাছাড়া এখনও ছেলেমানুষ। সব সময় সকলের সব কথা বুঝতেও পারে না। তুমি নিশ্চয়—"

নির্মল নতমুখে বললে, "দোষ হয়েছে আমার।"

"সেটুকু বুঝলেই হ'ল। এখন এসো আমার সঙ্গে, পোর্ট সৈয়দে নামবার পরামর্শ করা যাক।"

উপরে উঠতে উঠতে কী ভেবে রেণু বললে "আমার মনে হয় সকলের সঙ্গে নামাই ভালো। এসব জায়গার বদনাম আছে। একলা গেলে একটা বিপদ আপদ ঘটতে কতক্ষণ।"

"বেশ তো চলুন।"

"সু নীচে গেছে টাকা আনতে। দু'একটা জিনিষ কিনতে হবে। তুমি ততক্ষণ মিসেস হ্যামণ্ডকে ব'লে এসো যে আমরাও নামব ঠিক করেছি। এখানেই রইলাম আমি।"

নির্মল দু'এক পা না যেতেই ঝড়ের মতন ছুটে এসে মিস র‍্যান্সান বললে, "বোস, কই—যাবে না?"

নির্মলের বুকের ভিতরটা ধক্ ক'রে উঠল—সুপ্রিয়ার শক্ত শক্ত কথাগুলো! ডরোথীর মুখের দিকে লজ্জায় সে তাকাতেই পারলে না।

"চুপ ক'রে রইলে যে? যাবে না?"

নীরসকণ্ঠে নির্মল উত্তর করলে, "আজ আমায় ওঁদের সঙ্গে যেতে হবে।"

বিদ্রূপের স্বরে ডরোথী বললে "তোমার বোন আর বন্ধুনীর সঙ্গে?"

কঠিন হ'য়ে নির্মল বললে, "হ্যাঁ।"

"তবু ভালো, এতদিন পরে তাহ'লে কপাল ফিরল তোমার? বহুত আচ্ছা, গুড-বাই—আশা করি খুব ফুর্তি হবে।" যাবার সময় ঘাড়টা ফিরিয়ে ঈষৎ নিম্নস্বরে বললে, "আমি হ'লে প্রাণ গেলেও ঐ অজগরের মতো কুঁড়ে মেয়েটার—"

"মিস রায়ান, আপনার কোনো অধিকার নেই যা-তা বলবার!"

ডরোথী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে বললে, "এ কথাটা শেখালো কে তোমায়? কিন্তু পরে তদন্ত করা যাবে এর। এখন ও-রিভোয়া—" ইঙ্গিতে হাওয়ায় একটি চুম্বন ছুড়ে হেসে বাঁ-দিকের সিঁড়ি দিয়ে ডরোথী নেমে গেল। আর ঠিক সে মুহূর্তে নির্মল দেখে—ডানদিকের সিঁড়ির গোড়ায় এদিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রিয়া। অতদূর থেকে ওদের কথাবার্তা কিছুই শোনেনি সন্দেহ নেই। কিন্তু নিশ্চয় ডরোথীর শেষ বিদায়দৃশ্যটা দেখে ফেলেছে। ভয়ে আর লজ্জায় নির্মলের চোখ-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে ওঠে।

সুপ্রিয়া ধীরে পাশ কাটিয়ে ডেক-এ চলে যায়, নির্মল ওর দিকে চোখ তুলে একবার চাইতেও পারে না।

পোর্ট সৈয়দ থেকে ফিরে ক্লান্ত যাত্রীরা যে যার কেবিনে বিশ্রাম করতে চ'লে গেছে। আর ঘণ্টা দুই পরেই জাহাজ ছাড়বে। রেড-সী আর সুয়েজের অসহ্য গরমের পর পাতলা নাইট-সুট গায়ে ডেক-এ দাঁড়িয়ে এক এক সময় নির্মলের রীতিমত ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। রেলিংএ ভর দিয়ে জলের পানে তাকিয়ে কতক্ষণ থেকে কী যে ভাবছে ও-ই জানে। ডাক্তার এসে কয়েকবার ডেকে গেল; একসঙ্গে 'কিছু পান' করবার জন্যে রুম-মেট দু'তিনবার পীড়াপীড়ি ক'রে মনে মনে ওর উপর কী সব অপ্রিয় বিশেষণ আরোপ ক'রে অন্য সঙ্গী খুঁজতে গেল চ'লে। খালাসীদের ফিরে আসা থেকে সিঁড়ি উঠিয়ে নেওয়া, নোঙর তোলা, বহিঃসমুদ্রের দিকে জাহাজের ধীরে ধীরে পাড়ি দেওয়া—নীরব শৃঙ্খলার সহিত একে একে সব কাজই হ'য়ে গেল। ইতিমধ্যে রেণুও ডেক-এ একবার ঘুরে গেছে। নির্মলকে তদবস্থায় দেখে মনে করলে, বোধ হয় ঘুমোতে ঘুমোতে জাহাজ ছাড়বার আওয়াজ পেয়ে প্রাচ্যের শেষ বন্দরকে কয়েক বছরের জন্যে শেষ-বিদায়বাণী জানাতে এসেছে। পূর্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে জাহাজ এবার সোজা পশ্চিমের দিকে দিয়েছে আপন বাষ্প-তুরঙ্গম ছুটিয়ে। মার্সেলসের আগে থামবে না আর কোথাও। এবার থেকে সবই ইউরোপ আর ইউরোপীয়ান। এই সমুদ্রের জলও ইউরোপের পাদমূল প্রক্ষালিত ক'রে তরঙ্গের পর তরঙ্গাঘাতে এখানে এসে পৌঁছেছে। ঐ যে শীত-শীকর-সম্পৃক্ত

হাওয়া, তা-ও ইউরোপের পাহাড়, প্রান্তর, নদনদীর বুকের উপর দিয়েই এসেছে প্রবাহিত হ'য়ে। সর্বত্র একটা পরিবর্তন টের পাওয়া যাচ্ছে এরই মধ্যে।

শীত ক'রে ওঠায় শাড়ীখানা ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে রেণু ফিরবার মুখে ওদিকে চেয়ে দেখলে নির্মল তখনও যায়নি। হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্মলের মনের মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তনের স্রোত চলেছে ব'য়ে? ইচ্ছা হ'ল একবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। পরক্ষণেই মনে হ'ল—এই ভাই-বোন সম্পর্ক ওদের নিজেদের কাছে যত পবিত্র, যতই সত্য হোক না কেন, এতরাত্রে পরের চোখে সেটার মানে হ'য়ে উঠবে কদর্য, কলুষিত। নির্মল যে ওর ছোট ভাইয়ের বয়সী, তারও কি কোনো মূল্য দেবে ওরা?—রেণু বিনাবাক্যে নিঃশব্দে কেবিনে ফিরে গেল।

শেষরাতে ভয়ানক শীত ক'রে ওঠায় নির্মলের ঘুম ভেঙে যায়। ধড়মড় ক'রে উঠে দেখে পূর্ব আকাশ নবোদয়ের রঙীন আভায় এরই মধ্যে আলোকিত হ'য়ে উঠেছে। কাল অনেক রাতে ক্লান্ত হ'য়ে ওই ইজি-চেয়ারটায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের মধ্যেও ভাবনার বিরাম নেই।

নীচে যেতে যেতে নির্মল ভাবে, হঠাৎ ওর হ'ল কী? এ কী অদ্ভুত পাগলামি পেয়ে বসেছে ওকে?—দিন পনের আগেও যাকে চিনত না, এমনকি নামও শোনেনি, আর দিন পনের পরেও যার সঙ্গে চিরদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যাবে, এজন্মে হয়ত আর কোনো সুযোগে কাছে আসাও ঘটবে না, তার চোখে নিজেকে ভালো প্রতিপন্ন করবার এ কী অদম্য আকাঙ্ক্ষা পেয়ে বসল ওকে? নির্মলকে ও

যতটা খারাপ মনে করেছে, সে যে বাস্তবিক ততটাই খারাপ নয়, কেন হাজারবার ইচ্ছে হচ্ছে এ কথাটা ওকে কেউ বুঝিয়ে দিক? কেন ওর এত মাথা-ব্যথা, সংসারে এত লোকের মধ্যে ওই একটি মেয়ের অটুট শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের যোগ্য হ'তে? নির্মলের কি আর কোনো কাজ, কোনো উদ্দেশ্যই নেই জীবনে? বিলেতেও চলেছে কি ও সত্যিই কেবল ফুর্তি করবার জন্যে? বেশ তো, কেউ যদি তা মনে করেও, সে-ই বা কেন এত দুঃখ পায় তা'তে, কেন গ্রাহ্য করে লোকের কথাকে? দু'দিন আগেও তো নির্মল কোনো মেয়ের সম্বন্ধে কখনো এতখানি ভাবেনি। সুপ্রিয়া ওর এমন কোন্ জায়গায় আঘাত করল যে কাল থেকে একটি মুহূর্তের জন্যেও তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছে না? কোথায় ওর ব্যবহারে খুব রাগ করবে—রাগ করবার অধিকার কি নেই নির্মলের? রেণুদিও কি বলেনি যে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়েছে সুপ্রিয়া?—তা না, ওরই কথা ভেবে ভেবে সারা রাত ঘুম হ'ল না!

কিন্তু—সুপ্রিয়া যে নির্মলকে খুবই মন্দ মনে করে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তা না হ'লে কাল পোর্ট সৈয়দেও ওরকম ব্যবহার করত না। বাজারে চলেছিল ওরা তিন জনে। পিছনে মিসেস হ্যামণ্ডরা আসছিলেন অন্য গাড়ীতে।

গাড়ী চলতে সুরু হয়েছে, এমন সময় ঠক্ ক'রে সুপ্রিয়ার পার্স্ গেল প'ড়ে। কোচম্যান বললে, "বহুজীর ব্যাগ—"

নির্মল লাফ দিয়ে নেমে পার্স্‌টা সুপ্রিয়ার হাতে দিয়ে উঠে বসতেই নির্বোধ লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে আবার ব'লে বসল, "সাহেব এদিকে সরে বসুন, আপনার আওরত—"

নির্মল স্পষ্ট দেখলে সুপ্রিয়া হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

রেণু বললে "আওরত না, বোন।" সংশোধনের ফলে লোকটা থতমত খেয়ে হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইল।

নির্মল কিন্তু নত মুখখানা আর তুলতেই পারলে না, যেন অপরাধটা ওরই। সুপ্রিয়ার স্পষ্ট বিরক্তি আর বিতৃষ্ণার সামনে ব'সে ব'সে ওই বোকা লোকটার প্রতি নিস্ফল আক্রোশে ফুলতে থাকে। এর পরে সুপ্রিয়া একবারও ওর সঙ্গে ভালো ক'রে কথা বলেনি।

বড়ই ক্ষোভের সঙ্গে নির্মলের মনে হয়, কেন ডরোথী রায়ানের সঙ্গে অমনভাবে মিশতে গিয়েছিল সে? তা না হ'লে তো সুপ্রিয়া ওকে এত অশ্রদ্ধা করত না! এখন কী করলে ওর মনের ভুল ধারণা দূর ক'রে দিতে পারা যায়? ডরোথীকে তো ভালবাসে না সে, তবে—হ্যাঁ, টান একটু হয়েছিল বই কি। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই নির্মলের কেন যে এত চঞ্চল হয় মনটা! কিন্তু সেটা কি ওর ইচ্ছাকৃত? বুদ্ধিমতী ব'লে যারা গর্ব করতে পারে তারা এ সহজ কথাটা বোঝে না কেন? দুর্বল লোককে বুঝতে চাইবে না একটুও, অথচ বিচার করবার বেলায় হবে জজের চেয়েও কঠোর। এতটুকু ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমার চোখে দেখবে না।—ভাবতে ভাবতে নির্মলের মনটা অভিমানে ভ'রে ওঠে। ছুটে গিয়ে সুপ্রিয়ার হাত দু'খানি ধ'রে অতল-গভীর চোখ দু'টির পানে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছা করে, "একবার চেয়ে দেখ, দুর্বল হ'লেও এমনই ভণ্ড ব'লে মনে হয় কি? তবে এত তাচ্ছিল্য করো কেন? কেন বোঝ না একটুও?"

আরো কত কী বলতে ইচ্ছা করে! কিন্তু ব'লে কি হবে? সুপ্রিয়া কি কান দেবে? না ওর কঠিন মনে এতটুকু দাগ পড়বে! উল্টে হয়ত আরো কী ভাববে কে জানে!...

সনিশ্বাসে নির্মল ভাবলে, কিন্তু মিছে দোষ দেই ওকে। আমার মতন অতি সাধারণ, অতি নগণ্য ছেলে এজন্মে কখনো ওর মনের

নাগাল পাবে না—সারাক্ষণ ও যেন ধরা-ছোঁয়া-যায়-না এমন কিসের দিকে নিবিষ্টচিত্ত হ'য়ে আছে। সে কী আত্মভোলা ভাব! সত্য আর সুন্দরের জন্যে—মহানের জন্যে কী আন্তরিক ব্যাকুলতা!

উঠে মাথায় জল দিয়ে আয়নায় একবার নিজের শুষ্ক বিবর্ণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে নির্মল আপন মনে বললে, "ওর মতো রুচি যার, সে কি ক'রে লঘুচিত্ত লোককে শ্রদ্ধা করবে? ভালই করেছে আমায় যা তা ব'লে। একটু বেশি রাগী? তা হোক। আমি কোন্ সাহসে ওর বিচার করতে যাই? জানি তো নিজেকে—?" খানিক থেমে কোটটা টেনে গায়ে দিতে দিতে ভাবে, "অথচ এই আমারও এক এক সময়ে কত কী আশা জাগে মনে। ভালো হ'য়ে চলবার, ভালো কাজ করবার, জীবনখানি স্বচ্ছ সুন্দর মহৎ ক'রে গ'ড়ে তোলবার। কিন্তু ভাবি কী—আর করি কী! মুহূর্তের প্রলোভনে নিজেকে ফেলি হারিয়ে, তারপর—তারপর কি আর এতটুকু মনের জোর মজুত থাকে বড় কিছু ভাববার বা করবার জন্যে? নিজের উপর ঘেন্নায়—দূর হোক গে ছাই, ভেবে ভেবে আর তো পারিনে!"

সশব্দে ড্রয়ার বন্ধ ক'রে বাইরে চলল নির্মল। 'করিডরে' সিংএর সঙ্গে দেখা। ওকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "কি হে, এত ভোরে চলেছ কোথায়? চা আনবে যে এক্ষুণি।"

"থাক্। না হয় তুমিই খেয়ে নিয়ো দু'টোই। আমি চললাম ওপরে, মাথা ধরেছে বড্ড!"

"তাই তো চা—"

"ইচ্ছে করছে না।"—সিংএর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে একটু দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে চলল! বাঁ-দিকের কেবিনগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখলে। ঐ যে দুয়ারে ঘন সবুজ রঙের পর্দা ঝুলছে ওটাই সুপ্রিয়াদের। ওরা কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি এখনো।

ডেক্-এর উপর এসে দাঁড়াতেই বিস্মিত নির্মলের হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হ'য়ে চলে। এত ভোরে ঐ রেলিংএর কাছে দাঁড়িয়ে কে? সুপ্রিয়া না? কী দেখছে অমন স্তব্ধ হ'য়ে?—ওর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে নির্মল দেখলে জলের উপর ঢেউয়ের তালে তালে তরুণ তপন দোদুল নৃত্য করছে। এখনি জল ছাড়িয়ে উঠবে! খালাসীরা ডেক ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে ব্যস্ত। দু'চারজন কৌতুহলী চোখ তুলে বার বার সুপ্রিয়াকে দেখছে, কিন্তু ওর সেদিকে খেয়াল নেই। এক অদ্ভুত মৌনতার পরিমণ্ডল ওর সর্বাঙ্গ ঘিরে, বাইরের কোলাহল কানে প্রবেশ করছে কিনা সন্দেহ। একটু পরে ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একপাশে মুখ ফিরিয়ে পায়ের নীচে জলের দিকে একবার চেয়ে দেখলে। ভোরের সেই কোমল আলোকে নির্মলের মনে হ'ল এমন অপূর্ব স্নিগ্ধ মুখ, এমন বিষণ্ণ দু'টি চোখ জীবনে দেখেনি। সুপ্রিয়াকে সুন্দরী মনে করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এই যে ললিত শ্রী, ঐ উদার ললাট, অতি সুকুমার ওষ্ঠাধর, এসবে প্রতিফলিত হয়েছে যে লাবণ্য সে তো দেহের নয়! আশ্চর্য যে সুপ্রিয়ার এ-রূপ এতদিন একবারও নির্মলের চোখে পড়েনি! এক অজানা আবেগে বুকের ভিতরটা ওর দুলে দুলে ওঠে। আপনি আড়ালে থেকে দু'চক্ষুর পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে ঐ ধ্যানমৌনা নারীকে দেখতে দেখতে নির্মলের গভীর অন্তর থেকে আপনা-আপনি যেন কোন্ প্রার্থনা বাণী বেরিয়ে আসতে চায়।

নবীন সূর্যশোভিত উন্মুক্ত আকাশে, অনন্ত সমুদ্রে সর্বত্র আপনার সেই অনুচ্চারিত আবেগকে উন্মোচিত বিস্তারিত ক'রে দিয়ে নিঃশব্দে নির্মল কেবিনে ফিরে চলল। মনে মনে ভাবলে, "প্রতি স্তব্ধ সূর্যাস্ত তোমার যে নীরব বাণী বহন ক'রে আনত আমার অন্তরে, সেই কিশোর কাল থেকে রূপাতীত রূপ যার দেখেছি অথচ চিনতে পারিনি, শুনেছি

অথচ আপন মুখর মন দিয়ে ভাষা যার বুঝতে পারিনি, তারই ইঙ্গিত স্পষ্ট হ'ল কি আজ এই শান্ত সূর্যোদয়ে!"

কেবিনের খোলা জানলার মধ্য দিয়ে আলো-উদ্ভাসিত সাগরের পানে চেয়ে নিজেকে নিজে বারবার বললে, "অনন্তের বুকে ভাসতে ভাসতে অনন্তের রহস্যলিপি চোখে ফুটে উঠল কি আজ একটি নিমেষেই! সুপ্রিয়া, আমার অন্তরের আনন্দ তোমার অন্তরে গিয়ে পৌঁছাক, মুখে আমি কখনো তোমায় একথা জানাবো না।"

কতক্ষণ যে এভাবে দাঁড়িয়েছিল, নির্মল নিজেই জানে না। সিং জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলালে, "কি হে, রাতদিন দোরে খিল দিয়ে করো কী? চা-ও খেলে না,—কিছু না—ভালো লোকের পাল্লায় পড়া গেছে! আমি কি তোমার গিন্নি যে সামনে ব'সে পীড়াপীড়ি ক'রে মাথার দিব্যি দিয়ে খাবার গেলাবো? বাঙালীদের তো শুনেছি তা না হ'লে খাওয়াই হয় না!"

নির্মল হেসে বললে, "কই দাও দেখি কোথায় কী আছে।"

"হ্যাঁ, তুমিও যেমন! 'বয়' সেগুলো ফেলে রেখে গেছে কিনা! ইচ্ছে হ'লে একটা আপেল খেতে পারো, আলমারীতে আছে, নাও খুলে।"

নির্মল ওয়ার্ডরোবের দরজাটা খুলেই বললে, "বাপ্ কী গন্ধ! খাবার রাখবার জায়গা পাওনি আর? স্টীমারের এই গন্ধটা আমার মোটে ভালো লাগে না।"

সিং হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললে, "কাল রাত্রে এত ক'রে ডাকলাম—"

বাধা দিয়ে নির্মল বললে, "দোহাই তোমার, ঐ তুড়ি-ফুড়িগুলো দেওয়া ছাড়ো! কোথা থেকে যে শিখলে ওসব। বিলেতে এসে পড়লে, এখন একটু আদব কায়দা মেনে চলতে শেখ। নইলে যেখানে সেখানে নাস্তানাবুদ হবে ব'লে রাখলাম।"

"তোমার আর বলতে হবে না ভাই, নাকাল তো আমি হচ্ছি প্রতি মিনিটেই।" গলা বাড়িয়ে বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখে ফিস ফিস ক'রে বললে, "আচ্ছা দরাজ কপালখানা নিয়ে জন্মেছিলে হে! যেখানে যাও মেয়েরা যেন তোমায় ছেঁকে ধরে। এই সেদিন মিস রায়ান, আর আজ—অথচ কেমন যে ওদের পছন্দ তাও বুঝি না।"

"কী যা তা বকছ সকালবেলা?"

"আরে, রেখে দাও তোমার দম্‌বাজী! অত ভোরে উঠে ডেক্‌-এ বেড়াতে যাও কোনো দিন? আমি কিছু দেখিনি মনে করেছ? কিন্তু ও বড় কঠিন ঠাঁই—বুঝলে হে? বিশেষ সুবিধা করতে পারবে ব'লে মনে হয় না। যা প্রাউড্ মেয়ে মিস্ মিটার—"

নির্মল বিরক্ত হ'য়ে বললে, "নাঃ থাকতে দিলে না দেখছি, চললাম আমি।"

"আহা--ঐ তো তোমার দোষ। আরে শোনো; শোনো, I say Bose!"

নির্মল ফিরল না দেখে হেসে মনে মনে বললে, "চটেছে, খুব চটেছে! ব্যাপার তাহ'লে সত্যি সিরিয়াস্!"

খাটে ব'সে খানিকক্ষণ পা নাচিয়ে কি ভাবলে। তারপর হঠাৎ উঠে প'ড়ে অর্ধ স্বগতস্বরে বললে, "Now here's your chance, old boy! Strike the iron while—একথা আজই মিস্ রায়ানের কানে তুলতে হবে, যেমন ক'রে হোক।" শিস্ দিতে দিতে পাঞ্জাব-কেশরী সিং ক্ষিপ্রহস্তে নিখুঁত প্রসাধনে ব্যাপৃত হ'ল।

লাঞ্চের পর দুপুরবেলা রেণুকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে স্টীমারের সর্বত্র অন্বেষণ ক'রে অবশেষে ক্লান্ত হ'য়ে সুপ্রিয়া যখন ফিরবার উদ্যোগ করছে, তখন দেখা গেল জাহাজের একেবারে একপ্রান্তে স্টুয়ার্ডেসের ঘরে ব'সে সে ঘনিষ্ঠ আলাপে রত।

সুপ্রিয়া দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রৌঢ়া মিসেস জস্ ব্যস্ত হ'য়ে ঘরে আহ্বান ক'রে নিল, "আমার কী সৌভাগ্য যে আপনারা—"

"থাক্ থাক্ ব্যস্ত হবার দরকার নেই, এই টুলের ওপরেই বেশ বসেছি। কিসের গল্প হচ্ছিল?"

"এই সাত পাঁচ নানান গল্প, মিস। আপনার বোনকে বলছিলাম যে যদিও আমার বর্তমান বাড়ি লিভারপুলে, কিন্তু ছেলেবেলায় থাকতাম স্বর্গতুল্য জায়গায়। মানুষ হয়েছি ট্রসাক্‌সের পাহাড়ে পাহাড়ে। বালিকা-বয়স এমন কি প্রথম যৌবন পর্যন্ত আমাদের Loch আর পাহাড়, বন আর জঙ্গল, ডেইজি, ব্লুবেল, মেরিগোল্ড আর হেদারের সঙ্গ ছাড়া অন্য সঙ্গী জানিনি; অমনি ক'রেই যদি কাটাতে পারতাম সারা জীবনটা! কিন্তু হঠাৎ একদিন গেল সব ভেসে—"

"ভেসে?"

"তাছাড়া আর কী বলব! গরীব দুঃখীর ঘরে যখন রোজগেরে মানুষটাই যায় মারা, তখন ভেসে যেতে কি-ই বা বাকি থাকে? যে দু'চারটে পোষা ভেড়া, মুরগী আর হাঁসের পাল ছিল, বাবার মৃত্যুর পর

অভাবের প্রথম ধাক্কায় গেল তারা। দ্বিতীয় ধাক্কায় কুটীরখানি, তৃতীয় ঢেউয়ে আমায় এনে ফেললে গ্লাসগোতে চাকরাণীর কাজে। কত বছর ধ'রে পরের বাড়িতে মুখটি গুঁজে থাকবার পর দেখা হ'ল মিঃ জসের সঙ্গে। ও লিভারপুলে ভালো একটা কাজ পেতেই সংসার পেতে বসলাম আমরা। কিন্তু এমনি পোড়া কপাল আমার, তিনটি বছরও কাটল না।" মিসেস জস কোলের 'এপ্রন'খানির এক কোণ উঠিয়ে চোখ দু'টি মুছে নিলে—"ছোট এক ছেলে আর কোলের কচি মেয়েটি নিয়ে পথে দাঁড়ালাম। ছেলেটি সেই শীতেই ম'রে মাকে রেহাই দিলে।" মিসেস জসের অশ্রু আর বাধা মানল না।

অনেকক্ষণ পরে রেণু ভারাক্রান্ত চিত্তে বললে, "তারপর?"

"কত কষ্টে যে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখলাম, সেসব দুঃখের কাহিনী আপনাদের শোনাবার মতো নয় মিস। আদ্ধেক বয়স কাটবার পরে ভাগ্য আমায় মুখ তুলে চাইল। এক বড়লোকের বাড়ি হাউস-কিপারের কাজ পেয়েছিলাম। তারাই পরে খুঁজে-পেতে এই স্টীমারের কাজটা জুটিয়ে দিলে। তখন থেকে ঠিক যেন রাণীর হালে আছি।"

"বলো কি, এত খাটুনি, তবু তোমার ভালো লাগে একাজ?"

"খাটুনিকে কি স্কচের মেয়ে ডরায়? ব'সে খেলে যে আমাদের বাতে ধরে! তাছাড়া কবেই বা ব'সে খেয়েছি বলুন? স্টীমারে আর এমন কী কাজ? বিধবা হ'য়ে প্রথম কয়েক বছর যে পরিশ্রমটা করতে হয়েছে, তা দেখলে আপনারা তো ভয় পেতেন।"

সুপ্রিয়া টুলটা কাছে টেনে এনে ভালো ক'রে ব'সে বললে, "বলো না আমাদের দু'একটা ঘটনা—তোমার অভিজ্ঞতা থেকে।"

"কিন্তু সেসব শুনতে কি আপনাদের ভালো লাগবে?"

সাগ্রহে সুপ্রিয়া বললে, "খুব লাগবে। আমাদের দেশে বলে,

তিনরকম উপায় আছে শিখবার—শুনে, দেখে আর ঠেকে। তোমার কাছে আমরা শুনে শিখব মিসেস জস।"

স্টুয়ার্ডেস হাসিমুখে রেণুর দিকে চেয়ে বললে, "আমি সবাইর কাছেই যাই কিনা, এই স্টীমারে সকলকে বলতে শুনি—আপনার বোনটি নাকি একেবারে কুণো? এতটুকু 'লাইফ' নেই ওর মধ্যে। কিন্তু ওঁর কৌতূহল দেখে তো সে কথা সত্যি ব'লে মনে হচ্ছে না?"

রেণু সস্নেহে সুপ্রিয়ার মুখখানা একবার দেখে নিয়ে উত্তর দিলে, "ওর মাথাটা রাজ্যির দুশ্চিন্তায় ভরা। রাত দিনই ওখানে 'প্রব্লেম'-এর পর 'প্রব্লেম সল্‌ভ্‌ড্‌' হচ্ছে, তবু সে ভিড়ের বিরাম নেই। নিত্য নতুন মূর্তিতে ঠেলাঠেলি লুটোপাটি ক'রে তারা মাথাটাকে ওর সারল।"

মিসেস জস দুঃখিত হয়ে বললে, "ও মা, এই কচি মেয়ের অত দুশ্চিন্তা কেন গো? ওর বয়সে আমি যে বেণী ঝুলিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি।"

"সে গল্পই বলো এখন, শুনো না ওঁর কথা।" চোখে শাসন ভ'রে সুপ্রিয়া রেণুর দিকে তাকাল।

স্টুয়ার্ডেস বললে, "তা রাগ কোরো না মিস, নেহাত মিথ্যেও বলেননি উনি। একটুও খেলাধূলো না করলে মাথা কি ঠিক থাকতে পারে? সেই যে কী বলে—**All work, no play makes Jack a dull boy**"—

রেণু হেসে উঠল।

স্টুয়ার্ডেস একটুখানি অপ্রতিভ হ'য়ে বললে, "পনের ষোল বছর বয়সে আমাদের মেয়েরা—"

বাধা পেয়ে সুপ্রিয়া বললে, "আমার বয়স কিন্তু পনের ষোল নয় মিসেস জস।"

"কত তবে?"

"শীগ্‌গিরই কুড়ি হবে।"

রেণু আবার হেসে উঠল। মিসেস জসের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, "কিছু মনে কোরো না, কেমন যে হাসবার রোগ আমার, সব তাতেই পায় হাসি। কিন্তু একটা কথা আছে জানো? আমাদের দেশের মেয়েরা কুড়ি হলেই বুড়ী!"

"তাই নাকি? এমন কথা তো কখনও শুনিনি! কুড়ি হ'লেই বুড়ী? তা কি হয় সত্যি? কিন্তু—কই, আপনাকে তো—"

"বুড়ী কি শুধু দেহেই হয়? মন বুড়ো হ'তে পারে না? ভেতরে রস-কস যা থাকে সব শুকিয়ে যাওয়া, হাসি গান গল্পকে ছেলেমানুষি তুচ্ছ জিনিষ ব'লে মনে হওয়া, রাতদিন ব'সে ব'সে কেবল নানারকম দুশ্চিন্তা করা—বুড়ো হওয়ার আসল লক্ষণ তো এগুলোই।"

"How interesting! আমার কিন্তু এত বয়স হ'ল, এখনও গান গল্প বেশ লাগে। আমার 'কেরোলাইন,' সেও তো এখন বাইশ বছরের সোমত্ত মেয়ে, কিন্তু এখনও খুকীর মতন দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে বেড়ায়, হেসে ছাড়া কথাই বলে না।"

"তোমাদের কথা আলাদা! মনু মহর্ষি তো তোমাদের আইনকার নন, বাল্যে পিতা, যৌবনে ভর্তা, বার্ধক্যে পুত্রই তোমাদের সর্বাশ্রয় নয়। শীগ্‌গির বুড়ো হবার ফুরসৎ কই তোমাদের? হ'লে চলবেই বা কেন? তাই হয়ত বুড়ো বয়সকে ঠেকিয়ে রাখতে পারো দিনকতক। আমরা পারব কেন? যে যা চায়, তাকে তা-ই পেয়ে বসে যে।"

মিসেস জস খানিকটা বুঝে, খানিকটা না বুঝে বললে, "কি জানি, নানা দেশের নানান ভাব। আমরা কিন্তু দেহটাকে যতদিন তাজা রাখতে পারি, ততই ভালো ব'লেই মনে করি। সে হিসাবে ছেলে যেমন, মেয়েও তেমনি। কোনো তফাত নেই। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়ে, আবার একত্র খেলা-ধূলোও করে। কেউ তাতে

কাউকে মন্দ মনে করে না। এই তো এ-স্টীমারে আপনাদের দেশের ছেলেরাও দেখি বেশ ফুর্তি ক'রে বেড়ায়। মেয়েরাই শুধু এত নারাজ কেন ওতে ?"

সুপ্রিয়ার গম্ভীর মুখের দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে রেণু উত্তর দিলে, "মেয়েরা যে তাদের মা-ঠাকুরমার নির্জীবতার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে চলেছে যুগ যুগ ধ'রে। কিন্তু তাই ব'লে তুমি ভুল বুঝো না মিসেস জস। দৌড়-ঝাঁপ হাসি ঠাট্টা পছন্দ না করলে কি হয়, আমাদের মেয়েদের মতো দার্শনিক, ভাবুক বা কবি আর কোথাও একটিও খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ। এসব বাজে কথা রেখে বলো দেখি এখন পার্লামেণ্ট—র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড—শ্রমজীবিসমস্যা, বেকারের অন্নসংস্থান, এমন কি পর্বতের ওপর যীশুর উপদেশ—যায় ধর্ম নিয়ে রোমান-ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্টের রেষারেষি খুনসুড়ির কথা! দেখবে এখন, খেলাধুলোর মতো বাজে জিনিষে মন যায় না কেন আমাদের ভাবুকিনীদের।" ব'লে দুষ্টুমির হাসি হাসলে।

স্টুয়ার্ডেস্ হাতের সেলাইটা বিছানার উপর রেখে দিয়ে বিস্মিতভাবে বললে, "আপনি এতক্ষণ ওঁকেই লক্ষ্য ক'রে বলছিলেন নাকি সব কথা ? ও মা, আমি তা একটুও বুঝতে পারিনি মিস। মাপ করবেন, আপনাকে চটাবার জন্যে বলছেন জানলে—"

"কী-ই বা করতে ? তোমায় না পেলে ও আর কাউকে ধ'রে শোনাত সেসব। কিন্তু এবার ঘরশত্রু বিভীষণের গল্পটাও বলতে বলো।"

রেণু হেসে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আজ সময় নেই আর। তুই-ই বরং আর একদিন এসে ব'লে ফেলিস সেটা। যাক শোধবোধ হ'য়ে।··· সাড়ে তিনটে এরই মধ্যে ? চায়ের সময় যে হ'য়ে এলো মিসেস জস।"

"তাহ'লে উঠি এবার, মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু।"

"আমি না এলেও সুপ্রিয়া আসবেই। একটু আধটু তাস খেলতে

হয় আমায়, দেখেছ তো ? কিন্তু ওর সেসব বালাই নেই। আয়রে সু, আর একদিন এসে বসিস মিসেস জসের কাছে, আর আমায় নামে যত খুসী বলিস—আপত্তি করব না। এখন একবার নির্মলের খোঁজ নিতে হচ্ছে। ছেলেটা কাল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, লাঞ্চে আসেনি, চায়েও আসবে কিনা আজ কে জানে। অসুখ বিসুখ করল না তো ?"

যেতে যেতে সুপ্রিয়া বললে, "অসুখ করবে কেন ? লাউঞ্জে ব'সে বেজায় পড়াশুনো করতে দেখেছি দুপুর-বেলা।"

"হঠাৎ ?"

"কারো সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে বোধ হয়। নইলে আড্ডা ছেড়ে চুপচাপ ব'সে পড়বেন উনি ?"

রেণু একটুখানি হেসে বললে, "তুই দেখছি ভারি প্রেজুডিস্‌ড্‌ হ'য়ে আছিস বেচারার ওপর।"

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না।

ওয়ার্ডরোবের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এলোমেলো চুলের রাশি বাঁ-হাত দিয়ে টেনে ধ'রে চিন্তিতস্বরে রেণু আবার বললে, "একেবারে অতটা এড়িয়ে চলিস না রে। অল্পবয়সে একটুতেই মনে বড্ড ঘা লাগে।"

"রাগ হয় রেণুদি।"

"জানি, রাগটা তোর একটু বেশি।"

"পোর্ট সৈয়দে সে লোকটার কথায় অত লজ্জা পাবার কী ছিল ? হেসে অগ্রাহ্য করলে আমার অমন খারাপ লাগত না। তা না, সেই যে ঘাড় গুঁজে ঠায় ব'সে রইলেন—যাক গে, ও সব আলোচনা ভালোই লাগে না আমার।"

রেণু নিরুত্তরে কী ভাবে।

খানিক অপেক্ষা ক'রে জানালার বাইরে তাকিয়ে সুপ্রিয়া আবার বললে, "স্বীকার করছি সেদিন আমার কথাগুলো একটু বেশি কড়া

হয়েছিল। কিন্তু কেন ওরকম রসিকতা করতে গেলেন হঠাৎ? নিজের সম্বন্ধে ওঁকে আমি যত কথা ব'লে ফেলেছি, তেমন আর কাউকেই নয়। বাইরের লোককে চট্ ক'রে এতটা বিশ্বাস করলাম কি ক'রে সেটাই আশ্চর্য।"

সুপ্রিয়ার অজ্ঞাতে রেণু ওর মুখখানা একবার দেখে নিলে—ঈষৎ ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ দৃষ্টি ওর দূর দিগন্তে নিবদ্ধ। দেখে আর একবার নতুন ক'রে রেণুর মন চিন্তায় পীড়িত হ'য়ে ওঠে।

"কী? কিছুই যে বলছ না রেণুদি?"

"কী বলব! নির্মল আসলে খারাপ ছেলে নয়—"

অসহিষ্ণুভাবে সুপ্রিয়া বললে, "তাই কি বলছি আমি? ভালো লোক বলেই তো রাগ হয় বেশি! এত ভাবেন, এত বোঝেন, তবু কেন বাজে কাজগুলো না ক'রে থাকতে পারেন না? এক্ষুণি যে গভীর ভাবের গভীর কথা ব'লে মানুষকে ভাবনার খোরাক জুটিয়ে দেয়, সে-ই দেখি পরমুহূর্তে একটি স্বল্পপরিচিতা মেয়ের গালের রঙ, চুলের ফিতে নিয়ে—"

"অত ঘুরিয়ে বলবার দরকার কী বাপু? সোজা ক'রে বললেই পারিস্ যে ফ্লার্ট করে!"

সুপ্রিয়া চুপ ক'রে থাকে।

"ঐ—চায়ের ঘণ্টা পড়ল। চল্, আর দেরী করে না।"

যেতে যেতে রেণু বললে, "মানুষ সুন্দরে-অসুন্দরে, ভালয়-মন্দে মিশানো—কে না জানে বল্? তার জন্যে রাগ ক'রে লাভ কী?"

রেণুর গলার স্বরে কী যে প্রকাশ পায়, সুপ্রিয়ার উত্তপ্ত মন নিমেষে নরম হ'য়ে আসে। কোমলকণ্ঠে বললে, "মাপ কোরো দিদি, উদ্ধত স্বভাব আমার, এই শুনি এই ভুলি। কিন্তু—" একটু ইতস্তত ক'রে বললে, "ভারি ইচ্ছা হয় জানতে—মানুষের স্বভাবে ঐক্যের এত অভাব কেন? অমন চিন্তাশীল উঁচু মন যার, সে কি ক'রে মিনিট দুই পরে—"

"চুপ, ও আসছে।—এই যে নির্মল, তুমি কি আমাদের খুঁজতে আসছিলে? ভালোই হল, চলো এক সঙ্গে যাওয়া যাক।"…

চা ঢেলে দিয়ে রেণু জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর? আজ সারাদিন কী করলে বলো।"

"আমাকে বলছেন?…বিশেষ কিছুই নয়। এই—মানে—খানিকক্ষণ প'ড়ে একটু শুয়েছিলাম।"

"কী বই পড়ছিলে? গল্পের?"

"না।" সুপ্রিয়ার দিকে না তাকিয়েই তাকে উদ্দেশ ক'রে বললে, "সেই যে-ক'খানা বই দেব বলেছিলাম তোমায়, তারই মধ্যে একটা। রোমঁ্যা রোলঁার Life of Sri Ramkrishana."

"কী রকম বই পড়তে তোমার সব চেয়ে ভালো লাগে নির্মল?"

"কী রকম বই? তার কি ঠিক আছে? কখনো জীবনী, কখনো ভ্রমণকাহিনী, কখনো বা উপন্যাস—আবার এক একসময় দারুণ গম্ভীর কিছু। মনের অবস্থা কখন কি রকম থাকে তারই উপর নির্ভর করে আমার পাঠের রুচি।"

সুপ্রিয়া অলক্ষ্যে নির্মলকে একবার দেখে নিলে। রেণুর সেটা চোখ এড়ালো না। নিঃশব্দে হেসে একটুখানি মাথা নেড়ে কোমলকণ্ঠে বললে, "তা ঠিক। মনের অবস্থাও মানুষের সব সময় একরকম থাকে না। কেন থাকে না, বলা মুস্কিল! এই একটু আগে সুপ্রিয়া বলছিল ওর ভারি জানতে ইচ্ছা করে মানুষের মধ্যে এত দ্বন্দ্ব—এত বিরোধ—এত অনৈক্য কেন?"

নির্মল গভীর মনোযোগে শুনছে দেখে সুপ্রিয়া ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করে।

রেণু আবার বললে, "দ্বন্দ্ব—অনৈক্য শুধুই একের সঙ্গে অপরের নয়, মানুষের নিজেরই ভিতর পরস্পর-বিরোধী বহু ভাব পাশাপাশি থাকে।

কি ক'রে এটা সম্ভব হয়? বলো না নির্মল, তুমি তো অনেক পড়াশুনো করেছ!"

নির্মল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে বললে, "কোথায় অনেক পড়াশুনো করেছি? একটা ডিগ্রিও তো নেই!"

"হয়েছে! ডিগ্রিই বুঝি পড়াশুনোর কষ্টিপাথর? ইউনিভার্সিটির এক একজন ধুরন্ধর ছাত্রকে যত খুসী জেরা ক'রে দেখ। দেখবে পাশের পড়ার বাইরে সংসারের আর কিছু জানে কিনা।"

"কিন্তু অনেক বই পড়লেই কি লোকে খুব জ্ঞানী হ'তে পারে দিদি?"

"পারে না?"

নির্মল নিরুত্তরে হাসে।

"বলো না তবে জ্ঞান কিসে হয়?"

নির্মল ম্লান হেসে বললে, "ভালো লোককে জিজ্ঞেসা করেছেন! আমি বলব জ্ঞান কিসে হয়?"

"কেন ভাই, তুমি নিজেকে এত ছোট ভাবো কেন? তোমার স্বভাবে যত গুণ আছে তাও বা সংসারের ক'জনার মধ্যে দেখা যায়? যা আছে তার জন্যে কৃতজ্ঞ থেকে, যা নেই তারই জন্যে চেষ্টায় থাকো। সব সময় নিজেকে ধিক্কার দিয়ে কিংবা অশ্রদ্ধা ক'রে বিশেষ কোনো লাভ হয় কি?"

নির্মল কি একটা বলবার জন্যে মুখ তুলতে সুপ্রিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি মিলিত হয়, তখনই চোখ নত করে। সুপ্রিয়া অপরাধীর মতো জড়সড় হ'য়ে বসে থাকে। এসব আলোচনার মাঝে ওর স্থান কোথায়?

রেণু বললে, "আমার মনে হয় নির্মল, তুমি বড় বেশি ভাবপ্রবণ। আর, কোনো জিনিষের জন্যে একটুও চেষ্টা ক'রে একবার অকৃতকার্য হ'লে অমনি নিজের উপর আস্থা হারাও।"

"দুর্বলতা—"

"হাঁ, দুর্বলতা তো বটেই। জেদ না থাকলে কি হয়? চাই একটা ঘোরতর জেদ—ভালোর দিকে যাবার জন্যে। That obstinacy which is something divine—মই বেয়ে উপরে উঠতে হ'লে—"

হঠাৎ বাধা দিয়ে সুপ্রিয়া বললে, "Divine! রেণুদি!"

"চুপ কর্! ভগবান মানি না ব'লে ও আমাকে ভগবানের নামও নিতে দেয় না। ওরে, ভুলে যাস কেন যে গরজ বড় বালাই!"

"বটে!"

"বটেই তো। কিন্তু নির্মল, এই যখন-তখন-উপদেষ্টা দিদিটিকে নিয়ে এরই মধ্যে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠনি তো?"

"এবার কিন্তু রাগ করব তা ব'লে রাখছি।"

সুপ্রিয়া রেণুকে একটু ঠেলে দিয়ে বললে, "বয় কি বলছে দেখ।"

"কী—ওঃ তাই তো। অনেকক্ষণ বসে আছি যে। ওরা কাজ করতে পারছে না। চলো ওঠা যাক। কেবিন থেকে আমি গরম কাপড়খানা নিয়ে আসি, তোমরা যাও ওপরে।"

ডাইনিংরুমের বাইরে এসে সুপ্রিয়া ডাকলে, "নির্মলদা!"

নির্মল ফিরে দাঁড়াল।

"সেদিনের ব্যবহারের জন্যে আমি দুঃখিত।—ক্ষমা চাই।"

কম্পিতকণ্ঠে নির্মল বললে, "সে কি, তুমি ক্ষমা চাও কিসের জন্যে? দোষ করলাম আমি—"

"এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, চাকর-বাকর যাওয়া-আসা করছে, চলুন ওপরে। ক্ষমা চাই কেন? দোষ কি একটুও হয়নি আমার?"

"না না, ঠিকই তো করেছ তুমি।" একহাতে রেলিংখানা

চেপে ধ'রে বললে, "সত্যি কথা কঠোর ক'রে না বললে অপদার্থদের চেতনা হয় কখনো ?"

সুপ্রিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে বললে, "এটাও রাগের কথা হ'ল নাকি ?"

ভিতরের আবেগে নির্মলের মুখ রক্তিম হ'য়ে ওঠে। সুপ্রিয়া সেটা ভুল বুঝলে। আরও একটু কাছে সরে এসে রেলিংএ নির্মলের হাতের পাশে মুহূর্তের জন্যে নিজের হাতখানি রেখে বললে, "এজন্যেই কি বড় ভাই সেজেছিলেন ? একটুতেই—"

চম্‌কে বেদনাহত দু'টি চোখের দৃষ্টি পলকের জন্যে সুপ্রিয়ার মুখের উপর নিবদ্ধ ক'রে দ্রুতপদে নির্মল সেখান থেকে চ'লে গেল।

সুপ্রিয়া অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দিন দুই পরে রেণু জিজ্ঞাসা করলে, "কি রে, তোদের দু'জনের হ'ল কী ?"

"দু'জনের তো নয়, হয়েছে দেখতে পাই একজনেরই।"

"তাহোক, কিন্তু—কী ?"

হাতের বইখানা মুড়ে রেখে চোখ বুজে উদাসীনভাবে সুপ্রিয়া উত্তর করলে, "কি জানি।"

"আহা অমন ক'রে বলিস কেন ? তোর স্বভাবে কিন্তু ভারি একটা কাঠিন্য আছে বাপু!"

"তাই নাকি ? কিন্তু কী করতে বলো আমায় ?"

"ভালো ক'রে কথা-টথা বল্ ওর সঙ্গে।"

"কথা ? বলব কার সঙ্গে ? যখনই যাই, দেখি ঘাড় গুঁজে ছবি আঁকছে, [illegible]ছে, নয়ত লিখছে, তাও নয়ত—"

রেণু হেসে ফেললে, "হয়েছে, আর কৈফিয়ত দিতে হবে না।" তারপর একটু ভেবে একটু গম্ভীর হ'য়ে বললে, "কি জানিস সু, আমার মনে হয় তোর সেদিনের কথাগুলো বড্ড লেগেছে ওর মনে। ছেলেমানুষ, অল্পেতেই—যাক সে কথা, এখন একবার ডেকে নিয়ে আয় না।"

সুপ্রিয়া চোখ তুলে বললে, "বলো কী! এমনই কি বানের জলে ভেসে এলাম আমি! মান অপমান জ্ঞানও নেই ?"

"দেমাক দেখ মেয়ের।"

সুপ্রিয়া উত্তরে আর কিছু বললে না।

রেণুর মনে কিন্তু চিন্তা ঘনিয়ে ওঠে।—নির্মলের এ কেমন ব্যবহার? এ তো ছেলেমানুষি মান অভিমান নয়! রাগ ক'রে আছে ব'লেও তো মনে হয় না। অথচ দলবলের সঙ্গে মেলামেশা একরকম ছেড়েই দিয়েছে, সারা সকাল ও দুপুরে বসে বসে একটা না একটা কাজ করে। স্টীমারে এতটা অধ্যবসায় তো কারোই দেখা যায় না, বরং সবাই যথাসাধ্য আমোদ আহ্লাদ নিয়েই থাকে। এক সুপ্রিয়া যা একটু পড়াশুনো করে, কিন্তু সেটা ওর স্বভাব।

নির্মলের হঠাৎ এমন পরিবর্তন কবে থেকে? ঠিক: সেই পোর্ট সৈয়দ থেকে জাহাজ ছাড়বার পরেই ও যেন কেমন হ'য়ে গেছে। সত্যি কি তবে মিস রায়ানের সঙ্গে মনোমালিন্যই এর কারণ? সুপ্রিয়া তো তা-ই বলে। তা যদি হয়, নির্মল সেটাকে ভালোভাবে নিয়েছে বলতে হ'বে। ওর মধ্যে ভালো হবার—ভালো করবার একটা স্বাভাবিক স্পৃহা আছে। যৌবনসুলভ চাপল্যের জন্যে মাথা তুলিতে পারে না সেটা। কিন্তু কোথাও একটু নাড়া পেলে, কারো কাছে অল্পস্বল্প উৎসাহ পেলেই ওর আপন ভাব উঠবে জেগে; একবার জাগলে আর নিভবে না। নিভবে না?—অজ্ঞাতে রেণুর নিশ্বাস পড়ে।—ওরই মতো আর একজন, ওকে দেখলে কত মনে পড়ে তার কথা—যখন উঠেছিল খুবই উঠেছিল। লকলকে আগুনের শিখার মতো প্রাণের উদ্দীপনা তার। মনে হয়েছিল ও-প্রাণের কাছে সংসারের সকল মিথ্যা, সকল অপবিত্রতা পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবে, কেউ পারবে না ঠেকাতে। কে জানত যে ওর নিজেরই মন বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে? একটা তুচ্ছ অভিমানে অন্ধ হ'য়ে দু'দণ্ডে দিলে নিজেকে শেষ ক'রে! রেণু না হয় অসময়ে কেউ নয়, কিন্তু ওর ভগবান—

আবাল্যের ঠাকুর—তিনিও কি ছিলেন না? এত বড় কাণ্ডটা ঘটতে দিতে পারলেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব জেনেশুনেও রইলেন তিনি নির্বিকার হ'য়ে? তবু বলে লোকে—ভগবান আছে!

আত্মহত্যা নাকি মহাপাপ। সে পাপ থেকেও কি কেউ উদ্ধার করেছে ওকে? না সেখানেও ভগবান তেমনি নীরব, তেমনি নির্বিকার? বাজে, বাজে! সব ছেলে-ভুলোনো মনগড়া কথা, মানুষের মিথ্যা কল্পনা, ভগবান বলতে কেউ কোথাও নেই। থাকলে কি—

রেণু সজোরে চোখ বন্ধ করে।—নাঃ, কোথাও কেউই নেই। সত্য যদি কিছু থাকে তবে সে প্রত্যেকের নিজ নিজ সুকৃতি। জ্যাঠামশায় যা বলেন। কর্মফলই একমাত্র শক্তি যা মানুষকে মৃত্যুর পরেও আশ্রয় দিতে পারে। বিমলের একটা প্রচণ্ড ভুল কর্মের বিপক্ষে রক্ষক হ'য়ে জমা আছে ওর যত পুণ্যকর্মের সমষ্টি, ওর উদার মনের উন্নত চিন্তা! রেণু কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে তেমন লোকের জন্যে অনন্ত নরকই ব্যবস্থা। না না, ভগবান-বিশ্বাসীরা যা বলে বলুক, রেণু মানবে না। কেন মানবে? যে ভগবান ভক্তকে রক্ষা করতে পারে না, সাংঘাতিক প্রমাদের সময় নিষেধ করবার কোনো উপায়ই পায় না খুঁজে, কোনো ব্যবস্থাই জানে না করতে, সে থাকলেই বা কি—না থাকলেই বা কি? তার উপর, যার অনুচরেরা মানুষের সহস্র সদ্‌গুণ উপেক্ষা ক'রে, একটি মাত্র ভুলের জন্যে ব্যবস্থা করতে পারে অনন্ত নরক, কী হবে তাদের দল বাড়িয়ে? বিমল কেন যে এত 'ভগবান—ভগবান' করত কে জানে! কখনো যাকে চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি যার কথা—তবে হ্যাঁ, বিমলের ধারণা ছিল বটে যে ভগবানকে সে দেখেছে। আশ্চর্য ওর এক একটা অনুভূতি! আর কেউ যদি বলত সে সব কথা, রেণু হেসে উড়িয়ে দিত। এই সুপ্রিয়াও আর এক পাগল। প্রায়ই বলে, "কোনো সত্যিকার সাধু

সন্ন্যাসীর দেখা যদি পেতাম, জিজ্ঞাসা করতাম একবার কী নিয়ে থাকেন তাঁরা, কার জন্যে এত ভজন-সাধন, কোথায় গেলে কী করলে দেখা পাওয়া যাবে তাঁদের সেই পরম বন্ধুর!"

শুনে রেণু হাসে। ঠাট্টা করলে কিন্তু সুপ্রিয়া জবাব দেয়, "এত্-গুলো লোক তাহ'লে ঘর সংসার স্ত্রীপুত্র ছেড়ে মিছেই বিবাগী হ'য়ে বেরিয়ে যায়? পেছনে এর কোনো সত্যই নেই? সর্বত্যাগী হওয়া এতই সহজ? তুমিই তো বল—কাম-কাঞ্চন মানুষের সবচেয়ে শক্ত শেকল, সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু! নামের জন্যে, লালসার জন্যে, অর্থের জন্যে মানুষ করতে পারে না এমন কাজ নাকি নেই। যারা সেই শেকল কেটে বেরিয়ে পড়তে পেরেছে—"

রেণুর উচ্চহাস্যে বাকি কথাটা ডুবে যায়। বলে, "কোথায় বেরিয়ে পড়েছে রে? দেখ্ না গিয়ে সন্ন্যাসীদের একবার—"

"আহা, অতদূরে দেখতে যাবার দরকার কী? এই সেদিন দক্ষিণেশ্বরে কার আবির্ভাব হয়েছিল? পারো তাঁকে হেসে উড়িয়ে দিতে? আর তাঁরই শিষ্য বিবেকানন্দ? এতই সোজা নাকি এসব প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে অমনি দু'কথায় উড়িয়ে দেওয়া? যাদের ত্যাগ, যাদের চেষ্টা বিফল হয়েছে সেই দুর্ভাগার দলকে যত খুসী ঠাট্টা করতে পারো বটে। বড় কাজে অকৃতকার্য হ'লে সবাই অমনি করে।"

কী কান-পাতলা এই সুপ্রিয়া আর ওর মতো লোকেরা! যা শোনে তা-ই বিশ্বাস করে। সংসারকে এখনও চেনেনি কিনা! ভুগ্‌ত যদি রেণুর মতন!—ওর দেখাদেখি নির্মলও আজকাল বড় বড় কথা বলা সুরু করেছে। দু'জনে সারাদিন ওই সব বই-ই পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী, সাধুসন্তদের ইতিহাস, বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যদের কথিত নানান অলৌকিক ব্যাপার—আরো কত কী! নির্মলের একটা বাক্স নাকি ঠাসা এরকম বইতে। রেণু জানে

নির্মল বিমলের ভাই, পেয়েছে তারি ধাত। তাই তো রেণুর এত ভয় ওর জন্যে। যারা 'ভগবান ভগবান' করে তাদের কোনো কাজেই ওর আস্থা নেই আর। এমনিতেই নির্মলের কর্মপ্রবৃত্তি কম, আবেগে ওঠে, আবেগের অভাবে পড়ে! এই আবেগের ইন্ধন অহোরাত্র জোগাতে যদি পারে কেউ, তবেই নির্মলের মধ্যে জ্বলবে আলো। ইন্ধন সরিয়ে নাও—অন্ধকার।

ওযে আর্টিস্ট, ওর ব্যাপারটা তবু বোঝা যায়, কিন্তু সুপ্রিয়া কী ব'লে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্মের বইয়ের মধ্যেই ডুবে রইল? অনুপমের শিষ্যা না সে—কর্মই যার প্রধান উদ্দেশ্য? দশের জন্যে কাজ করবে, দেশের জন্যে প্রাণ দেবে এই যার আবাল্য শিক্ষা, যৌবনের আদর্শ, এই সেদিন পর্যন্ত যার প্রেমের স্বপ্নও ছিল আদর্শেরই নামান্তর মাত্র, সে কি না রস পাচ্ছে আজ যত রাজ্যের কর্মবিমুখ সংসারবিদ্বেষী সন্ন্যাসী-দলের ইতিবৃত্ত উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে?

আসল কথা—ধর্ম ব্যাপারটারই মধ্যে আছে এক মাদকতা, নেশার মতো যা মনকে রাখে ঝিমিয়ে। তারপর সে সব 'নেশাখোর' লোককে দিয়ে আর কোনো মহৎ কাজ বা বৃহৎ প্রয়াস হবার আশা নেই। সকল চিত্তবেগ ওরা ঢেলে দেয় নেশা করারই পিছনে। একে সুপ্রিয়ার কুণো স্বভাব, তার উপর জপ-তপ ধ্যান-ধারণার কথা এমনভাবে মাথায় ঢুকলে জ্যাঠামশায় আর অনুপমের সব আশা রসাতলে যাবে যে!

এরা জানেও না যে কর্মেই আছে শান্তি, কর্মেই পাওয়া যায় সত্যিকার আনন্দ। পরকালও যদি থাকে তখনও শুধু এই কর্মফলই যাবে সাথে। আর কিছু তো হবে না সঙ্গী! তাই না রেণু কাজের মধ্যে এমন ডুবে থাকতে ভালোবাসে!

আজ ওদের ডেকে যেমন ক'রে হোক বুঝিয়ে দিতে হবে যে বইয়ের

সাহায্যে সাধু-সন্ন্যাসীর পিছু-ধাওয়া ক'রে কোনো লাভই হবে না। তার চাইতে পড়ুক না মস্ত মস্ত বীরের কাহিনী, দেশবিদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদি-উদ্যমীদের ইতিহাস, বড় বড় আবিষ্কর্তা, বড় বড় সেনাপতি, জাতিগঠক, কর্মবীর মহাত্মাদের জীবনী। না—চুপ ক'রে থাকলে আর চলে না: সুপ্রিয়ার দিকে ফিরে বললে, "নির্মলকে ডেকে নিয়ে আয়, লক্ষ্মী মেয়ে!"

ঈষৎ আলস্যের সুরে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "কেন? আমার এখন উঠতে ইচ্ছে নেই।"

"কুঁড়েমি করিস নে, যা। দেখে আয় কি করছে।"

সুপ্রিয়ার পরিত্যক্ত বইখানা উঠিয়ে নিয়ে পিছন থেকে ডেকে বললে "শীগগির আসিস কিন্তু।"

টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে নির্মল কী যেন লিখছে। সুপ্রিয়া পিছন থেকে সাড়া দিয়ে ঢুকল, "কি করছেন?"

নির্মল ভয়ানক চমকে ব্লটিং পেপারটা তাড়াতাড়ি খাতার উপর চাপা দিলে। তারপর সুপ্রিয়ার অপ্রতিভ মুখের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে চুপ ক'রে রইল।

"এসে বিরক্ত করলাম না তো?"

"না।"

"অসুবিধে?"

"তাও না।"

এর পরে কী যে বলবে সুপ্রিয়া ভেবে পেলে না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললে, "দিদি বড় ভাবছেন আপনার জন্যে।"

নির্মল উত্তর দিল না।

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে স্থপ্রিয়া বললে, "এখন যাবেন একবার ?"

"কেন ?"

"এমনি।"

"আচ্ছা, যাচ্ছি—একটু পরে।"

"একটু পরে নয়, এক্ষুনি যেতে হবে যে।"

নির্মল ওর মুখের দিকে চেয়ে কী যেন বোঝবার চেষ্টা করলে। স্থপ্রিয়া অকারণে লজ্জিত হ'য়ে বললে, "দিদিই ডাকতে পাঠিয়েছেন।"

"ওঃ।"

"বোধ হয় বিশেষ কোনো দরকার আছে।"

"কয়েক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।"

"তাহ'লে আমি যাই।" উঠে ক্ষণেক ইতস্তত ক'রে, একবার নির্মলের নত ম্লান মুখখানির দিকে তাকিয়ে লজ্জা দমন ক'রে মৃদুকণ্ঠে স্থপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি এখনো আমার উপর রাগ ক'রে আছেন ? ভালো ক'রে কথাই বলছেন না। যদি দোষ ক'রে থাকি—"

"কোনো দোষ করোনি। আমারই মন ভালো নেই।"

"মন ভালো নেই ? কেন ?" মমতাময়ী বোনের মতো কাছে স'রে এসে কোমল স্বরে স্থপ্রিয়া বললে, "বলবেন না কী হয়েছে ? নির্মলদা, ঝগড়াঝাঁটি তো ভাইবোনেও করে, তা ব'লে এতদিন মনে রেখে দেয় না।"

"দোহাই স্থপ্রিয়া, তোমাদের এতটা করুণার উপযুক্ত নই আমি।"

স্থপ্রিয়া ক্ষুব্ধ হ'য়ে বললে, "তবে আর কী বলব ? স্নেহকে যদি করুণা নাম দেন—"

পীড়িতকণ্ঠে নির্মল বললে, "আমায় মাপ করো স্থপ্রিয়া, কিন্তু—এ আলোচনা থাক। চলো দেখে আসি দিদি কেন ডেকেছেন।"

যেতে যেতে সুপ্রিয়াকে নিস্তব্ধ দেখে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বললে, "ভুল বুঝো না আমায়। তোমার ওপর সত্যিই কোনো রাগ নেই।"

"কিন্তু সেদিনের ব্যাপারটা ভোলেননি, কেমন—তাই না? রাগ না থাকুক, দুঃখ আছে নির্মলদা।"

"দুঃখ?—নেই বলতে পারি না, কিন্তু সে তো তোমার ব্যবহারের জন্যে নয়!"

"তবে কিসের জন্যে?"

উত্তরে নির্মল ফিরে দাঁড়িয়ে গভীর কণ্ঠে বললে, "যা বলব বিশ্বাস করতে পারবে কি?—রাগ নেই, অভিমানও নেই আর; আছে কেবল এক প্রার্থনা—যেন নিজের বা অপরের মধ্যে সুন্দরের আর না অপমান করি। এবার থেকে আমার জীবন যেন—যেন"—বলে হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি বললে, "তোমরা হয়ত এসব তেমন মানো না, হয়ত মনে মনে হাসছ, কিন্তু আমি মানি, আমি দেখেছি একদিনে এক মুহূর্তে কী ক'রে তিনি একটা গোটা মানুষকে ভেঙে-চুরে তার জীবনের গতি বদ্‌লে দেন। কিন্তু মুখের কথায় তো এর প্রমাণ দিতে পারব না, তাই সে চেষ্টা থাক। তুমি যদি সত্যিই আমায়—আমার জন্যে একটুও—" সুপ্রিয়ার প্রশান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে অন্তরের আবেগ যথাসাধ্য সংযত ক'রে মৃদু ধীরকণ্ঠে বললে, "সত্যি যদি আমার মঙ্গল চাও, তবে প্রার্থনা কোরো যেন এ বিশ্বাস আর না হারাই যে ভগবান আছেন।"

অশ্রুবাষ্পে সুপ্রিয়ার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে এলো। ভেবে পেলে না কী বলবে, মনের মাঝে কেনই বা এ ব্যথা! অনেকক্ষণ পরে যখন আস্তে আস্তে মুখ তুলল, নির্মল তখন সেখানে নেই।

একা আসতে দেখে রেণু জিজ্ঞাসা করলে, "সু কোথায়? এলো না যে?"

নির্মল সেকথার কোনো জবাব না দিয়ে বললে, "আমায় ডেকেছেন?"

"হাঁ। দুপুরে কোথায় যে লুকিয়ে থাকো, মোটে দেখা পাবার যো নেই। মার্সেলস তো এসে পড়ল। এর পরে কী করবে ঠিক করেছ নির্মল?"

"আপনাদের আপত্তি না থাকে তো একসঙ্গেই লণ্ডনে যাবো। নইলে দিনকতক কন্টিনেন্টের নানা জায়গায় ঘুরব।"

"উঁহু—দ্বিতীয়টিতেই আপত্তি।" হাতের বইটা নীচে রেখে দিয়ে মাথা নেড়ে রেণু বললে, "ওসব মতলব ছাড়ো, আমাদের সঙ্গেই যাবে তুমি। যাযাবরবৃত্তি পরে হবে, তার ঢের সময় প'ড়ে আছে।"

নির্মলের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল দেখে খুসী হ'য়ে বললে, "লণ্ডনে গিয়ে কিন্তু আমাদের কাছাকাছি থাকতে হবে।"

"কোথায় থাকবেন ঠিক করেছেন?"

"বেশ ছেলে, এরোপ্লেনে গিয়ে রাতারাতি সব ঠিক ক'রে এলুম নাকি? তাহ'লেও কিন্তু তুমি জানতে পারতে।"

নির্মল হেসে বললে, "ওখানে আপনাদের পরিচিত কেউ নেই? সে কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"জিজ্ঞাসার ধরণ তোমার খুব প্রাঞ্জল তো !···হাঁ, আছেন একজন। জ্যাঠামশায়ের এক পুরোনো বন্ধুর স্ত্রী, বিধবা বুড়োমানুষ ছেলে মেয়ে নেই। তাই পরের বোঝা ঘাড়ে নেবার অবসর যথেষ্ট। মাঝে মাঝে সুপ্রিয়াকে তাঁর জিম্মায় রেখে—"

নির্মল হেসে ফেললে।

রেণুও হাসলে, "তুমি আর আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে হ্যাপ্‌স্যাক-ঘাড়ে বেরিয়ে পড়ব একেবারে রীতিমত মুসাফির কায়দায়। ইউরোপে আমার কত দেখবার, কত জানবার আর বোঝবার আছে বলতে পারিনে ভাই। হাজার হ'লেও মেয়েমানুষ—"

"না দিদি, এতটাই যদি করতে পারেন তাহ'লে এটুকু দুর্বলতাও, নিজের উপর একটুমাত্র অবিশ্বাসের ভাবও আর জমিয়ে রাখবেন না মনের মধ্যে।"

"ঠিক বলেছ, মেয়েমানুষ-মেয়েমানুষ ক'রে নিজেই নিজেকে খাটো করি—অক্ষম দুর্বল ভেবে। এতদিনের সংস্কার থেকে মনকে মুক্ত করা কত শক্ত! নির্মল, তোমায় কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।"

ঈষৎ আগ্রহে নির্মল জিজ্ঞাসা করলে, "কী ?"

"তোমাকে মনে রাখতে হবে আমি তোমার পাতানো দিদি মাত্র নই।"

"এ আর বেশি কথা কী ?"

রেণু উঠে সোজা হ'য়ে বসে বললে, "কমও নয়। ছোট ভাই হ'তে হ'লে অনেক হাঙ্গাম পোহাতে, অনেক উপদ্রব সইতে হয়।"

"দিদিরা উপদ্রব করে ছোটভাইয়ের উপর, এমন তো কখনো শুনিনি! বরং ভাইদের অত্যাচারের কাহিনীতেই তো—"

"সে অত্যাচার দিদিদের গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। এক যুগ দুই

যুগের কথা তো নয়, সেই আদিম কাল থেকে—কি বলো ভাই? কিন্তু এখন চাকাটা একটু ঘুরিয়ে দিলে হয় না?"

"বেশ তো দিদি। ভাইদেরও চড়-চাপড়টা গা-পেতে নেবার শক্তি নেই এমন কথা কে বললে আপনাকে?"

"সত্যি?"

বাধা দিয়ে নির্মল বললে, "পরীক্ষা করেই দেখুন না একবার।"

কল্যাণী দৃষ্টিখানি নির্মলের কৌতুহলী মুখের উপর প্রদীপের মতো তুলে ধ'রে রেণু জিজ্ঞাসা করলে, "দিদির কাছে মনের কথা অসঙ্কোচে বলতে পারবে তো? এ কয়দিন কী হয়েছিল তোমার?"

নির্মলের মুখখানি মুহূর্তে আরক্ত হ'য়ে উঠল। চোখ নামিয়ে অপ্রতিভ স্বরে বললে, "কই তেমন কিছু—আমি তো—"

শান্ত হেসে রেণু বাধা দিলে, "ফেল করলে ভাই। কিন্তু থাক, দিদিরা অত নির্দয় নয়। মন খারাপ ক'রে ছিলে ব'লেই জানতে চেয়েছিলাম। এখন যদি ভালো হ'য়ে গিয়ে থাকে, আর দরকার নেই।"

নির্মল চুপ ক'রে রইল।

রেণু আবার বললে, "ভবিষ্যতের জন্যেই বলছি। কখনও যদি এমন কোনো দুঃখের বিষয় ঘটে যা অন্যের কাছে বলা চলে, তবে এতটুকু সঙ্কোচ কোরো না। গায়ের জোরে তোমার উপর এ দাবি করছি ভেবো না নির্মল।"

"ও কি দিদি, বোনের অধিকার যে অবিসম্বাদী একথা আমি কবে অস্বীকার করেছি বলুন?"

কখন সুপ্রিয়া নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল দু'জনের কেউই দেখতে পায়নি।

সমুদ্রের প্রশান্ত নীল বুকের দিকে তাকিয়ে একটু থেমে দু'একবার ইতস্তত ক'রে নির্মল বললে, "আমার মনে কোথা থেকে এক একসময়

তীব্র আকাঙ্ক্ষা আসে, ওই সমুদ্রের মতো অসীম, আকাশের মতো উদার আর বিরাট হ'তে। অথচ, তবু ঠিক বোঝাতে পারলাম কই? ইচ্ছাটাই বুঝি, কিন্তু কিসের জন্যে—তা ঠিক প্রকাশ করতে পারি কই? সুন্দর ফুল দেখি, মনে হয় এরই মতো হব। সন্ধ্যার তারা জ্বলে আকাশে, অনুভব করি—ওর সঙ্গে রয়েছে আমার অন্তরের নিভৃত যোগ। মন কেমন করে। কী যে এক বেদনা, কিসের যে গোপন ব্যথা, কোথায় কে যেন আছে আমার বড় আপন অথচ তাকেই গেছি ভুলে। চেষ্টা করলে স্মরণ করতে পারি না, অথচ প্রতি প্রেরণায়, প্রত্যেকটি ছবি আঁকার ভিতর দিয়ে, প্রতি গভীর কথায়—প্রতি গভীর ভাবে, সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে, চাঁদিনী রাতে, গোধূলির আকাশে তারার টিপে, কৃষ্ণপক্ষের স্তব্ধ রাতে আকাশ-ভরা তারার আলোয়—আমার এ বেদনা নিত্য নতুন হ'য়ে বুকে বাজে। কিন্তু কেন, কার জন্যে?"

রেণু স্তব্ধ হ'য়ে শোনে। পিছনে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়া ততোধিক স্তব্ধ, বিস্মিত।

সে নীরবতার জাল ছিন্ন ক'রে আপনমনে নিম্নস্বরে নির্মল আবার বলে, "এতদিন বুঝিনি কেন বা কার জন্যে। এখনও ঠিক বুঝেছি বলতে পারিনা। তবু, আজ আমার মন বলে—দুঃখভরা এই মানব-জীবনেও এমন এক জিনিষ আছে যার জোরে, যাঁকে সহায় ক'রে জানতে পারব সেই অজানাকে যাঁর ভাষা নীরবতার মধ্যে, যাঁর আলোর স্পন্দন তারায় তারায়, যাঁর প্রকাশ মানুষের ত্যাগে, মহত্ত্বে, উদারতায়। কিন্তু আমি সারাদিন সারারাত কথার মালা বুনে বুনে গেলেও তাঁর কথা আপনাকে বুঝিয়ে উঠতে পারব না, যাঁর পরশে আর রসে আমার অন্তর নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে, বা পাবে মনে হয়েছে। তাঁর কোন্ দানের ভিতর দিয়ে, কোন্ শক্তির বলে

হঠাৎ এই ছন্নছাড়া জীবনের পরম লক্ষ্য পেলাম খুঁজে, স্বভাবের হাত থেকে মুক্তির বাণী শুনলাম, সে কথাটিই শুধু গোপন রাখব দিদি।"

রেণু স্নিগ্ধ হেসে বললে, "তাহ'লে তো তোমার আনন্দ করবার কথা ভাই—কেন বিমর্ষ হ'য়ে ছিলে ?"

"নিজের মধ্যে আনন্দেরই আভাস পেয়েছি—সত্যি", নির্মল ম্লান হেসে বললে, "কিন্তু এই কি আমার স্বভাবের সবটা দিক ? তার কি আরো বহু দিক, বহু জটিলতা নেই ? তারা-ভরা আকাশের নীচের শান্ত নির্মল, আর—আর এই স্টীমারেও দু'দিন আগের উদ্দাম, অসংযত নির্মল!—আপনি তো বোঝেন, দিদি। আমার কত দুর্বলতা, কত প্রলোভন, স্খলন—"

সুপ্রিয়া চকিত হ'য়ে ভাবে, এরা কেউ ওর উপস্থিতির কথা জানে না—আড়ি পেতে শোনার অপরাধ হচ্ছে যে। একটু সরে পাশে এসে দাঁড়ায়। রেণু একবার চেয়ে দেখলে, কিন্তু নির্মল তেমনি নতমুখে, তেমনি মৃদুস্বরে ব'লে চলল, "নিজের সঙ্গে নিজের কত লড়াই, ছেলেবেলার অনভিজ্ঞতার, প্রথম যৌবনের অত্যাচারের—আমার কোথায় এমন কে আছে যে—"

সুপ্রিয়াকে বিব্রত অপ্রতিভভাবে ফিরতে দেখে রেণু ডাকলে, "চ'লে যাচ্ছিস কেন ?"

নির্মল মাথা তুলে চেয়ে দেখলে, পরক্ষণেই পলকের জন্যে ওর সমস্ত মুখ এমন রঞ্জিত, চোখের দৃষ্টি এত গভীর, এত ব্যাকুল হ'য়ে উঠল যে রেণুর মন বিস্ময়ে ত্রস্ত হ'য়ে উঠল। সুপ্রিয়া নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, অজ্ঞাতে এত কথা শুনে ফেলার অপরাধ এখন ওকে বিঁধছে। কিছুই লক্ষ্য না ক'রে বললে, "আমি অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি। আসলে প্রথমে নড়তেই পারিনি। মাপ করবেন নির্মলদা।"

নির্মল কিছুই বলল না।

রেণু এই একটা নতুন জিনিস দেখল। সুপ্রিয়ার কথার একটাও জবাব দিল না বটে কিন্তু ওর উপস্থিতিতে নির্মলের সমগ্র সত্তা যেন কিসের স্পর্শে সচেতন হ'য়ে উঠেছে। মুখখানি ঈষৎ আরক্তিম, বইয়ের উপর শিথিলভাবে ন্যস্ত হাতের আঙুলগুলি মৃদু কম্পিত, আগেকার মতো সহজভাবে একবারও চাইতে পারছে না। এ কি লজ্জা? সুপ্রিয়া ওর অজ্ঞাতে ওর মনের অনেক কথা শুনে ফেলেছে—তাই? কিন্তু ওরা দুটিতে এর আগে কত কথাই তো বলেছে!

রেণু বারবার নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে থাকে, "ব্যাপার কী?"

রাত্রে আজকাল প্রায়ই নাচ হয়। এডেনের পর থেকে গরমের জন্যে সব বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। নাচ না হ'লে ওদের অলস-সন্ধ্যা জমে না, সারাদিনের আরামের পর দীর্ঘ রাত্রি সহজে কাটতে চায় না। তাই সর্বসম্মতিক্রমে পোর্ট সৈয়দের পর থেকেই বল-নাচ সুরু হয়েছে।

রেণু এখন ইউরোপীয়ান অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করে। ওদের অনুরোধে নাচের প্রথম দিকটা প্রায়ই ডেক-এ উপস্থিত থাকে। চেয়ার টেবিলের ভিড়ে লাউঞ্জে নাচ হবার যো নেই, ডেক-ই একাজের জন্যে প্রশস্ত। কিন্তু সুপ্রিয়ার যে এতে কত অসুবিধা একমাত্র ওই জানে। ও ভালোবাসে নির্জনতা, কিন্তু স্টীমারে তা পাবার উপায় কই? কোথাও না কোথাও কেউ-না-কেউ রয়েছেই। তাই ও ডিনারের পরেই কেবিনে গিয়ে আশ্রয় নেয়। জানলার ধারের উঁচু 'বার্থ'টায় উঠে আলো জ্বেলে কখনো পড়ে, কখনো বা অন্ধকারে চুপ ক'রে শুয়ে থাকে।

কিন্তু এক একদিন রেণু ছাড়ে না, জোর ক'রে উপরে এনে বসায়। আজও তেমনি পীড়াপীড়িতে এতক্ষণ সুপ্রিয়া কাছেই ছিল। রেণু

একবার উঠে গেল, তখন সুপ্রিয়া সরে গিয়ে রেলিংএর পাশে একখানা চেয়ার টেনে সেখানকার আধো-অন্ধকারে বসল। আজ সন্ধ্যা থেকেই দু'একজন হিতৈষিণী মহিলা সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে সুপ্রিয়া আর রেণুর নাচ-শেখার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। মিঃ হ্যামণ্ড বারকয়েক দু'জনকে ডাকাডাকিও করেছিলেন। দূর থেকে নির্মল সবই দেখছিল। সুপ্রিয়ার একলা অন্ধকারে গিয়ে বসাও ওর দৃষ্টি এড়ায়নি।

একজন আধবয়সী সওদাগর-সাহেব আজ ডিনারের টেবিলে পানের মাত্রা ঠিক রাখতে পারেনি। মাঝে মাঝেই ওর এ ভুলটা হয়, বোধ হয় চেষ্টাসত্ত্বেও স্মরণ থাকে না যে স্টীমারের ডাইনিং-রুমটা ঠিক ওর ক্যামাক স্ট্রীটের বাগানঘেরা তেতলা বাড়ির খাস-কামরা নয়। নাচের সময়, এমন কি সন্ধ্যার পর থেকেই মেয়ে-যাত্রীরা ওকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। বাধ্য হ'য়ে সাহেবকে একলা ঘুরে ফিরে নাচটাকে শুধু চোখের দেখায় ভোগ ক'রে তৃপ্ত থাকতে হয়।

আজও পাইপ হাতে তেমনি ঘুরছিল। অন্ধকারে সুপ্রিয়া চুপটি ক'রে বসে আছে দেখে দাঁড়াল সেখানে। রেণুর কী একটা কথার জবাব দিতে দিতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নির্মল সেদিকে চেয়ে দেখলে। পরক্ষণেই অর্ধসমাপ্ত কথার মাঝখানে নৃত্যকারীদের ঠেলে ছুটে গিয়ে লোকটার কোটের কলার চেপে ধরলে। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সাহেব জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "How dare you?" সঙ্গে সঙ্গে পাইপসুদ্ধ হাতে ঘুষি। চোখের পলক না ফেলতে পাইপ ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে, তারপর—হৈ হৈ কাণ্ড! অনেক কষ্টে যখন সওদাগরকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ল, নির্মলের ঠোঁটের পাশ দিয়ে তখন রক্ত পড়ছে। কিছুই না ব'লে ও কেবিনে ফিরবার উদ্যোগ করতেই মিঃ হ্যামণ্ড হাত তুলে ডাকলেন, "বোস, যেও না, ব্যাপারটা কি আগে ব'লে যাও।"

ইঙ্গিতে সুপ্রিয়াকে দেখিয়ে নির্মল বললে, "ওঁর গায়ে হাত দিয়েছিল।"

মিঃ হ্যামণ্ড নীরব তিরস্কার-ভরা দৃষ্টিতে সওদাগরের দিকে তাকালেন। সক্রোধে সে উত্তর করলে, "Damn you! কে ওর গায়ে হাত দিতে গিয়েছিল? আমি ওকে নাচে আসতে ডাকছিলাম।"

সওদাগরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে মিঃ হ্যামণ্ডের দিকে তাকিয়ে নির্মল বললে, "আমি সত্য কথাই বলেছি।"

"সত্যি কথা বলেছ? নিজের চোখে দেখেছিলে?"

"না দেখলে বলব কেন?"

মিঃ হ্যামণ্ড বললেন, "কিছু মনে কোরো না বোস, কিন্তু যদি আমার ভুল হ'য়ে না থাকে, তবে—যতদূর স্মরণ হচ্ছে—তুমি বোধ হয় তখন বেশ দূরে দাঁড়িয়ে মিস রায়ের সঙ্গে কথা বলছিলে। মিস মিটার ছিলেন একেবারে ওদিকে। অতদূর থেকে ঠিক দেখেছ কি?"

মিঃ হ্যামণ্ডের পিছনে দাঁড়িয়ে রেণু স্পষ্ট দেখলে—একথায় নির্মলের মুখখানা ঠিক দুপুর বেলাকার মতোই আরক্ত হ'য়ে উঠল।

সওদাগর তর্জন ক'রে বললে, "তাই জিজ্ঞেস করুন ওকে। কেউ দেখলে না, এত লোকের মাঝখানে একলা কেবল ওই—"

নির্মলের মুখের রক্তাভা গাঢ়তর হ'য়ে ওঠে। চ'লে যেতে উদ্যত হ'য়ে বললে, "আমার ভুল হয়নি মিঃ হ্যামণ্ড।"

রেণু এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি, চুপ ক'রে নির্মলকে দেখছিল। এবার সামনে এসে বললে, "মিস মিত্র নাচতে অস্বীকার করায় লোকটা ওঁর হাত ধ'রে টেনেছিল।"

মিঃ হ্যামণ্ড ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "Sorry মিস রায়। এরকম ঘটবে জানলে আপনাদের এখানে এসে বসতে অনুরোধ করতাম না।

কিন্তু—” ক্ষুব্ধভাবে সকলকে শুনিয়ে বললেন, “মিঃ বোস শান্তির ভারটা নিজের হাতে না নিলেও পারতেন। এখানে আমরা আরও দশজন ছিলাম না তা তো নয়।”

রেণু আশ্চর্য হ’য়ে বললে, “বলেন কি মিঃ হ্যামণ্ড? আপনাদের মেয়েদের গায়ে এরকম মাতাল কেউ যদি হাত তুলত কিংবা এতটুকু অপমান ক’রে কথা বলতে সাহস করত, আপনি কি তখন দশজনের বিচারের আশায় চুপ ক’রে—ব্যাপারটা ঘটতে দিয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখতেন, না সব ভুলে আগে মেয়েটির সাহায্যে ছুটে যেতেন?”

মিঃ হ্যামণ্ড অপ্রসন্নভাবে বললেন, “তবে কি বলতে চান যে যা ঘটল এইটেই খুব ভালো হয়েছে? স্টীমারে দু’দিনের যাত্রার মধ্যেও এই মারামারি ঝগড়াঝাঁটি—”

“মোটেই আমি তা বলিনি! কিন্তু আপনি তো নিজের চোখেই দেখলেন নির্মল মার গা পেতে নিয়েছে—ফিরিয়ে দেয়নি। যেটুকু করতে হয়েছে তাকে, সে শুধু মিস মিত্রের সম্মান আর ওর নিজের আত্মরক্ষার জন্যে।”

উত্যক্ত কণ্ঠে হ্যামণ্ড বললেন, “আজকালকার দিনে ভারতীয়দের ভালোর জন্যে কিছু বললেও তাতে ওরা মন্দই দেখে। মিঃ হজ্‌সন এই এক জাহাজ লোকের সামনে কী করতে পারত? এ আপনাদের ইচ্ছে ক’রে ভুল বোঝা নয় কি মিস্ রায়? যেখানে সেখানে সাদায়-কালোয় এত বিদ্বেষ ছড়াতে দেওয়া ভাল কি?”

কি কথায় কী এসে পড়ল! রেণু অবাক হ’য়ে তাকিয়েই রইল শুধু।

সুপ্রিয়া এগিয়ে এসে বললে, “কিন্তু আপনিই ওঁকে ভুল বুঝছেন মিঃ হ্যামণ্ড—”

“যাক, আপনাদের উপদেশ দিতে গিয়ে আর নিজেকে অপমানিত করব না। যে-কোনো গোলমালের মিটমাটের ভার বিশ্বাস ক’রে

আমাদেরই হাতে ছেড়ে দিতে না পারলে এর পর থেকে আর কী ক'রে আমাদের সহানুভূতির আশা করতে পারেন ?"

একে একে সকলেই ডেক ছেড়ে লাউঞ্জে নয়তো ডাইনিংরুমে ঢুকে পড়ল। ভারতীয়দের স্পর্ধায় সকলের মুখই ভার, বক্ষুত্ব সঙ্কুচিত।

পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে রেণু আর সুপ্রিয়া পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলে একবার।

খানিক পরে রেণু চিরাভ্যস্ত হাসিটুকু হেসে বললে, "যাক, এখন নির্মলকে একবার দেখে আসি। আসবি তুই আমার সঙ্গে ?"

"নিশ্চয়।"......

দরজা খুলে ওদের দেখে নির্মল আশ্চর্য হ'য়ে গেল। রেণু জিজ্ঞাসা করলে, "ভিতরে আসতে পারি ?"

"নিশ্চয়। মিঃ সিং এখনও আসেননি। বসুন।"

কোথায় লেগেছে দেখতে চাওয়ায় লজ্জিত হ'য়ে বললে, "ও কিছু নয়, সামান্য একটুখানি—"

মিঃ হ্যামণ্ড প্রমুখ ইউরোপীয়ান ভদ্রলোকেরা কী বলেছেন সবিস্তার বর্ণনা ক'রে রেণু বললে, "এর উপর আর comment নিষ্প্রয়োজন। তবু, না বলেও পারিনে যে এতটা অবিচার আশা করিনি। সবাই জানে মাতালদের মাথার ঠিক থাকে না, মুহূর্তের মধ্যে যা-তা করতে পারে। সমস্ত জেনেও আর তুমি যে ওকে মারোনি, সরিয়ে দিয়েছিলে মাত্র, তা বুঝেও জেদ ক'রে বললে, 'আমরা ছিলাম কী করতে, কেন বোস ওর গায়ে হাত দিলে ?'—ছিল তো সেখানে সবাই, কিন্তু পড়েছে কি আর কারো চোখে ? হ'ত যদি ওদের মেয়েদের কেউ—"

সুপ্রিয়া এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। এবার বাধা দিয়ে বললে, "মিছে দুঃখ করছ দিদি। ওদের কোথায় ঘা লেগেছে বোঝ না কেন ?

ডরোথী নিজে দেখেছে তুমি সমস্ত সন্ধ্যাটা ওঁর দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিয়েছ—অর্থাৎ মিস—”

“যেতে দাও ওকথা। এখন স্নানের ঘরে যাচ্ছ না তো? আমিই চললাম তাহ'লে।”

মনের মধ্যে কোথায় যেন একটুখানি অস্বস্তি, অতি সূক্ষ্ম একটু ক্ষোভের ভাব। ডরোথী এরই মধ্যে সিংএর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে? আগে কিন্তু ওর দিকে ফিরেও দেখত না। এখনও যদি নির্মল গিয়ে একবার—

ভাবনাটা খচ্ ক'রে বুকে বাজে। কী আশ্চর্য! নির্মল মুহূর্তের জন্যেও এসব ভাবের প্রশ্রয় দেয় কি করে? সত্যিকার ভালোবাসার আস্বাদ জীবনে যে একবারও পেয়েছে, সে কি ক'রে ফের শিকারী ব্যাধের মতো মানুষের সেই আদিম প্রবৃত্তিটার যন্ত্রস্বরূপ হ'য়ে নারীর পিছনে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে চায়? যেখানে-সেখানে যে-সে নারীর মনোহরণ ক'রে অন্য সকল পুরুষকে হারিয়ে দিয়ে আপনি বিজেতা হওয়ার ইচ্ছা, আর ভালোবেসে নিজের জীবন সার্থক করার, ভালোবাসা দিয়ে পরের জীবন সুন্দর করার দুর্নিবার প্রেরণা—এ দু'টোর মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, সেটা নির্মলের মাথায় কবে ঢুকবে?

এসকল মুহূর্তে যখন নিজেকে ভারি ছোট মনে হয়, তখন স্নিগ্ধ কল্যাণী মূর্তিখানি নিয়ে পাশে যদি থাকত সুপ্রিয়া! যদি বলতে পারত তাকে—তুমিই আমার বল, তুমিই আমার ভরসা। তোমাকেই পরশ-মণিরূপে ছুঁয়ে দিনের পর দিন নিজেকে সুন্দরতর পবিত্রতর ক'রে চলব!

কিন্তু দ্বিধাদীর্ণ মন আর কপটতা নিয়ে, ভগবান তো দূরের কথা, মানুষেরও হৃদয় পেয়েছে কি কেউ কোনোদিন? সুন্দরতমের পথে যাকে সাথীরূপে পেতে চাওয়া, তার কাছে আসার যোগ্যতা আগে অর্জন করা চাই তো।

স্নানের পরে অনেকক্ষণ ডেক-এ পায়চারী ক'রে নির্মল আপন মনের সকল দ্বিধা আর সমস্যার সমাধান ক'রে নিলে: প্রবৃত্তির প্ররোচনায় আর ভুলবে না সে, প্রেমের কাছেই শুধু ধরা দেবে। মনে রাখবে, সত্যিকার প্রেম এনেছে ওর জীবনে শুধু সেই নারী যার প্রভাব, জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক, দেখিয়েছে ওকে ঊর্ধ্বলোকের পথ।

ওর তার্কিক মন হয়ত প্রশ্ন ক'রে বসবে—কোথায় তোমার ঊর্ধ্বলোক, কী সে, কেমন তার রঙচঙ ধরণ-ধারণ?·· উত্তর হয়ত হৃদয় ওর দিতে পারবে না, লিখে দিতে পারবে না সে-লোকের ঠিকানা, হাত তুলে দেখাতে পারবে না পথ। তবু বারবার বলবে—ভালোবাসো! আগে তেমনি ক'রে ভালোবাসো যেমন ক'রে ভালোবাসলে নিজের কথা আর মনে থাকবে না, ভালোবাসার পাত্রকে নিজের জন্যে চাইবে না—চাইবে শুধু সুন্দরের জন্যে, পূজারী যেমন ক'রে ফুলটি চায় দেবতার জন্যে। সে-লোকের পথ তখন তোমার জন্যে আপনি খুলে যাবে।···

মনে মনে বললে, 'কিসের এত ভাবনা! সকল ভাবনা এবার দাও ঘুচিয়ে। ছেলেবেলায় একজনের কাছ থেকে শিখেছিলাম শুধু তোমায় বিশ্বাস করতে, তোমার অস্তিত্বের প্রমাণ চাওয়ার কথা কি মনে হয়েছিল তখন? আজ আবার সেই সরলতা দাও ফিরিয়ে, আমি শিশুর মতো তোমার উপর নির্ভর ক'রে বাঁচি।'

* * *

দিনকয়েক পরের কথা।

রেণু নির্মলকে কাছে ডেকে বললে, "মার্সেলসে অনুপম আছে অপেক্ষা ক'রে। তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

"অনুপম কে?"

"আমার ভাই।"

সুপ্রিয়া সামনে বসেছিল। পাছে নির্মলের চোখে চোখ পড়ে এই ভয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

নির্মল বললে, "আপনার ভাই রয়েছেন বিলেতে জানতাম না তো!"

"ওর সঙ্গেই আসবার কথা ছিল আমাদের। কিন্তু নানা কারণে অনুকে আগে আসতে হ'ল।"···

হজ্‌সনের সঙ্গে সেই অপ্রীতিকর ঘটনার পর থেকে রেণুরা ইউ-রোপীয়ান বন্ধুদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে। রাগ ক'রে নয়, গায়ে প'ড়ে মেলামেশা করতে গেলে আবার কি শুনতে কি শোনে, সেই ভয়ে।

এ ক'দিনের অবসরে রেণু নির্মলকে বারবার লক্ষ্য ক'রে দেখেছে। দেখে-শুনে ওর মন ভীত চিন্তিত হ'য়ে উঠেছে।

একদিন কথায় কথায় নেহাত সাধারণভাবে সুপ্রিয়াকে বললে, "অনুর কথা কিন্তু বলা হয়নি নির্মলকে।"

"বলোনি ?"

"না। ওকে একটু আশ্চর্য ক'রে দেবার ইচ্ছা ছিল। অনু আমার কত বড় গর্বের বস্তু, নিজে থেকে সে-সব ব'লে নির্মলের কাছে তাকে পুরানো ক'রে দিতে ভালো লাগে না। নিজেই চিনে নেবে।"

সুপ্রিয়ার মুখে মধুর হাসি দেখে মনের মধ্যে অন্তত একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'য়ে চিন্তিতভাবে রেণু বললে, "সু, আমার মনে হয় এই না-বলার জন্যে নির্মলের—নির্মল ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে। ভাববে—ওকে ভিতরে ভিতরে পর মনে করি। বলি সব কথা, কেমন ?"

"সব কথা ?"

"সব। তোদের বিষয়েও—"

"না রেণুদি, না।"

"কেন রে, এত আপত্তির কী আছে এতে ?"

সুপ্রিয়া উত্তর দিল না দেখে রেণু আবার জিজ্ঞাসা করলে, "লজ্জা ? কিন্তু একদিন তো জানবেই।"

"যখন জানবে তখন জানবে। আগে থেকে বলাবলি কিসের জন্যে ? তা ছাড়া—"

রেণু ফিরে তাকাল।

সুপ্রিয়া বললে, "বাগদানের কথাই বলতে চাও তো ? কিন্তু সে তো একতরফা !"

"কী সেন্টিমেণ্টালিটি করিস ! অনুপম কি জানে না তুই ওকে কত—"

সুপ্রিয়া আহত-গর্বে বললে, "জানবার দরকার কী ? কারো ঘরণী-গৃহিণী হবার জন্যে আমি কি মাথা কুটে মরছি ?"

"ভালো, সখী-সচিব হবার জন্যেই না হয়—"

"তাও না। বিয়েই হয়ত করব না আমি।"

রেণু গম্ভীর হ'য়ে গেল, বললে, "ব্যাপার কী একটু খুলে বল দেখি ? এই দিনকয়েকের মধ্যে এক মুখে কত কথাই বললি ! কখনো দেশের সেবা তোর আদর্শ, কখনো বা সতী-সাবিত্রী হওয়া, আবার এক একসময় করিস কী-যে-সব অবোধ্য হা-হুতাশ—এ ভালো লাগে না, ও ভালো লাগে না, বিবেকানন্দ কেন সংসার ছেড়ে গিয়েছিলেন, বুদ্ধদেব কোন্ সত্য জেনে 'বুদ্ধ' হয়েছিলেন, সন্নিসীরা সন্নিসী হয় কেন !···এত চঞ্চল হ'লে চলে কখনো ? যা চাস একটাই চাইতে হয়।"

"কী যে চাই, তা-ই কি জানি ?"

"পাগলামি করিসনে সুপ্রিয়া। বুদ্ধি যাদের আছে তাদের এসব ভাব-বিলাসিতা শোভা পায় না। মন স্থির ক'রে কাজে লেগে যা। আমি তো তোকে বলিনি যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘর-সংসার করতেই হবে। কিন্তু তোর বুদ্ধদেব বিবেকানন্দও পরহিতের জন্যে কর্ম করতেন।"

"কিন্তু তার আগে তাঁরা কত বছর ধ'রে সাধনা করেছিলেন সেকথা ভুলে গেছ।"

"বেশ তো, তুইও কর! প্রতি কাজ আরম্ভের আগেই রয়েছে অনেকদিন ধ'রে তার জন্যে তৈরী হওয়া।"

"সে রকম সাধনার কথা বলছি না। বলছি আমি—"

"আধ্যাত্মিক সাধনার কথা তো? কী জানি বাপু, অত শক্ত বুঝি না। হাজার বছর তপস্যার পরও সব মহাত্মাই এক জায়গায় এসে মিলেছিলেন—সে হচ্ছে লোকসেবা। ধর্ম করতে হ'লেও এই সংসারে সবার মধ্যে থেকেই করতে হয়। পালিয়ে পার পেয়েছে কে?"

"থাকতেন যদি আজ বিবেকানন্দ! বলতাম তাঁকে, দেখাও সে পথ—যে পথে আগে নিজেকে জানব, পরে জানব কী আমার কাজ। অন্ধের মতো পথে-বিপথে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি ভাই রেণুদি?"

নিশ্বাস ফেলে রেণু বললে "না, তোকে বোঝানো আমার কর্ম নয়। কিন্তু মনে আছে সুপ্রিয়া, গোড়াতেই একথা বলেছিলাম আমি! তোর কী উপায় যে হবে আমি তো তার কূল-কিনারা পাইনে। সে যাক, কিন্তু দেখাদেখি আরো একজনের মাথা না বিগড়ালে বাঁচি।"

"কার? তোমার?"

"আমি কি ছেলেমানুষ, না পাগল? ওসব পোষায় তাদেরই।" একটু হেসে বললে, "বেরিয়েছিলি বাড়ি থেকে লম্বা-চওড়া আদর্শ নিয়ে। কত কী! আর্দ্ধেক পথ না যেতেই গোটা দুই বই প'ড়ে ঢুকল মাথায়—ভৈরবী হওয়া, সত্য, ভগবান—"

"হাঁ। আরও, কোথায় গেলে দেখা পাবো এমন—"

"গুরুর, যিনি ভগবানের একেবারে অন্তরঙ্গ! না?"

সুপ্রিয়া নীরবে হাসলে।

"যা ইচ্ছে কর্ বাপু। জ্যাঠামশাই তো অবাধ স্বাধীনতা

দিয়েছেনই। কেবল, যে হতভাগাগুলো না বুঝে সুঝে ভালোবেসে তোকে হয়রাণ হবে—”

সুপ্রিয়া হেসে উঠল। বললে, “ভয় নেই দিদি, ভয় নেই—” উঠে গিয়ে রেণুর কোলের উপর মাথাটি রেখে সাদরে সস্নেহে বললে, “সুপ্রিয়া চিরকাল তাদের কেনা হ'য়ে থাকবে, তাদের ভালোবাসার বন্ধন কাটিয়ে ভগবানের কাছেও যেতে পারবে না, তিনি ডাকলেও না।”

“কোনো উচ্ছ্বাসে আর আমি ভুলছিনে। কিন্তু নির্মলকে সত্যিই কি বলব না তোদের কথা? আমার মনে হয় এসব ব্যাপারে গোপনতায় লাভ নেই। বরং ক্ষতিই হয়।”

সুপ্রিয়া অন্যমনস্কভাবে বললে, “যা তোমার খুসি।—”

সেই থেকে রেণু বলি-বলি ক'রেও কথাটা বলতে পারেনি নির্মলকে। দু'তিনবার চেষ্টা ক'রে শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবলে, যেখানেই যাই এ কি জটিলতার সৃষ্টি হয় আমার জন্যে? সন্দেহ যা করছি যদি সত্যি হয়, নির্মলকে এত বড় আঘাত দেব আমি কোন্ প্রাণে?

সুযোগের পর সুযোগ চ'লে যায়। রেণু কিছুতেই সাহস সঞ্চয় করতে পারে না। মনকে প্রবোধ দেয়, ব্যাপার এমন কিছু গুরুতর নাও হ'তে পারে। দু'পক্ষেই সমান আদান-প্রদান ছাড়া সত্যকার ভালোবাসা দাঁড়াতে পারে কি? সুপ্রিয়া শেষ পর্যন্ত এমনি উদাসীন থাকলে নির্মলের ঝোঁকটা কেটে যাবে দু'দিনেই।

* * *

মার্সেলস্ পৌছতে আর একটা দিন মাত্র বাকি।

দুপুরে সুপ্রিয়া একা বসেছিল। হঠাৎ মিস রায়ান এলো। সুপ্রিয়া মনে মনে আশ্চর্য হ'লেও কিছু বলল না।

একটু ইতস্তত ক'রে ডরোথী বললে, "বড্ড অবাক হয়েছেন, না? স্বীকার করছি অনেকদিন আগেই আসা উচিত ছিল। কিন্তু স্বভাব আমাদের এতই আলাদা যে আসতে ইচ্ছে করলেও সাহস হ'ত না।"

সুপ্রিয়া বুঝলে এ কৈফিয়তের কোনো মানে নাই। ডরোথী আসেনি আসতে ভালো লাগত না ব'লেই। আজ হঠাৎ কী মতলবে— সেটা বোঝা গেল না।

মেয়েটি আবার বললে, "আমার এক একসময় কী মনে হয় জানেন মিস্ মিত্র? আপনাদের জীবন বড় সহজ বড় সরল। নেই কোনো ভাবনা-চিন্তা, নেই এতটুকু প্রশ্ন সমস্যা। বাপ-মা-অভিভাবক গুরুজন যা করতে বলে, যে পথ বেছে দেয় তা-ই মেনে নিয়ে দিব্যি স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বিগ্ন-ভাবে জীবন কাটিয়ে দেন আপনারা। আর এই দেখুন আমাদের—"

সুপ্রিয়ার চোখে কৌতূহল।

"কি করব না করব সব ঠিক করতে হয় নিজেকে। কারণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব বিষয়ে আমাদের এক দাবী—স্বাধীনতা। এই যে নার্সিং শিখতে চলেছি—"

"ওঃ!"

"কেন, আপনি জানতেন না বুঝি? মিঃ বোস বলেননি আপনাদের?" ডরোথীর স্বরে ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে নিরাশা। বললে, "আমি ভেবেছিলাম—যাক সে কথা। কিন্তু বোস আমার বিষয়ে কখনো কিছু বলেন না আপনাকে?"

"না।"…এতক্ষণে সুপ্রিয়ার মনে হ'ল এই মেয়েটির মনের কথা বুঝেছে সে। কাল মার্সেলস্ পৌঁছবার আগেই নির্মলের সঙ্গে একটা মিটমাট করতে চায়। হাঁ, নিশ্চয়ই তাই! নইলে কি আর যেচে সুপ্রিয়ার কাছে আসে? শেষদিনে সখীত্ব করবার জন্যে?

ওর চিন্তায় বাধা দিয়ে ডরোথী বললে, "নার্স হব সেও ঠিক

করলাম আমি নিজে। কোন্ সহরের কোন্ হস্পিটালে গিয়ে ভর্তি হব তাও দেখতে হবে নিজকে। এমনি ক'রে জীবনের সকল খুঁটিনাটি থেকে স্থুরু ক'রে বিয়ে ঘরসংসার ধর্মকর্ম সবেতেই আমার কর্তা আমি স্বয়ং। বলুন তো, এর চেয়ে সমস্যা আর আছে ?"

সুপ্রিয়া আশ্চর্য হ'য়ে বললে, "কিন্তু এতে সমস্যাটা কোথায় তাই যে ভেবে পাইনে !"

"বলেন কি, সমস্যা নয় ? মানুষের মনটা কি এতই সহজ মিস মিত্র ? তার পছন্দ অপছন্দও কি মাত্র একটা ?" তারপর একটু হেসে বললে, "কিন্তু বৃথাই আপনাকে বিরক্ত করা। বোঝালেই কি আপনি বুঝবেন ? তাই তো বলছিলাম বেশ আছেন আপনারা। শুনে করবেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে রীতিমত হিংসে হয়। ইচ্ছে হয় [redacted] মেয়ে বা যে-কোনো ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে নিজের অবস্থার অদলবদল করি।"

মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে আত্মসংবরণ ক'রে সুপ্রিয়া বললে "ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান দেখছি খুব গভীর! ওদের মনের খবরও অজানা নেই! যাক্ সে কথা। কার মনের গভীর তলায় কখন কী সমস্যা 'কুরুক্ষেত্র' বাধায়, সে মীমাংসা দু'কথায় হ'তে পারে কি না তা বোঝাবার মতো সময় আমার নেই, প্রবৃত্তিও না। আপনার কথাই শুধু পালটে বলতে পারি : বোঝালে আপনিই কি বুঝবেন ?"

ডরোথীর মুখখানা প্রথমে লাল হ'য়ে উঠল। একবার ভাবলে চ'লে যাবে কিনা। পরক্ষণে ডানহাতখানি সামনে প্রসারিত ক'রে স্নিগ্ধ বললে, "ধন্যবাদ মিস্ মিত্র, আপনার স্পষ্ট কথার জন্যে বহু ধন্যবাদ। কিন্তু আমি ভারতীয়াদের অপমান করবার উদ্দেশ্যে বলিনি। সময় সময় শ্রান্ত-ক্লান্ত মন-প্রাণ নিয়ে বাস্তবিকই মনে হয়, সাংসারিক

সামাজিক এত বেশি স্বাধীনতা পাওয়ার চেয়ে আপনাদের মতো আর একটু শাসনের—নিয়মের মধ্যে থাকলেই হয়ত বেশি সুখী হতাম। নিজের সঙ্গে অনবরত নিজের বোঝাপড়া বড় ভয়ানক।"

সুপ্রিয়া মন দিয়ে সব কথা শুনলে। পরে ধীরস্বরে বললে, "ঠিক কোন্ অবস্থায় কিসের জন্যে আপনার মন নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ায় শ্রান্ত-ক্লান্ত হ'য়ে পরাধীন ভারতীয়ার সঙ্গে অবস্থা অদল-বদল করতে চায়, সব শুনতে না পেলে বুঝব কি ক'রে বলুন? কিন্তু সে যা-ই হোক, সমস্যা আসে কি স্বাধীনতা থেকেই? পরাধীন ভারতীয়ার জীবনের নানান জটিল সমস্যার আপনি কতটুকু জানেন মিস্ রায়ান?"

ডরোথী বললে, "তাদের মধ্যেও অসুখ আছে অশান্তি আছে, মানি। কিন্তু সমস্যার জটিলতা থাকবে কেন? এই, বিয়ের ব্যাপারেই ধরুন। বর পছন্দ করে বাপ-মা। যথাসাধ্য দেখে-শুনে দেয় বিয়ে। যার সঙ্গে বিয়ে হয়, শুনেছি আজীবন একনিষ্ঠায় তাকেই আপনারা দেবতাবোধে পূজা করেন। এইটে আমাদের কাছে যত বড় হাসির ব্যাপারই হোক, যতই অসম্ভব ব'লে ঠেকুক, অস্বীকার করবার উপায় আছে কি যে, পারিবারিক জীবনে আমাদের থেকে আপনারা ঢের বেশি সুখী, ঢের বেশি নিরাপদ?"

সুপ্রিয়া মাথা নাড়লে, "ভারতীয় মেয়ে হ'য়েও ভারতবাসীর ঘরের সঠিক খবর আপনাকে দিতে পারলাম না, তাদের সুখ-স্বস্তির পরিমাণ করাও আমার সাধ্য নয়। যেটুকু দেখেছি আর শুনেছি, তা'তে মনের মধ্যে বিশেষ ভরসা পাইনি। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন? সুখের বা দুঃখের কারণ—আপনি যাকে স্বাধীনতা বলছেন তা নয়, পরাধীনতাও নয়।"

"তবে কী?"

"সেইটে চিনতেই তো পথে বেরিয়েছি।"

ডরোথী অবাক হ'য়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সুপ্রিয়া কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললে, "আমার বোনের সঙ্গে আলাপ করুন, অনেক খবর পাবেন। ও ডাক্তার, অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট।"

"আপনিও কি ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছেন ?"

"না।"

সুপ্রিয়া আর আলাপ করতে ইচ্ছুক নয় বুঝে মিস রায়ান বললে, "উঠি তাহ'লে। আপনাকে বিরক্ত করলাম ব'লে কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আমার মনের সন্দেহ গেল না। নিজের মন নিয়ে আমরা যেমন বিব্রত হই, সামাজিক, নৈতিক, পারিবারিক নানারকম নিয়ম আর শাসনে বদ্ধ কোনো ভারতীয় মেয়ের কখনো তেমন হ'বার এতটুকু ভয় নেই ব'লেই আমার ধারণা ছিল।" একটু ইতস্তত ক'রে বললে, "এই দেখুন, এ স্টীমারে যে-ক'জন যুবকের সঙ্গেই আমি খোলাখুলি মিশি, হাসি-ঠাট্টা গান-গল্প করি, হঠাৎ যদি ওদের মধ্যে কেউ একজন বিয়ের প্রস্তাব করে, আমি চট ক'রে জবাব দিতে পারিনে। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু ভালো আছে, সে-সবই আমাকে সমান আকর্ষণ করে। কা'কে ফেলে কা'কে চিরজীবনের সঙ্গী ক'রে নেব ?"

"যাকে ভালোবাসেন।"

"যা'কে ভালোবাসি! কিন্তু কা'কে ভালোবাসি তাই কি জানি ? কখনো মনে হয় একে, কখনো বা ওকে।"

"সত্যি সত্যি ভালোবাসলে ওরকম মনে হবে কেন ?"

"কিন্তু সত্যি ভালোবাসা বলতে কী বোঝায় মিস মিত্র ? আপনার আমি বয়সে বড়, মানুষের সঙ্গে মিশেছি আর দেখেছিও বেশি। কিন্তু আজও বুঝতে পারলাম না—ভালোবাসা বলতে লোকে কী mean করে ?" অল্প হেসে বললে, "অনভিজ্ঞ কিশোরী ছিলাম যখন, তখন প্রেমের গল্প প'ড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিতাম, দিনে রাতে নিজেকে নায়িকা

ক'রে কত স্বপ্নই না দেখতাম। আজও কি সে সব দিয়ে মনকে ভুলিয়ে রাখতে বলেন? ভালো, সুখের জন্যে না হয় তাও করতাম, কিন্তু জানি যখন সে মিথ্যা স্বপ্ন দুদিনও টিকবে না!"

সুপ্রিয়া অবাক। এ ধরণের কথা শুনলে সে এই প্রথম। ওর আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মিস্ রায়ান বললে, "সে জন্যই তো বলছিলাম আপনাদের মনের গতি বড় সরল। সে হিসাবে আপনারা সুখী। পড়তেন যদি আমাদের মতন অবস্থায়—" বাকি কথাটা সাম্‌লে নেয়। চকিত হ'য়ে বলে, "এবার সত্যি উঠি। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে বড় সুখী হ'লাম। লণ্ডনে থাকলে মাঝে মাঝে দেখা হ'তে পারে। আপনার ঠিকানাটা দেবেন তো?" সুপ্রিয়া হেসে ঘাড় নাড়ে।

"ভারতবর্ষেই তো ফিরব আবার, সেদিক থেকে দেখতে গেলে একটা common bond আছে বৈ কি আমাদের মধ্যে। জাহাজ কাল ভোরেই মার্সেলস পৌছবে। ভালো কথা, মিঃ বোসকে অনুগ্রহ ক'রে বলবেন নামবার আগে একবার যেন দেখা হয়।"

"বলব।"

শেষ রাত্রিটা সবাই মিলে এক রকম উৎসবের ব্যাপার করে তুলেছে। মিসেস হ্যামণ্ড রেণুকে জোর ক'রে দলে টেনে নিয়েছেন। সুপ্রিয়াকেও খানিকক্ষণ বসতে হ'ল। নির্মলকে কোথাও দেখা গেল না।

ন'টা বাজতে সুপ্রিয়া উঠে পড়ল। স্টুয়ার্ডেসের ঘরে যেতে হবে একবার, স্কটল্যাণ্ডের গল্প বলবে ব'লে কথা দিয়েছে মিসেস জস্। যেতে যেতে লম্বা ডেকের একেবারে এক কোণে, যেখানে কোনো আলো ছিল না, সেখান থেকে মৃদু মিষ্টস্বরের গান শোনা গেল। বাঙলা গান, সুপ্রিয়া থমকে দাঁড়াল। নির্মল গাইছে ঘুরিয়ে ফিরিয়েঃ

"আশার আশা—ভবে আসা—আসা মাত্র হ'ল,
প্রসাদ বলে : ভবের খেলায় যা হবার তা হ'ল,
এখন সন্ধ্যাবেলায়, ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।"...

কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলে, সুপ্রিয়ার খেয়াল নেই।

গান থেমে যেতে কেন যে চলে না গিয়ে ধীরে ধীরে নির্মলের পাশে এসে দাঁড়াল তাও জানে না।

রেলিংএর উপর থেকে মাথা তুলে নির্মল একবার চেয়ে দেখলে। মুহূর্তখানেক বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে হঠাৎ প্রবল আবেগে সুপ্রিয়ার একখানা হাত চেপে ধরলে। কী যেন বলতে গেল কিন্তু মুখে কথা ফুটল না।

সুপ্রিয়ার সম্বিৎ ফিরে এলো। জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চ'লে যেতে উদ্যত, এমন সময় প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে নির্মল ডাকলে, "যেওনা!"

"কেন?"

"কেন? সুপ্রিয়া!—"

সুপ্রিয়া মন্ত্রমুগ্ধ, স্তব্ধ!

রেলিংএর উপর কম্পিত দেহের ভার রেখে নির্মল ওর মুখের একটি কথার জন্যে নিঃশব্দে অপেক্ষা ক'রে থাকে।...

যেন কত যুগ কেটে গেল। প্রবল চেষ্টায় সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গম্ভীর সংযতকণ্ঠে সুপ্রিয়া উত্তর দিলে, "আমি—আমার থাকবার যো নেই।"

দীর্ঘ দেহখানা অন্ধকারে ঈষৎ কেঁপে ওঠে। সুপ্রিয়া সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

একবার, মাত্র একটুখানি ইতস্তত ক'রে, পরমুহূর্তেই সে দ্রুতপদে কেবিনের দিকে চ'লে গেল।

ভোরে সুপ্রিয়াকে জাগিয়ে দিয়ে রেণু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল, "কি রে, রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি নাকি? মুখ এত শুকনো কেন?"

জোর ক'রে হাসি টেনে এনে পিছন ফিরে ড্রয়ার খুলতে খুলতে সুপ্রিয়া বললে, "এই যে ডাক্তারি সুরু হ'ল! কবে তোমার—"

"চালাকি রাখ্, শরীর ভালো আছে কিনা তা-ই বল্। ঠাণ্ডা লাগেনি তো?"

"না গো না, কিচ্ছু হয়নি আমার।" রেণু দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার আগেই তাড়াতাড়ি মুখ ধুতে চ'লে গেল। এই প্রথম—জীবনের সবচেয়ে নতুন, সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার রেণুর কাছে গোপন করল।

বাস্তবিক, সুপ্রিয়া ভেবেই পায় না এমন কী ঘটেছে যার জন্যে কাল থেকে ওর মনে এতটুকু শান্তি নেই। নির্মলের কোনো পাগলামির জন্যে ও তো দায়ী নয়, তবু সে কথা অপরকে বলতে এত লজ্জা কেন? অথচ তাকেই নিজের মনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সহস্রবার স্মরণ করবারই বা এত ইচ্ছা আসে কোথা থেকে? একজনের এক অসতর্ক বিহ্বল মুহূর্তের সমস্ত উদ্দাম আবেগ কি তার যত ব্যাকুলতা নিয়ে অবশেষে ওর চিত্তে, এমন কি দেহে-মনেও সংক্রামিত হ'তে চলল? এ কি স্বপ্ন না সত্য!—ও যে একবারও সেই মধুর অথচ তীক্ষ্ণ বেদনাময় কথাগুলো ভুলতে পারছে না! কী যে ছিল তা'তে কে জানে! তবু,

তা'রই আবেশে এ কোন্ অজ্ঞাত বেদনায় হৃদয় যে ওর ক্ষণে ক্ষণে চমকিত শিহরিত হ'য়ে উঠছে, সুপ্রিয়া ভেবে কোনো কূলকিনারাই পায় না!

চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে স্থির করলে—রেণুর কথাই ঠিক, নিশ্চয় শরীরই ওর ভালো নেই। শরীর ভালো না থাকলে মনেও যে কত গোলমাল হ'তে পারে তা সে কি ক'রে জানবে! জীবনের আগা-গোড়া তন্ন তন্ন ক'রে অন্বেষণ ক'রে দেখলে, এই উনিশ বছরে কখনো কোনো কারণেই মানসিক এমন বিচলিত অবস্থা হ'য়েছে ব'লে স্মরণ হ'ল না। নির্মলের প্রতি মনে ওর এতটুকু শ্রদ্ধা নেই, তবু কেন—

"ওরে সু, তোর হ'ল কি আজ? আর কাউকে মুখটুখ ধুতে দিবি না নাকি?"

সুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিল, ব্যস্ত হ'য়ে রেণু বললে, "লক্ষ্মী বোন, শীগ্‌গির যা। যতটা পারিস্ গুছিয়ে নে। নির্মল প্রায় অর্ধেক শেষ ক'রে এনেছে, ভাগ্যিস ওকে ডেকে আনলাম! আমার আবার সকালেই স্নান না করলে চলে না, জানিস তো।"

দরজার কাছে এসে মুহূর্তের জন্যে পা উঠল না। পরক্ষণে কম্পিত মৃদু হস্তে পরদা উঠিয়ে সুপ্রিয়া বললে, "এবার আমায় দিন।"

"আর সামান্যই বাকি", নির্মল ক্ষিপ্রহস্তে জিনিষপত্র বাক্সে বন্ধ করে। সুপ্রিয়া নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।

যতক্ষণ দুজনে একলা রইল, নির্মল একটিবার মুখ তুলল না, একটা কথাও বলল না। কাজ শেষ হ'য়ে যেতে তেমনি নীরবে নিজের কেবিনে ফিরে গেল।

এই শান্ত অথচ বিষণ্ণ মূর্তি সুপ্রিয়ার মনকে যুগপৎ ব্যথায়, করুণায় মথিত ক'রে তোলে। কালকের ব্যাপার তা'হলে নিছক ঝোঁকের

মাথায় ঘ'টে যায়নি! আশ্চর্য, কে জানত যে নির্মল ওকেই—ভাবতে ভাবতে কেবিনে একলা ব'সেও সুপ্রিয়ার মুখখানি আগাগোড়া রঞ্জিত হ'য়ে ওঠে। নির্মলের গত কয়দিনের সমুদয় ব্যবহার—যা তখন নিতান্তই অবোধ্য খাপছাড়া ঠেকেছিল—একে একে মনে পড়ে যায়।

মগ্ন হ'য়ে সে-সব কথা ভাবছে। হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক্ ক'রে ওঠে। সুপ্রিয়া না বাগ্‌দত্তা, অপরের প্রতিশ্রুত বধূ! তবে এ করছে কী? এ সব কথা ভাববার ওর কী অধিকার? অকস্মাৎ এ কী এক পঙ্কিল স্রোতে ওর মনের সমস্ত পবিত্রতা, হৃদয়ের নিষ্ঠা, বুদ্ধির স্থিরতা প্রায় ভেসে যেতে বসেছে! কাল থেকে এত কথা ভেবেছে, অনুপমের কথা তো কই একবারও মনে পড়েনি! সুপ্রিয়া সভয়ে অন্তরের মধ্যে খুঁজে দেখলে—সেখানে অনুপমের সে অনুপম মুখখানি কই? তার পরিবর্তে এ কা'র বিষণ্ণ কাতর চোখ, শিশুর মতো সুকুমার অধর!

অসম্ভব, অসম্ভব, এমন হ'তেই পারে না, সুপ্রিয়া দ্বিচারিণী নয়—সুপ্রিয়া অসতী নয়—কল্পনায়ও নয়।···

সেই স্তূপাকার জিনিষ-পত্রের মাঝখানে ব'সে শঙ্কাকুল চিত্তে সুপ্রিয়া অন্তর্যামীকে স্মরণ করলে, "আমার মন তোমায় মানুক বা না মানুক, বুদ্ধি তোমার অস্তিত্ব স্বীকার করুক বা না করুক, হৃদয় যে তোমায় না ডেকে কখনো শান্তি পায়নি, একথা আর কেউ না জানুক—তুমি জানো। তুমিই আমাকে সকল অশুচি, নিজের বা পরের সঙ্গে সমুদয় মিথ্যাচার থেকে চিরজীবন রক্ষা করো।" প্রার্থনাশেষে ছোট হাতবাক্স থেকে অনুপমের ফটো বার ক'রে সেখানি বারবার মাথায় স্পর্শ করিয়ে প্রাণপণে সে নির্মলের বিরুদ্ধে সমগ্র দেহ-মনকে কঠিন ক'রে তুললে।

মার্সেলসে ইংরেজ ও স্কচ যাত্রীদের আত্মীয়-স্বজন এমন আর কে আছে? তবু বন্ধুবান্ধব যেখানে যারা ছিল, প্রায় সকলেরই কেউ না কেউ এসেছে। ডরোথী রায়ানের পিতৃবন্ধু এক মধ্যবয়স্ক ফরাসী ভদ্রলোক ওকে নামবার জন্যে তাগিদ দিতে লাগলেন। একে একে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যেখানে রেণু আর সুপ্রিয়া দাঁড়িয়েছিল ডরোথী সেদিকে এগিয়ে এলো।

"চললাম মিস্ মিত্র, গুডবাই মিস্ রায়, দোষ-অপরাধ মনে রাখবেন না।" অদূরে দণ্ডায়মান নির্মলকে দেখে অনাবশ্যক উচ্চস্বরে রেণুকে বললে, "আপনি ডাক্তার যখন, দেখা হ'তে পারে মাঝে মাঝে। লণ্ডনে চেয়ারিং ক্রস্ হস্পিটালেই কাজ শিখব ঠিক করেছি।"

রেণু এই শেষ সময়ে একটু খোঁচা দেবার লোভ সংবরণ করতে পারল না, ব'লে ফেলল, "গ্লাসগো এরই মধ্যে নাকচ?"

ডরোথী হেসে উত্তর দিলে, "সে তো হাতে রইলই! আপাতত লণ্ডনই প্রিয়তর।"

ফিরবার মুখে নির্মলকে যেন হঠাৎ দেখেছে এমনি মুখের ভাব ক'রে নিতান্ত সরল সুরে বললে, "তুমিও এখানে বোস্! ভালোই হ'ল। যাবার সময়ও দেখা না হ'লে আফশোষ থেকে যেত। কিন্তু কই, তুমি এখন নামবে না? কেউ আসবে নাকি রিসিভ করতে?"

নির্মল মাথা নাড়ল।

তখন চাপা আগ্রহের সুরে ব'লে উঠল, "তবে চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি না এলে একটুও ভালো লাগে না, সত্যি বলছি। এ ক'দিন কেন যে একবারও এলে না—"

ওধার থেকে রেণুর কণ্ঠস্বরে বাকি কথা চাপা পড়ল, "নির্মল, অনুপম এসেছে, শিগ্‌গির এদিকে এসো।"

ডরোথী দ্রুতকণ্ঠে—"চেয়ারিং ক্রস্‌ হস্পিটালে যেও কিন্তু মাঝে মাঝে," ব'লে ফিরে দাঁড়াতে অনুপমকে দেখতে পেয়ে থম্‌কে দাঁড়াল, "What a handsome man! ঠিক যেন গ্রীক দেবতাদের একজন। আপনার ভাই বুঝি মিস্‌ রায়?"

"হাঁ।" রেণু এদিক ওদিক তাকিয়ে সুপ্রিয়াকে কোথাও দেখতে না পেয়ে হেসে বললে, "পালিয়েছে।"

কথাটা কিছু না বোঝা সত্ত্বেও নির্মলের কানে গিয়ে আঘাত করল।

দিন দুই পরে।

সন্ধ্যার সময় পারিসে সেঈন নদীর ধারে এসে সকলের সঙ্গ এড়িয়ে নির্মল দূরে জলের পাশে গিয়ে বসল। অনুপমের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে রেণু বললে, "বোধ হয় একটু একলা থাকতে ইচ্ছা করছে। ডেকে কাজ নেই, চলো আমরাও বসি এখানটায়।"

"রেণু, আমি ঠিক করেছি জার্মানিতে আর যাবো না।"

সুপ্রিয়া আশ্চর্য হ'য়ে ফিরে তাকাল। অনুপম বললে, "ভেবে দেখলাম, আগে ইংলণ্ডের সঙ্গে পরিচয় বেশি দরকার। জার্মানিতে পরে গেলেও চলবে। তাছাড়া আমি লণ্ডন, এডিনবরা, কেমব্রিজ আর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ক'রে নিতে চাই। তারা কি-ভাবে থাকে, কেমন ক'রে সময় কাটায়, পড়াশুনো ও পরীক্ষা-পাশের বাইরে আর কিছু ভাবে কি না, কি

করলে সকলের এক উদ্দেশ্য এক প্রাণ হয়, তীব্র দেশাত্মবোধ জাগে সকলের মনে—লেখাপড়ার ফাঁকে এই আমার এখানকার কাজ।"

"শুনেছি প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই Union বা Association আছে।"

"হাঁ। তাইতো শুনি। আমি প্রথমে কেমব্রিজে গিয়েই ভর্তি হব। জ্যাঠামশায়কে তার করেছিলাম, উত্তর পাওয়া গেছে।"

"কি বললেন তিনি?"

"আপত্তি নেই, বরং খুসী সবাই কাছাকাছি থাকব ব'লে।"

"তা তো বটেই।"

"আমি বলি কি রেণু, পারিসে যা দেখবার আছে দেখে, চলো সবাই মিলে দিনকতক কেমব্রিজে গিয়ে থাকি। সেখান থেকে লণ্ডনে তোমাদের সব বন্দোবস্ত ক'রে দেব।"

"থাকবার ব্যবস্থা মিসেস্ লাড্লোই করবেন, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। কেবল ভর্তি হওয়া—"

"হাঁ, কিন্তু তার তো দেরী আছে। ইতিমধ্যে লণ্ডনের কাছাকাছি প্রসিদ্ধ জায়গাগুলো দেখে নেওয়া যাক।"

"বেশ তো, তাহ'লে নির্মলকেও ডাকো।"

"ওঁর যদি ভালো না লাগে?"

রেণু মাথা নাড়লে, "ওকে একলা ছেড়ে দিতে পারব না এখন। যেমন ক'রে হোক মত করাতে হবে।"

শুনে অনুপম বিস্মিত হ'ল কিন্তু কিছু বলল না। অন্ধকারে সুপ্রিয়ার মুখ কেউ দেখতে পেল না।

একটু পরে রেণু বললে, "অনু, নির্মল সুবিমলের ভাই।"

অনুপম চমকিত হ'ল; ধীরে ধীরে রেণুর হাতের উপর একখানি হাত রেখে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "এতদিন বলোনি কেন?"

অদূরে শায়িত নির্মলের দিকে তাকিয়ে রেণু বললে, "ও কিন্তু আমার পরিচয় কিছুই জানেনা এখনও। ...... সুপ্রিয়া, এবার ওকে ডেকে নিয়ে আয় না! অনেকক্ষণ একলা রয়েছে।"

"তুমিই যাওনা রেণুদি, হেঁটে হেঁটে আমার পায়ে ভারি ব্যথা হয়েছে।"

রেণু উঠে যেতে অনুপম জিজ্ঞাসা করলে, "ইউরোপ কেমন লাগছে, মিনু?"

"এমন আর কি! এদেশে আসবার জন্যে কেন এত ব্যস্ত হ'য়েছিলাম আমি তো বুঝি না। কী এত শিখবার আছে এখানে?"

"আছে বৈ কি! ইউরোপে না এলে এশিয়ার লোকের শিক্ষাই সম্পূর্ণ হ'য়েছে বলা যায় না। জাপান কখনো এত বড় হ'তে পারত, যদি না সে এদেশের ভালোটা নিজের মধ্যে গ্রহণ করত?"

"এদেশের ভালোটা কী? তাই আগে বলো আমায়। অস্ত্রশস্ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, নৌবহর, দেশ-শাসন, সাম্রাজ্য-পরিচালনা—ব্যস্, এর বাইরে আর কী দিতে পারে ইউরোপ?"

"আর কী চাও? জগতে বড় হবার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সবই তো ঐ ক'টির ভেতরে মেলে। তবে আরও একটা জিনিষ আছে যার নাম করতে ভুলে গেছ তুমি।"

"যথা?"

"এদেশের এডুকেশন। অন্তত এদিকটা তো তোমার মনকে নাড়া না দিয়ে পারবেই না। এটা স্বাভাবিক যে মেয়েদের মন ব্যবসা-বাণিজ্য বা দেশ-শাসনের মতো কূট আর জটিল বিষয়ে কোনো রস পায়না, কিন্তু সাহিত্যে, দর্শনে আর বিজ্ঞানে ইউরোপের চেয়ে অগ্রণী কে? সেখানেও কি কিছু শিখবার নেই?"

"তুমি কিন্তু আমার মনের মাপকাঠি দিয়ে বিশ্বের মেয়েদের বিচার

ক'রে বসলে ভুল করবে, অনুদা। এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আর দেশ-শাসনের মতো জটিল বিষয়ে মাথা ঘামানো ছাড়া অন্য কাজ ভালোই লাগেনা। তাদের—"

অনুপম বাধা দিয়ে বললে, "কই, কোথায় তেমন মেয়ে? দেখিয়ে দাও। নাম করো।"

"বাঃ তুমি যে আমাকে সেই ছেলেবেলার মতো রাগিয়ে দিয়ে তর্কে টানবার মতলব করেছ! কিন্তু নাম করব কি ক'রে? তোমরা কি এখনো মেয়েদের ততখানি সুযোগ দিয়েছ যে ওরা প্রকাশ্য দিবালোকে এসে যে-কোনো গুরুতর কাজের ভার মাথা পেতে নিতে সাহস করবে? আগে হোক সেদিন, পুরুষের মন যাক বদ্‌লে, কথায় কথায় মেয়েদের পক্ষে 'এটা স্বাভাবিক', 'ওটা অস্বাভাবিক', ব'লে বাঁধা-ধরা রায়-প্রকাশ থেকে ক্ষান্ত হোক সবাই—দেখবে তখন। মেয়েদেরই মনে মেয়েদের সম্বন্ধে তোমরা এমন একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল ক'রে রেখেছ যে, সেটা উপড়ে ফেলতেই কত যুগ লাগবে কে জানে।"

খনিক চুপ ক'রে থেকে অনুপম বললে, "কিন্তু যাদের অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়েছে তারাও তো কই সেটার সদ্ব্যবহার করতে পারে না। তুমিই তো বললে যে ইউরোপের কিছুই তোমার ভালো লাগছে না।"

"ঐ দেখ, আবার ভুল করছ। এটা কেন ভুলে যাচ্ছ যে সকলের মনের গড়ন ঠিক একরকম নয়! চাঁদ সুলতানা আর রিজিয়া মেয়েদের মধ্যে আছেই আছে; তেমনি আছে খনা গার্গী মৈত্রেয়ী, আবার উপ্পলবর্ণা সংঘমিত্রাও। খোলা আলো-হাওয়ায় ফুলটি যেমন ঠিকমতো ফোটে, স্বাধীনতার অবকাশে—যার যেমন মন সে তেমনি ভাবেই খুলে ধরবে নিজেকে। ঘরে ঘরে মেয়েরা আগে সে সুযোগ পাক, যেমন পেয়েছি তোমাদের কল্যাণে আমি আর রেণুদি; তখন দেখবে প্রত্যেকের ভেতর প্রকাশের কত বিচিত্রতা। তাকে স্বীকার ক'রে

নেওয়াই মঙ্গল, অনুদা। মুক্তিই যদি দিতে চাও সর্ব অধীনতা থেকে, তবে সকলকে বর্তমানযুগের এক আইডিয়ার বন্ধনেও আর বাঁধতে চেও না।"

"সে আইডিয়া কী?"

"দেশ, দেশ! ইউরোপের নকল!"

অনুপম এমন চম্‌কে উঠল যে অন্ধকারেও সুপ্রিয়া তা টের পেল।

"সুপ্রিয়া, তুমি দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে এত তুচ্ছ ভাবতে সুরু করেছ কবে থেকে?

"দেশের স্বাধীনতাকে তুচ্ছ ভাবি? কখ্‌খনো না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি অনুদা, দেশের বড়ো তোমার কাছে আর কি কিছুই নেই? আর কিছুর জন্যে কখনো মন কাঁদে না তোমার?"

"সুপ্রিয়া, আমি যদি দুর্বল হতাম তবে অনেক কিছুর জন্যেই মন কাঁদত। কিন্তু আকৈশোর শপথ ক'রে যে ব্রত গ্রহণ করেছি, এ জীবনে তার থেকে ভ্রষ্ট বা বিচ্যুত হ'তে পারব না। এর বেশি তোমায় আর বলতে পারি না।"

অনেকক্ষণ পরে, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সুপ্রিয়া বললে, "তুমিই সুখী। আমি যদি তোমার মতো দেশের কাজকেই জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ, সত্য কাজ ব'লে একান্তভাবে মেনে নিতে পারতাম!"

সান্ত্বনার সুরে অনুপম বললে, "পারবে; এগুলো সাময়িক চঞ্চলতা বৈ তো নয়। মাসখানেক আগেও তো কই তোমার মুখে এরকম কথা শুনিনি!"

"শোননি, কারণ তখন তোমাদের আইডিয়াই ছিল আমারও আইডিয়া। ছোট থেকে তোমার আর বাবার প্রভাব আমার উপর বড় কম ছিল না তো! কিন্তু যখন থেকে ভাবতে সুরু করেছি— ভাবনার সূত্রপাত হয় প্রায় বছর দুই আগে যখন দেশনেতাদেরই পরস্পরের মধ্যে দলাদলি রেষারেষি স্বার্থপরতা দেখে দেখে মন

আমার গেল বিগ্‌ড়ে—তখন থেকেই আগেকার Idealism-এ নানারকম অসারতা দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অথচ দেখ রেণুদির কোনো পরিবর্তন হয়নি; তোমার মতে তারও আদর্শের নড়চড় হয়নি।"

"তাতেই বোঝো তুমি কত ছেলেমানুষ। দেশসেবকদের মধ্যে নিন্দনীয় যা আছে, তা দূর করতে হ'লে পলায়নই পন্থা নাকি? বরং এমন একদল লোক যদি গ'ড়ে ওঠে যারা নিজের স্বার্থ মোটে ভাববে না—"

"তাদের গ'ড়ে তুলবে কে?"

"তারা নিজেরাই নিজেদের গ'ড়ে তুলবে। দৃঢ়চিত্ত একদল ছেলে আর মেয়ে।"

"পেছনে তাদের কোন শক্তি দেবে প্রেরণা? গায়ের জোরে তো আত্মগঠন হয় না অনুদা!"

"দেশাত্মবোধ দেবে তাদের সে প্রেরণা, আনবে অন্তর থেকে সে-শক্তি যার বলে অসাধ্যসাধন হ'তে পারে। ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন—এঁদের কথা ভুলে যাও কেন? আবার তাঁদের মতন আধার তৈরী হ'তে পারে না? দু'একটা দুর্ঘটনায় এত হতাশ হও কেন?"

"কিন্তু যাদের মধ্যে প্রখর দেশাত্মবোধ নেই? যাদের কর্মপ্রেরণা আসে অন্য উৎস থেকে? যেমন—শিল্পী, কবি, গায়ক, চিত্রকর সাধু-সন্ন্যাসী?"

"সকলের মধ্যেই জাগাতে হবে সেই দেশপ্রেম, যাতে সবাই নানাভাবে নানা উপচারে এক দেশমাতারই পূজায় সমুদয় শক্তি নিঃশেষে সমর্পণ করতে পারে।"

"দেশের চেয়ে বড় সত্য, দেশের জন্যে ত্যাগের চেয়ে বড় ত্যাগ, দেশসেবার তুল্য বড় কাজ যার কল্পনায়ও আসেনা, তোমার কথাগুলো

তার পক্ষে সঙ্গত বৈ কি। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো? সংসারে সকলের কাছে দেশাত্মবোধই একমাত্র সত্য নয়, জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় লক্ষ্য নয়। এমন অনেকে আছে যাদের কাছে বিশ্ব আরো বড় সত্য, সার্বজনীন মঙ্গলই একমাত্র প্রার্থনীয়।"

"মানুষ চলেছে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে! সেটা তো মানো? বিশ্ব যখন আমার কাছে দেশের অপেক্ষা বড় হবে, তখন স্বীকার ক'রে নিতে দ্বিধা করবনা কিন্তু এখন তা ভেবে আমার লাভ কী? তুমি জানো আমি কথা বেশি বলতে ভালোবাসি না।"

সুপ্রিয়া নম্রভাবে বললে, "আমার মনের সন্দেহ তোমায় না বললে আর বলব কা'কে? মতের মিল না হ'লে রাগ কোরো না।

অনুপম লজ্জিত হ'য়ে উঠে পড়ল।

রেণুদের ডেকে নিয়ে হোটেলের দিকে ফিরতে ফিরতে সুপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু কেন হঠাৎ এত সন্দেহ এলো তোমার মনে? পরাধীন জাতীর স্বাধীনতার চাইতে কামনার জিনিষ সংসারে আর কী থাকতে পারে আমি তো বুঝিনা।"

"সন্দেহ ঠিক কখন কোন্ ফাঁকে আসে তা কি বলা যায়? তবে যেখানেই যাই, যা-ই করি না কেন, অন্তরে তৃপ্তি পাই না এইমাত্র জানি। মনের মধ্যে কেবল প্রশ্ন উঠতে থাকে, সত্য কী? সব চেয়ে বড় সত্য কোন্‌টি? কারো কাছে দেশ বড়, কারো কাছে ধর্ম, কেউ বা চায় আর্ট, কেউ আত্মোন্নতি। আমার মন দিশেহারা হ'য়ে যায়। আপনা-আপনি কেঁদে বলে অর্জুনের মতো পেতাম যদি লোকোত্তর গুরু—"

ভিতরে ভিতরে অনুপমের মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। উৎসাহ দিয়ে বললে, "বলো!"

"যিনি সর্ব আদর্শের অতীত, যাঁর বুদ্ধি মন-প্রাণকে ছাড়িয়ে গেছে, যাঁর জ্ঞান দেশকালের সীমায় বদ্ধ নয়—"

"এক কথায়, শ্রীকৃষ্ণের মতো!"

সুপ্রিয়া চুপ ক'রে থাকে।

অনুপম বললে, "তবেই দেখ, আমার অভিমতই সত্য কিনা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কামভাবে কর্ম করতে বলেছিলেন, বিবেকানন্দের গুরুও তাঁকে কর্ম করতে বলেছিলেন। নিজের জন্যে নয়, লোকহিতার্থে কর্ম। আমি বিবেকানন্দের ভাবে ভাবান্বিত, তা তুমি জানো বোধ হয়। তিনি নিজের মুক্তিকেও তুচ্ছ মনে করেছিলেন পরের মঙ্গলের কাছে। এর চেয়ে বড় আদর্শ, এর চেয়ে বড় সত্য আর কী আছে সুপ্রিয়া?"

"কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম করা আর দেশের স্বাধীনতা কামনা ক'রে কর্ম করা, এ দুটো কি এক?"

অনুপম ঈষৎ উত্যক্ত কণ্ঠে বললে, "স্বাধীনতা যখন নিজের জন্যে কামনা করছ না, করছ তেত্রিশ কোটি দুঃখী নর-নারীর অবস্থার উন্নতির জন্যে, তখন সেটি এত সকাম হ'ল কি ক'রে তা আমার বুদ্ধিতে আসেনা।"

সুপ্রিয়া আর কিছু বলল না।...

সে রাত্রে শুতে যাবার আগে বিছানায় বসে অনেকক্ষণ ভাবল।...

এই রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মতো চারদিকে ওর এ কী অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে? মনে নেই আগেকার সে দৃঢ়তা, প্রাণে নেই উৎসাহ, হৃদয়ে নেই শান্তি। জীবনের লক্ষ্যে এসেছে সন্দেহ, প্রেমে এসেছে বিরোধ।—দু'দিন আগে সে কি ভাবতেও পারত যে এ সংসারে অনুপম ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের প্রতি ওর চিত্ত এতটুকু আকৃষ্ট

হবে? অথচ, এ আকর্ষণের হেতু কী—তা আজও ভেবে ঠিক বুঝতে পারেনি। রূপ? অনুপমের পাশে নির্মল কি দাঁড়াতেও পারে?—গুণ? আজ অবধি নির্মলের এমন কোন্ গুণের পরিচয় পেয়েছে সুপ্রিয়া, যা আবাল্য-স্মৃতিতে জড়িত অনুপমের উদার, মহৎ ও স্নেহশীল স্বভাবের সহস্র প্রমাণকে উপেক্ষা ক'রে দিয়ে ওর চিত্তকে এত সত্বর অন্যাভিমুখী ক'রে তুলতে পারে? স্টীমারের সেই রাত্রির ঘটনার পর থেকে নির্মল বিষণ্ণ হ'য়ে আছে। কিন্তু তার জন্যে সুপ্রিয়ার এত দুঃখ কিসের?···

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কেমন রাগ হয় ওর। এ কী দুর্দৈব! সুপ্রিয়া এসেছে এদেশে ওর কলেজের শিক্ষা সমাপ্তির জন্যে; অন্য কোনো উদ্দেশ্য যদি থাকে, তবে তা আর যা-ই হোক, প্রেম নয়। রেণু আর অনুপমের সাহায্যে ধীরে ধীরে ইউরোপের সর্বত্র ভ্রমণ ক'রে এখানকার চিন্তাশীল মনীষীদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ও মৌখিক আলাপ ক'রে, তাঁদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানের ভিতর দিয়ে মনের পুঞ্জীভূত সন্দেহের নিরাকরণ ও জীবনের লক্ষ্য আর কর্ম সম্বন্ধে দিক্‌নির্ণয় ক'রে দেশে প্রত্যাবর্তন, এর বেশি তো সুপ্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। অনুপমের মতামত যা-ই হোক, সে একনিষ্ঠ; ওর বুদ্ধি একবার যাকে আদর্শ ব'লে মেনে নিয়েছে, তাতেই চিরজীবন একাগ্র থাকবে। ওর দিক থেকে সুপ্রিয়ার ভয়ের কারণ নেই, কারণ অনুপমকে ধীর-স্বভাব কর্মী ছাড়া আবেগ-উচ্ছল প্রেমিকরূপে সে কল্পনাও করতে পারে না। ওর আশৈশব শান্ত সংযত স্নেহ আর নির্মলের যেন মুহূর্তে-প্রজ্জ্বলিত উদ্দাম আবেগ—দু'য়েতে কত তফাত! তবু অবুঝ প্রাণ ভিতরে ভিতরে কেঁদে মরে সেই উচ্ছৃঙ্খল ভাব-বিলাসীরই জন্যে? যাকে দুদিন আগেও স্টীমারে চপল মেয়েদের চটুল চোখের একটি ইঙ্গিতে পুতুলের মতো উঠতে আর বসতে দেখেছে?

সুপ্রিয়া আকুল হ'য়ে ভাবতে লাগল—ইউরোপে আসতে না আসতে এ তার হ'ল কী? দিনের পর দিন নির্মলকে এভাবে চোখের উপর অসুখী দেখে ওর মন যে কত অশান্ত, কত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে, তা যদি আর কেউ টের পায়? রেণুদি এরই মধ্যে কিছু সন্দেহ করেছে, সুপ্রিয়াকে নিশ্চয় এখনও তার মধ্যে জড়ায়নি, কিন্তু ও যে-রকম বুদ্ধিমতী! নির্মল যদি আর বেশিদিন এ-রকম 'মনমরা' হ'য়ে থাকে, সুপ্রিয়া তা সহ্য করতে পারবে না—তখন রেণুর দৃষ্টির তীক্ষ্ণ রশ্মি থেকে সে আত্মগোপন করবে কোন্ ছায়ায়?

অলক্ষ্যে সুপ্রিয়া গভীর নিশ্বাস ফেললে।—ওর যেন কেউ কোথাও নেই! এ বিপদে যাবে কার কাছে? বাবাকে এ লজ্জার কথা বলতে পারবে না তো কিছুতেই। তিনি যে জানেন তাঁর মেয়ে বাগ্‌দত্তা—বিবাহিতার সমান!···এমন দ্বন্দ্বেও যে কেউ পড়তে পারে কে জানত। একই জীবনে—দুজনকে ভালোবাসা! দু'বার ভালোবাসা! যে শুনবে সেই যে ওকে ধিক্ বলবে। রেণুদি তো আজো সেই একজনের স্মৃতিপূজা ক'রে চলেছে—সেও কি ওর দুঃখ বুঝবে? কেউ—কোনো ভালো মেয়েই বুঝবে না। যাবে সে কোথায়?

অন্ধকারে সুপ্রিয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।···কোথায় গেছে আজ ওর ভগবান আছেন কি নেই সে সমস্যা, আদর্শের সহস্রবিধ কূট-জাল, জগতের মাঝে বড় হবার, বড় কাজ করবার প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সমাজ-সংস্কার ও নারী-উন্নতির প্রচণ্ড আগ্রহ! ওর মনকে পশ্চাতে ফেলে প্রাণ তার অজানা আকৃতি নিয়ে বিজয়ীর মতো আজ সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এ তরঙ্গের গতিবেগ সে থামাবে কি দিয়ে? কোন্ ধর্মে স্থিত হ'য়ে, কোন্ পন্থাকে মেনে নিয়ে?···

দিশাহারা ভয়ার্ত শিশুর মতো অন্ধ আবেগে সুপ্রিয়া ডাকলে—ভগবান, ভগবান, আমায় এ কী সমস্যায় ফেলেছ!

সেদিন রেণু প্রস্তাব করেছিল, "নির্মল, চলো না হয় আমরা দু'ভাই-বোনে মিলে আর কোথাও যাই।"

নির্মল আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কেন দিদি?" তখন রেণু মিনিটখানেক কোনো উত্তর দিতে পারে নি। নির্মল যদি নিজের মধ্যে এত অধিক মগ্ন হ'য়ে না থাকত, তবে রেণুর এই নীরবতাকে ঠিক বুঝতে পারত। তারপর অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ এনে রেণু সে কথাকে চাপা দিয়েছিল, নির্মলও দ্বিতীয় প্রশ্ন করেনি।

অনুপমের ওকে অত্যন্ত ভালো-লাগা সত্ত্বেও সে রেণু আর সুপ্রিয়াকে আড়ালে বলতে বাধ্য হয়েছে যে এধরণের লোকদের ও মোটে বুঝতে পারে না। আজও Luxemburg Garden-এ বেড়াতে বেড়াতে নির্মল যখন দল ছেড়ে একলা পিছনে প'ড়ে রইল, সুপ্রিয়া স্পষ্ট দেখলে অনুপম খুসী হয়নি। যে কারণেই হোক ওর মন ভালো নেই, এইটে সবাই বুঝেছে। খাবার সময় ওকে সুপ্রিয়ার সামনা-সামনি বসতে হয়। তখন ওর আড়ষ্ট ভাব-ভঙ্গি কারো নজর এড়ায় না। পরিবেশনকারিণী মেড্‌টি পর্যন্ত লক্ষ্য করেছে যে সুপ্রিয়ার সান্নিধ্য সম্বন্ধে অতি সচেতন ব'লেই যেন নির্মল ওকে বাইরে বেশি ক'রে এড়িয়ে চলতে চায়।

একসঙ্গে থেকে এরকম ক'রে যে আর বেশিদিন চলতে পারে না তাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু উপায় কী?……সুপ্রিয়ার

অগোচরে অন্তর্যামী বোধ হয় ওর মনের কথা শুনলেন। কি একটা দরকারে ওকে একা রেখে রেণুর সঙ্গে অনুপম দোকানে যেতে নির্মলকে বাধ্য হ'য়ে কাছে আসতে হ'ল। কোনো কথা না ব'লে দুজনে খানিক দূরে এক ছায়াঘন কুঞ্জতলে দাঁড়াল ওদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। সুপ্রিয়া মনে মনে কী ভাবছিল। ভাবনা শেষ ক'রে স্থির মুখখানি তুলে বললে, "চলুন এখানে বসা যাক একটু। ওঁদের আসতে দেরী হবে।"

বসেই হঠাৎ বিনা ভূমিকায় সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি আর কতদিন আমাকে এমনি লজ্জা দেবেন সকলের সামনে ?"

এই অপ্রত্যাশিত কঠিন স্বরে ও ততোধিক কঠিন প্রশ্নে নির্মল একেবারে শুব্ধ হ'য়ে গেল। তা দেখেও সুপ্রিয়ার মন গল্‌ল না একটুও। ওর প্রতিদিনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিবেকের দংশন, ভবিষ্যতের জন্যে ভয়—এর কিছুই কি নির্মল বুঝতে পারে না ?

অনেকক্ষণ পরে আবার সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "উত্তর দিচ্ছেন না যে ?"

জবাব দিতে গিয়ে নির্মলের অধর কেঁপে উঠল, কষ্টে উচ্চারণ করলে, "কী বলব ?"

"কী বলব ? তাও আমাকে ব'লে দিতে হবে ? নির্মলবাবু, আপনি না পুরুষ মানুষ ? তবে মনের জোরের এত অভাব কেন ?"

আর্তকণ্ঠে নির্মল বললে, "আমি তোমাকে বিরক্ত করতে এসেছি আর কখনো—সেদিন থেকে ?"

"না, আসেননি। কিন্তু তাতে কী ? আপনি কি মনে করেন আর কেউ কিছুই বুঝতে পারেনি ?"

"ও, এই তোমার ভয় ? কিন্তু কেন ? লোকে যদি মন্দ কিছু দেখে, আমারই মধ্যে দেখবে, আমাকেই দোষ দেবে, তোমাকে তা স্পর্শ করবে কেন ?"

সুপ্রিয়া কী যেন বলতে গেল। উত্তেজিত নির্মল ওকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "মিনতি করছি তোমায়, আর কিছু বোলো না; কথা রাখো—আমার স্বপ্ন ভেঙে দিওনা। তোমার কাছে কিছুই চাইনে আমি, কেবল ভালোবাসতে দাও আমায়। তুমি কিছু বোঝ না কেন সুপ্রিয়া? বোঝ না কেন যে আমি আমারই বিরুদ্ধে রাতদিন কী ঘোর যুদ্ধই করছি! স্বভাবের স্বার্থপরতাকে ছাড়িয়ে যেতে, প্রবৃত্তির নীচের টানকে পিষে মারতে, তোমার প্রতিদান ছাড়াও তোমায় ভালোবাসতে শিখতে—"

"শুনতে চাইনা আমি, শুনতে চাই না ওসব—"

"কেন? শুনতেই হবে তোমায়। নইলে আমি বাঁচব কি ক'রে? সর্বনাশের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাব কিসের জোরে? এটুকুও না দিলে—"

"তুমি জানো না তুমি কী বলছ! জানো না তোমার প্রতি কথায়, প্রত্যেক দিনের ব্যবহারে, অন্যায়ের মাত্রা কতখানি বেড়ে যাচ্ছে! নিজেকে ছাড়া সংসারের আর কিছুই কি—" অদূরে অনুপমকে দেখে সুপ্রিয়া আত্মসংবরণ ক'রে উঠে দাঁড়াল।

"নিজেকে ছাড়া সংসারের আর কিছুই—কী? সুপ্রিয়া, ব'লে যাও—ব'লে যাও সবটুকু—"

"অপরের কথা ভেবে দেখেন না কেন একটুও? নির্মলবাবু, আপনার একলার জন্যে কি আমায় সংসারসুদ্ধ সবাইকে অসুখী করতে বলেন? আমার বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন, ধর্ম, আদর্শ—সবেতে কি জলাঞ্জলি দিতে বলেন?"

"ক্ষতি কি সুপ্রিয়া, ক্ষতি কী? একটি জীবনকে তোমার প্রেমের আলোয় ফুটিয়ে তোলবার জন্যে, ধ্বংসের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে—"

"ছি, ছি, আর বলবেন না। শুনলেও পাপ হয়।"

তীরবেগে উঠে দাঁড়িয়ে স্খলিত কণ্ঠে নির্মল বললে, "কী? কি বললে?"

সুপ্রিয়া তেমনিভাবে জবাব দিলে, "সব রকম দুর্বলতায় আমার চির-অশ্রদ্ধা"—ব'লে একবারও ফিরে না তাকিয়ে অন্য পথ ধ'রে রেণুর খোঁজে চ'লে গেল।

মিনিট কয়েক পরে সকলে যখন সেখানে ফিরে এলো তখন কেউ কোথাও নেই।

কেমব্রিজের '—' কলেজে সেবছর একটি নূতন ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। বাইরে থেকে মনে হ'ত স্বভাবখানি তার যেমনি নীরব তেমনি লাজুক। কোনোরকম খেলায় তাকে টানা যায় না, কোনো তর্ক-আলোচনায় যোগ দেওয়ানো সম্ভব হয় না; দেখে দেখে অন্য মেয়েরা হাল ছেড়ে দিয়েছে। কেবল দু'একজন সমবয়স্কা সখী মাঝে-মাঝে কাছে এসে গাল টিপে আদর ক'রে বলে, "এম্‌নি কনে-বউ গ'ড়ে ওঠবারই যদি সাধ ছিল, তবে এ ঠাণ্ডা দেশে মরতে এলি কেন ভাই? 'ব্রাইড্' তৈরী করবার পক্ষে ভারতের জলহাওয়াই কি যথেষ্ট নয়?"

মেরী ডাগ্‌লাস ফস্ ক'রে ব'লে উঠল, "Social Science না প'ড়ে বেছে বেছে ফিলজফিই বা নেওয়া কিসের জন্যে?"

জীন্ মারে দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, "জানো না? 'এ্যাপোলো' যা বলেন তা না ক'রে ওর উপায় আছে? এই দেখ না, আমরা হাজার ডাকলেও একবার আমাদের ঘরে কফি খেতে আসে না— নেহাত খুকী ব'লে আমরাও মাপ ক'রে যাই—কিন্তু আজকাল ফি শনি-রবিবারে ওঁর লর্ডের সঙ্গে বাইরে চা খেতে যাওয়া চাই, মায় দাঁড়টানা পর্যন্ত—"

"সত্যি ? কি সু—মিট্রা, উন্নতি হচ্ছে তা'হলে ? খোলা হাওয়ায় নদীর বুকের উপর প্রেমের চর্চা জমে খুব, কেমন ? যা-ই বলো ভাই, তোমার মতন অমন একটি fiancee পেলে—"

"আরে চুপ, কে কোথায় শুনে ফেলবে, শেষে উঠুক মিস্ হিগিন্সের কানে !····· ওই যে, বলতে না বলতে আসছে সৃপাই একজন। সু, ব'লে দিও না যেন, চকোলেট খাওয়াব—লক্ষ্মী মেয়ে !"

সুপ্রিয়া ক্ষীণভাবে একটু হাসল শুধু। বাস্তবিক, ওদের দোষ দেওয়া যায় না। এখানে সকলে যেমনভাবে চলেছে, তেমনি ক'রে না চললে অপরের অত্যধিক লক্ষ্যের বিষয় না হ'য়ে নিস্তার কই ? সুপ্রিয়ার ভারবাহী নিরানন্দ জীবনের ব্যথা ওরা বুঝবেই বা কেন ? অন্তর্যামী নয় তো !

আজ ছয় মাস হ'তে চলল ওরা কেমব্রিজে এসেছে। দিন পনের পরেই রেণু চ'লে গেছে লণ্ডনে, তার কিছুদিন পরে আয়ার্লণ্ডে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রোগ্রাম এমন ক'রে বদলানোর জন্যে দেশে ব'সে উমাশঙ্কর ব্যাপারখানা কী বুঝতে না পেরে ভয়ানক চিন্তিত হ'য়ে উঠেছিলেন। রেণু তাঁকে বুঝিয়েছে যে একেবারে প্রথম দিকেই লণ্ডনে থাকার চেয়ে এখন কেমব্রিজে ভর্তি হওয়াই সুপ্রিয়ার পক্ষে বেশি স্বাস্থ্যকর। তাছাড়া সেখানে অনুপম আছে এবং অন্তত একটি বছর থাকবে। ইতিমধ্যে রেণু ওর আয়ার্লণ্ডের কাজগুলো আগে শেষ ক'রে রাখবে। বাইরের সব কাজ সারা হ'লে সুপ্রিয়াকে আনিয়ে মিসেস লাডলোর বাড়িতে লণ্ডনে একসঙ্গে থাকা যাবে।

আর কেউ না জানলেও সুপ্রিয়ার বুঝতে দেরী হয়নি যে রেণুর অত তাড়াতাড়ি কেমব্রিজ থেকে চ'লে যাওয়ার আরো এক কারণ ছিল। তাই সেও তাকে বাধা দেয়নি। কিন্তু লণ্ডন থেকে সপ্তাহ তিনেক পরে রেণু যখন সত্যিই চ'লে গেল আয়ার্লণ্ডে, তখন ব্যথায় নিরাশায়

সুপ্রিয়ার বুকখানা যেন শতধা ভেঙে পড়বার উপক্রম হ'ল। যে নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুর সন্ধানের আশায় রেণু মিছামিছি তিনটি সপ্তাহ লণ্ডনের সমুদয় ভারতীয় ক্লাব, ইউনিয়ন আর এসোসিয়েশানে লাঞ্চ ও ডিনার খেয়ে, হরেক রকম ডিবেট্ ও বক্তৃতা শুনে, সখের অভিনয় দেখে দুপুরের পর দুপুর, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কাটিয়েছে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়ে থাকলে এত শীগ্‌গির যে সে লণ্ডন ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যেত না, একথা সুপ্রিয়াকে কারো চিঠি লিখে জানাবার আবশ্যক করে না। ওর মানসিক দুশ্চিন্তা ও সর্ববিষয়ে উৎসাহের একান্ত অভাব অবশেষে দেহের গ্লানিরূপে এমনভাবে বাইরে প্রকাশ পেল যে নিজের রিসার্চ ও ক্লাসের বন্দোবস্ত করার কাজে অতি ব্যস্ত অনুপমও তা লক্ষ্য না ক'রে পারল না। উদ্বিগ্ন হয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার শরীরটা কি ভালো নেই, মিনু? এদেশের জলবায়ু সহ্য হচ্ছে না?"

সুপ্রিয়া বিব্রত হ'য়ে বললে, "কেন, শরীর তো আমার খুবই ভালো আছে। তোমাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না, তুমি নিশ্চিন্তে নিজের কাজ ক'রে যাও।"

"কিন্তু—"

"কিন্তুর কিছুই নেই। বিদেশে এলে প্রথমটা নানারকম হয়ই। হাতে কাজ না থাকলে আরো বেশি খারাপ লাগে। পড়াশুনোয় মন বসলে একেবারে ভালো হ'য়ে যাবো দেখো।"

"রেণু থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম। অসুখবিসুখ হ'লে বলতে এতটুকু সঙ্কোচ কোরো না যেন। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? তাতে দুজনেরই উপকার হ'ত।"

"কী?"

"সকালে বিকালে কিংবা দু'বেলা না পারলে অন্তত একবেলা ক্যাম

নদীতে গিয়ে নৌকায় ক'রে বেড়ানো যাক চলো। আমার দাঁড়টানা অভ্যাস আছে জানো তো' তোমাকে হাল ধরতে শিখিয়ে দেব।"

"সে সময়টুকু তুমি থিসিসের কাজে দিতে পারতে। কেন মিথ্যে—"

"পাগল! একটুও বিশ্রাম আর ব্যায়াম না করলে দিনরাত প'ড়ে আর লিখে বাঁচতে পারে কেউ? এ-ই ঠিক রইল তাহ'লে? কাল আমি এসে নিয়ে যাবো। তুমি মিসেস হার্ডিংকে ব'লে রেখো।"

পরদিন ক্যামের ধারে গিয়ে সুপ্রিয়া হতাশ হ'য়ে ব'লে উঠল, "ওমা, এই তোমার নদী? একটা নালা না কি? এরই এত নাম?"

"এতটুকু দ্বীপের দেশের নদী আর কত বড় চাও? আমাদের গঙ্গা, যমুনা, মেঘনার মতো বড় বড় স্রোতস্বিনী হ'লে স্রোতের টানেই তো ইংরেজের 'হোম' যেত ভেসে। তবে তোমাকে দাঁড় টানতে শেখাবার পক্ষে নদীর চেয়ে নালাই ভালো।"

"দাঁড় টানতে শেখাবে? বাঃ, কাল যে বললে শুধু হাল ধরতে—"

"হালও ধরবে, দাঁড়ও টানবে। এসো, নৌকায় উঠে এসো।··· কাপড়টা আর একটু উঁচু ক'রে পরো এখন থেকে। এদেশে এসে কি আর আ-ভূমিলম্বিত শাড়ী প'রে আর গজেন্দ্রগমনে চলাফেরা ক'রে পারবে মিনু? একটু মডার্ণ হ'তে শেখ দেখি। ঐ দেখ, ও মেয়েটি কেমন চমৎকার দাঁড় টানছে, বাঃ! তোমাকেও ওদের মতো হ'তে হবে; পরের ভালোটাই নিতে না পারলে পরদেশে আসা কেন? নাও, এই এমনি ক'রে—"

"না অনুদা, পায়ে পড়ি তোমার। ওদের মতো হ'তে পারব কেন আমি!"

"খুব পারবে। ওদের থেকেও বড় হ'তে হবে আমাদের। দরকার হ'লে দেশের জন্যে মেয়েদের যুদ্ধও শিখতে হবে।"

সুপ্রিয়া আশ্চর্য হ'য়ে অনুপমের মুখের দিকে তাকাল। কই, ঠাট্টা বিদ্রূপের আভাসও তো নেই তাতে। দেশের কথা নিয়ে অনুপম কি ভুলেও পরিহাস করবে?

অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড় টেনে বহুদূরে গিয়ে একটি গাছের গুঁড়িতে নৌকা বেঁধে তীরে উঠে অনুপম ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল।

সুপ্রিয়া বললে, "কী চমৎকার ঘাস এদেশের! যেমন সবুজ তেমনি নরম, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।"

"হাঁ। তুমিও বসতে চাও তো উঠে এসো।"

"না, এখানেই বেশ আছি।"

সুপ্রিয়া জলে আঙুল ডুবিয়ে শৈত্য পরীক্ষা ক'রে দেখলে। তারপর বহুক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বলল না। ইংলণ্ডের এই নিস্তব্ধ পল্লী-দৃশ্যের শান্তিময় ছায়ায় ব'সে একটু একটু ক'রে সুপ্রিয়ার হৃদয়ের তাপ যেন জুড়িয়ে আসতে লাগল। অনেকদিন পরে তাই ও অনুপমের দিকে ভালো ক'রে একবার চেয়ে দেখলে। বাস্তবিক, এরকম সুপুরুষ সুপ্রিয়া কমই দেখেছে। কী উজ্জ্বল উন্নত ললাট! নিমীলিত আঁখির উপর কোমলভাবে শায়িত পক্ষ্মরাজি কী ঘন!...শুধু কি রূপে! গুণেও অনুপমের সমকক্ষ পুরুষ এপর্যন্ত সুপ্রিয়া আর কোথায় দেখেছে! তবু কেন—ভবিষ্যতে ওর সঙ্গে বিয়ের কল্পনায়ও—মন এমন দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে? কেন মনে হয় আজকাল—এই আমরা বেশ আছি! এর থেকে বেশি কিছু ঘটলে সুপ্রিয়া যেন নিজেকে আর খুঁজে পাবে না, মার্জনা করতে পারবে না এ জীবনে।...

নিশ্বাস ফেলে সে দূরে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে। ডরোথী রায়ান কি তবে ঠিকই বলেছিল? যেখানে, যে সমাজে

পিতা-মাতা স্বয়ং দেখে-শুনে অল্পবয়সেই ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়, সেখানে আর যা-ই হোক, অনর্থক সন্দেহ আর দ্বিধার দোলায় এমনি ক'রে দুলতে হয় কি ?···যা কিছু আসে, তাকেই বাজিয়ে যাচাই ক'রে নেবার প্রবৃত্তি সুপ্রিয়ার জন্মগত ; শুধু স্বামী-বরণ করবার বেলায় ও সেটাকে প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু কপালদোষে হঠাৎ সবই হ'য়ে গেল উল্টো। ছোটবেলা থেকে সুপ্রিয়া যাকে স্বামী ব'লে জেনে এসেছে, যার সম্বন্ধে ওর অথবা গুরুজনদের এতটুকু অমত বা আপত্তি ছিল না, শেষমুহূর্তে সে নিজেই হঠাৎ এমন বেঁকে দাঁড়াল যে, অপমানের অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আঘাতের সঙ্গে বাড়ির লোকের এবং দূরস্থিত আত্মীয়-পরিজনের সদম্ভ আক্রোশ ও অন্যত্র বিয়ে দেবার চেষ্টা হতবুদ্ধি সুপ্রিয়াকে মুহূর্তে জানিয়ে দিল যে এতদিন ওর যে ধারণাই থাকুক না কেন, অনুপমের সঙ্গে সত্যিই বিয়ে ওর এখনো হয়নি। ইউরোপে আসবার জন্যে সাহস ক'রে বাবাকে ধ'রে না বসলে সে-সময় অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে যেতই। সুপ্রিয়ার বিশ্বাস ছিল সতী ব'লে ভগবান ওকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন ; সে জন্যে ভগবানের প্রতি এতদিন কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না। উমাশঙ্কর এত শীগ্‌গির, এমন সহজে ওকে বিলেত পাঠাতে রাজি হবেন তাই বা কে জানত ? মেয়ের জন্যে কোন্ বাঙালী পিতা এতটা করে ?··

এ সকল ঘটনায় সুপ্রিয়া ভগবানের হাত যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল। তাই রেণুর সাভিমান অবিশ্বাস আর ওর বাবার অতিরিক্ত চিন্তাপ্রবণ মনের ক্লান্ত ঔদাসীন্য সুপ্রিয়ার চিত্তকে রীতিমত পীড়িত করে তুলত। সে কথাও সে তাঁদের কাছে কখনো গোপন করেনি। সকল বিষয়ে ওর চিন্তার স্বাধীনতা দেখে উমাশঙ্কর মাঝে মাঝে বলতেন, 'মা, আমার মনে হয় তুই সে-টাইপের মেয়ে, যারা অপরের idea-র চাপে থেকে কখনো সুখী হ'তে পারে না। বিয়ে

ক'রে তোর কাজ নেই মিনু। থাক্ আমার কাছেই। সেই ছোট-বেলাকার মতো বুকে ক'রে রাখব।'

সুপ্রিয়া হেসে জবাব দিত, 'বেশ তো বাবা। অশোকের মেয়ে সঙ্ঘমিত্রার মতন তুমি নিজের হাতে আমাকে কোনো মহৎ ব্রতে দীক্ষা দাও। আমি আজীবন সেই কাজ নিয়েই থাকব।'

উমাশঙ্কর দূরে একটি তারার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'তোর ঠাকুমা আমার অমতে জোর ক'রে কোন্ এক সন্ন্যেসীকে দিয়ে এক বিরাট কোষ্ঠী তৈরী করিয়েছিলেন তোর। তাতে লেখা ছিল—'

'কী বাবা? থামলে কেন, বলো না?'

'তুই নাকি বিবাহিত জীবনে ভয়ানক অসুখী হবি।'

সুপ্রিয়ার মুখ ম্লান হ'য়ে গেল। উমাশঙ্কর না দেখেও তা বুঝতে পারলেন। তাই পরক্ষণে বললেন, 'ওসব গণনা-টননায় আমি মোটে বিশ্বাস করি না। সব বুজরুকী বৈ তো নয়।'

সুপ্রিয়া তৎক্ষণাৎ মনের ভাব দমন ক'রে উৎসুক হ'য়ে বললে, 'কোথায় সে কোষ্ঠী, বাবা? আমি দেখব একবার?'

'পুড়িয়ে ফেলেছি।'···

পুড়িয়ে ফেলে কাগজের অপ্রিয় লিখন চোখে দেখার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। কিন্তু কপালের লিখন? কোন্ পাবকে দগ্ধ করলে এ জীবনে আর কার্যকরী হবে না?

"সুপ্রিয়া!"

সুপ্রিয়া ভয়ানক চমকে উঠল। অনুপম চোখের কোণ দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ও কি?"

মহা লজ্জিত হ'য়ে সে চোখ মুছে ফেলে বললে, "কোথায় কি? কী যে বলো তুমি—"

"আমি অনেকক্ষণ থেকে দেখছি মন যেন তোমার এখানে নেই। কি ভাবছিলে?"

সুপ্রিয়া বিব্রত হ'য়ে চুপ করে রইল। উঠে বসে অনুপম জিজ্ঞাসা করলে, "মন কেমন করছে বাড়ির জন্যে?···কি হয়েছে বলবে না?"

ওর সাদর কণ্ঠস্বরে সুপ্রিয়ার চোখের জল আর বাধা মানল না। অনেকক্ষণ ধ'রে কেঁদে এতদিনকার অবরুদ্ধ বেদনাকে অশ্রুর আকারে মুক্তি দিয়ে শান্ত হ'য়ে সে নৌকা থেকে তীরে উঠে এলো। কাছে বসে অনুপমের পায়ের উপর একখানা হাত রেখে ধীরে ধীরে বললে, "আমি সব সহ্য করতে পারি, কেবল নিজের বা পরের মাঝে কোনোরকম কপটতা সইতে পারি না।"

অনুপম নিঃশব্দে চেয়ে রইল। সুপ্রিয়া প্রবল চেষ্টায় সকল দ্বিধা কাটিয়ে যথাসাধ্য শান্তভাবে আবার বললে, "আমার মনে যা যা হয়েছে সে সবই তোমাকে ব'লে নিজের মধ্যে সহজ হ'তে চাই।"

পায়ের উপর থেকে ওর হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে অনুপম উত্তর করলে, "বললে যদি তোমার মন শান্ত হয়—"

"মন শান্ত না হ'লেও বলতে হবে, অনুদা। বলেছি তো মিথ্যাচার আমার অসহ্য।"

"কিন্তু তা তো তুমি কখনো কারো সঙ্গেই করবে না, মিনু। যতদূর জানি কখনো করোওনি।"

সুপ্রিয়ার চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল। হাত তুলে মুছে ফেলে বললে, "আমার আগের জীবনকে কিছুতেই আর তেমন ক'রে মনের মধ্যে মেনে নিতে পারছি না। কাউকে ব'লে যে শান্তি পাব সে আশাও নেই।"

"ঠিক কী হয়েছে না জানলে কেমন ক'রে—"

উত্তরে সুপ্রিয়া শুধু মাথা নাড়লে। ক্রমাগত মুছে মুছে চোখ দুটিকে সে ঘোরতর রক্তবর্ণ ক'রে তুলেছে।

অনেকক্ষণ পরে অনুপম আস্তে আস্তে বললে, "তুমি যখন এতটুকুটি, সেই তখন থেকে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অনেক ভাবনাই আমাকে ভাবতে হয়েছে, মিনু। সাধ ক'রে তোমার অনেক ভার নিজের কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছি।"

সুপ্রিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগ সংবরণ করতে না পেরে পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ে কেঁদে বললে, "তবে কেন শেষ ভারটুকুও নিতে এত আপত্তি করলে? তা হ'লে তো আজ—"

ওর স্তব্ধ অসমাপ্ত কথার ইঙ্গিতে অনুপমের মনে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। মিনিট দুই স্থিরভাবে বসে থেকে, হাত দিয়ে মাথাটা একটুখানি নেড়ে দিয়ে ডেকে বললে, "মিনু, উঠে বসো। কেউ দেখতে পেলে কী ভাববে!"

সুপ্রিয়া উঠল না। পা দু'খানি আরো শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধ'রে তেমনিভাবে প'ড়ে রইল।

একটুখানি বিষণ্ণ হেসে অনুপম বললে, "এমন ক'রে পায়ের ওপর মাথা খুঁড়লেই কি সমস্যার সমাধান হবে? কই দেখি, তোমার মুখখানা দেখতে দাও আমায়।"

সুপ্রিয়া তবু নড়ল না। তেমনি নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।··

সেদিন মুক্ত আকাশের নীচে সেই দুই স্তব্ধ মূর্তিকে ঘিরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার নেমে এলো।···

জীন্ আর মেরী চ'লে যাবার পর সুপ্রিয়া বসে বসে সেদিনের কথাই ভাবছিল। এ নিয়ে অনুপমের সঙ্গে আর কোনো আলোচনাই হয় নি। সেও নিজে থেকে কিছুই বলে নি।

মাসখানেক পরে একদিন সকাল বেলা অনুপম এসে সুপ্রিয়াকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। ক্যামের ধারে কাছাকাছি একটি উইলো গাছের ছায়ায় বসে ওর হাতে একখানি খোলা চিঠি দিল। লণ্ডন থেকে কোনো বন্ধু লিখেছে নির্মল বসু সম্প্রতি এখানেই আছে, মাঝে মাঝে Y. M. C. A-তে আর ব্রিটিশ মিউজিয়মে দেখা হয়, কিন্তু বাড়ির ঠিকানা জানা নেই, ব্যাঙ্কের ঠিকানাই শুধু দেওয়া গেল।...... চিঠিখানা সুপ্রিয়ার হাত থেকে খ'সে পড়ল। আরক্তমুখে জলের দিকে তাকিয়ে সে চুপ ক'রে বসে আছে দেখে একটুখানি অপেক্ষা ক'রে অবশেষে অনুপম জিজ্ঞাসা করলে, "তাহ'লে ব্যাঙ্কের ঠিকানায়ই চিঠি লিখে দিই একখানা, কেমন?"

কোনো উত্তর না পেয়ে আবার বললে, "তাহ'লে এই তো ঠিক? আজই লিখে দিই—"

"না।"

আশ্চর্য হ'য়ে অনুপম ফিরে তাকাল।

ওর ম্লান মুখখানা পলকের জন্যে একবার দেখে নিয়ে সুপ্রিয়া নতমুখে স্থিরকণ্ঠে আবার বললে, "না।"

বহুক্ষণ কেহ কোনো কথা বলল না!

পরে অনুপম একটু হাসলে, "তোমার মনের কথা আমি যে বুঝিনি তা নয়, কিন্তু মিনু, আমিই কি অতটা স্বার্থপর হ'তে পারব?"

তবু সুপ্রিয়া উত্তর দিল না দেখে আগেকার মতো সস্নেহ কোমল-কণ্ঠে বললে, "এ বিদেশে তোমার একজন বড় ভাই থাকলে যা করত, ভাবো না কেন যে আমি শুধু তা-ই করেছি। ভুলে যাও না যে তোমার সঙ্গে আমার আর কখনো অন্য সম্পর্ক ছিল বা সেরকম একটা কথা উঠেছিল!"

এবার সুপ্রিয়া উত্তর দিলে, "কেন মিছে কতগুলো বাজে কথা বলছ? ওঁকে চিঠি লিখে বা এখানে ডেকে কি হবে শুনি?" তারপর সজল চোখ দু'টি অনুপমের মুখের উপর তুলে ধ'রে বললে; "তুমি সব বুঝেছ, কেবল আমার সমস্যাটাই বোঝনি। আমার পক্ষে কি তোমায় ছেড়ে দূরে যাওয়া সহজ, অনুদা? তা যদি হ'ত, তবে সে কথা কাউকে ব'লে দিতে হবে কেন?"

"একটা শিশুও তো নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বুঝতে পারে, সুপ্রিয়া।"

"আমি তারও অধম, কিছুই বুঝতে পারছি না নিজেকে। তাই ব'লে কি তুমি আমায় বিপদের মুখে, একটা অনিশ্চিতের মধ্যে জোর ক'রে ঠেলে দেবে?"

শুনে অনুপমের মুখ পাংশু হ'য়ে গেল, "আমি জোর ক'রে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেব তোমায়!"

"তাই তো করছ তুমি। সেদিন থেকে মনে মনে যে এত মতলব এঁটে রেখেছ, ভিতরে ভিতরে যে এত সন্ধান নিয়েছ—তার কিছুই কি বলেছ আমায়?"

"সুপ্রিয়া, যারা জানে যে নিজের আর পরের হাত থেকে বালিকা বয়সে তোমায় বাঁচাবার জন্যে, তোমার আদর্শ-অন্বেষু মনকে স্বাধীন-ভাবে গ'ড়ে উঠবার, তোমার মহৎ প্রাণকে বহুলোকের মঙ্গলের জন্যে উৎসর্গ করতে সুযোগ দেবার জন্যেই বহুবার দু'বাড়ির লোকেরই পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও শীগ্‌গির বিয়েতে মত দিই নি, আজ নয় কাল নয় ক'রে কেবল দিন পিছিয়ে দিয়েছি, ঘুণাক্ষরে জ্যাঠামশায়কে পর্যন্ত আমার মতলব বুঝতে দিই নি পাছে নানা কারণে বাধ্য হ'য়ে তোমার অন্যত্র বিয়ে দেন, তারাই বুঝবে তোমায় বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া আমার পক্ষে ভারি সুখের বিষয় কিনা! তবে, তুমি আজকাল একথা বলতে পারো বটে!"

অভিমানে সুপ্রিয়া কেঁদে ফেললে, "কিন্তু বারবার অমত ক'রে ফলটা কী হয়েছিল? ওঁরা তো এই সেদিনও অন্য জায়গায় বিয়ের যোগাড় করেছিলেন।"

"করেছিলেন। কিন্তু তখন আমি যা চেয়েছিলাম ঠিক তাই তো হ'ল।"

চোখের জলের ভিতর দিয়ে সুপ্রিয়া অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল, "অর্থাৎ তুমি জানতে যে আমি—"

"আমি জানতাম যে তোমার স্বাধীন মতামত গ'ড়ে উঠেছে। উনিশ বছরের মস্ত মেয়েকে তার অমতে কোনো বাপ-মা জোর ক'রে বিয়ে দিতে চায় না।"

খানিক চুপ ক'রে থেকে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "বেশ, তবে এখন কেন—"

এতক্ষণে অনুপমের মুখে হাসি ফুটল, "রেণু ঠিকই বলেছিল। বয়সের সঙ্গে তোমার ছেলেমানুষি কমেনি। কিংবা হয়ত নিজেকে বুঝতে পারছ না মোটেই—একটু আগে নিজেই যা বলছিলে। সে যাক, এখন বলো দেখি নির্মল সে রাত্রে অমন হঠাৎ কাউকে কিছু না ব'লে চ'লে গেল কেন? এ সময় লজ্জা কোরো না।"

সুপ্রিয়া হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারল না। অনুপম নিজের মনে আবার বলতে লাগল, "পারিসে সে রাতটা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। এগারোটা বাজতে তোমরা চ'লে গেলে শুতে। বসবার ঘরে ওর খাবার নিয়ে আমি একলা জেগে বসে রইলাম। বসে বসে পিঠ ব্যথা হ'য়ে গেল। মাঝে মাঝে রেণু এসে দেখে যেতে লাগল। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি বলতে পারো? গাড়ী-টাড়ী চাপা পড়েনি তো?'—সে মাথা নেড়ে বললে, 'না'—তবে কী? —রেণু বললে, 'সন্ধ্যার সময় ওর ঘরে গিয়ে দেখলাম ভয়ানক মন খারাপ ক'রে শুয়ে আছে। গোটা দুই প্রশ্ন করবার পর কি হয়েছে

বুঝে ধাঁ ক'রে একটা কথা ব'লে ফেললাম। তখন থেকে নিরুদ্দেশ। দোষ আমারই।'......আমি অতশত ভেবে দেখিনি তখন। রেণু ওকে কি বলেছিল তা জিজ্ঞাসা করবার কথাও মাথায় আসেনি। কিন্তু সে দিন এখানে নদীর ধার থেকে ফিরে যাবার পর ভেবে মনে পড়ল, লুক্সেম্‌বর্গ গার্ডেন থেকে ফিরবার পরই নির্মল মন খারাপ ক'রে ঘরে গিয়ে শুয়ে ছিল। শুধু তা নয়, ফিরবার সময়ও ওকে আমরা খুঁজে পাইনি। মনে আছে তাতে রেণু বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছিল, আমি হয়েছিলাম বিরক্ত, কিন্তু তুমি একেবারে চুপ ক'রে ছিলে।......এখন বলতে পারো সুপ্রিয়া, তোমার সঙ্গে সে দিন ওর কী কথা হয়েছিল যা শুনে ও সবাইকে ফেলে হোটেলে একলা চ'লে এলো?"

তবু সুপ্রিয়া নিরুত্তর।

অনুপম একটুখানি হেসে বললে "তুমি না বললেও আমি বুঝেছি। কিন্তু মিনু, প্রেম আগে, না কর্তব্য আগে, ধীরে-সুস্থে ভেবে-চিন্তে সেইটে ঠিক করা আর সেভাবে সবদিক মানিয়ে চলা কি আর্টিস্টদের পোষায়? ওদের কাছে তুমি ওদের স্বভাবের উল্টো জিনিষ আশা করলে কী ক'রে—আমি তো ভেবে পাই নে।"

সুপ্রিয়ার চোখের জল নিঃশব্দে পড়ে ঝ'রে।......

সেদিকে চেয়ে চেয়ে অনুপমের নিজের কষ্ট যত বড়ই হোক, এবারেও কণ্ঠস্বরে তার লেশমাত্র প্রকাশ পেতে দিল না, "পারিসে সেঈন নদীর ধারে তুমি বলেছিলে যে জীবনের কিছুই তোমার ভালো লাগছে না, কিন্তু কেন, তাও জানো না। সেদিন আরো ভেবে দেখলাম দেশে থাকতে তুমি এত অসুখী ছিলে না। স্টীমারেই তোমার মন বেশি অশান্ত হ'য়ে উঠেছে। প্রথম থেকে নিজের অজ্ঞাতেই তুমি নির্মলকে—"

"মিথ্যে কথা। স্টীমারে শেষ দিন পর্যন্ত—"

"টের পাওনি। তোমার মতন মেয়েরা সহজে টের পায়ও না। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়। যখন দেখে, তখন ব্যাপার অনেক দূর অগ্রসর হ'য়ে গেছে।"

সুপ্রিয়া সতেজে প্রতিবাদ করলে, "কিন্তু দেশে থাকতেই, প্রায় ষোলো সতের বছর বয়েস থেকেই যে একটু একটু ক'রে সুরু হয়েছে আমার মনের অশান্তি। সে কথা বাবা জানেন। আর কাউকে বলিনি আমি। শুধু স্টীমারে প্রথম রেণুদি আর—"

"নির্মলকে বলেছ তো? তাতেই বোঝো ভিতরে ভিতরে তুমি ওকে কতখানি আপন ভেবেছিলে।" অনুপমের মুখ ক্রমশ অধিকতর ম্লান হ'য়ে আসে, "মেয়েরা যখন যাকে ভালোবাসে, তখন তারই ভাব আর আদর্শের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে নেয়। তাই অল্পদিনের মধ্যেই দেশের কথা আর তোমার মনে ধরেনি। দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেও আর ভালো লাগেনি।"

ওর মুখের ভাবখানি আবার পলকে দেখে নিয়ে সুপ্রিয়া দৃঢ় ভাবে উত্তর দিল, "অবিচার করলে, অনুদা। তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না।"

"অবিশ্বাসের কথা তো নয় মিনু, তুমিই নিজেকে বুঝতে পারছ না।"

"তোমার কথার মানে কী দাঁড়ায় জানো?—মেয়েদের নিজের কোনো স্বাধীন সত্তা, কোনো স্বাধীন প্রকাশ-ভঙ্গি, অন্তরের নিজস্ব আকৃতি নেই। শ্রদ্ধাস্পদ পুরুষের চিন্তার ছাঁচেই গ'ড়ে ওঠে তার সমস্ত মনোবৃত্তি! এই না?"

"অনেকটা তাই বই কি। যাকে ভালোবাসো, তার ভাব-সমুদয় তোমাতে যথাসম্ভব প্রতিফলিত হ'তে বাধ্য।"

"বাবাকে কি কম ভালোবাসি? রেণুদিকে?"

"এসব কূটতর্কে কোনো ফল নেই সুপ্রিয়া, তাতে তর্কই শুধু বেড়ে যাবে, মীমাংসা আর হবে না।"

অনুপমের মনের মধ্যে একটি কথা কেবলই উঁকি দেয় : সুপ্রিয়া ভুলেও একবার অস্বীকার করেনি যে নির্মলকে সে ভালোবাসে! এত কথার প্রতিবাদ করেছে কিন্তু ওটির একবারও না।

নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "যাক। ঐ পুলটা পার হ'য়ে মাঠের দিকে যাই চলো।"

পুল পার হ'তে হ'তে হঠাৎ অকারণে খুসী হ'য়ে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "Cam-এর উপর bridge, এ জন্যেই কি Cambridge নাম হয়েছে, অনুদা?"

"কি জানি।"

"তুমি কি আমার উপর রাগ করলে তর্ক করলাম বলে?"

"না। কিন্তু এখন কি করবে ঠিক করেছ?"

"তুমি ব'লে দাও।"

"সে হয় না। যা করবে নিজেই ভেবে ঠিক করবে।"

"তুমি সব জেনেছ—ওতেই আমার মনের ভার ক'মে গেছে। এর বেশি আর ভাবতে চাইনে এখন।"

"তাতে তোমার ক্ষতি না হ'লেও আর একজনের কথা ভেবে দেখেছ কি?" অনুপম অন্যদিকে তাকিয়ে বললে, "নির্মল—"

বাধা দিয়ে সুপ্রিয়া উত্তর করলে, "অন্তত একটি বিষয়ে আমার মন স্থির। পড়তে এসেছি, পড়ে যত শীগ্‌গির সম্ভব দেশে ফিরে যাবো, আর কারোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আমার।"

"ভালো, এই তো শুনতে চাই আমি। স্বপ্নেও ভেবো না যে অন্য প্ররোচনা দিতে যাবো তোমায়। এই সঙ্গে তুমিও শুনলে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হবে যে আমি আমার নিজের জন্যে তোমায় চাইনি কখনো,

চেয়েছি শুধু দেশের জন্যে। আর শুধু সেজন্যে—তুমি আমায় যতই নিষ্ঠুর, যতই নির্লজ্জ ভাবো না কেন—বারবার তোমায় চাইতে, বারবার অন্য যে কোনো পথে চ'লে যাওয়া থেকে বিরত করতে কুণ্ঠিত হব না। সুপ্রিয়া, বিয়ে করলে মাত্র দুটি প্রাণী সুখী হয়; আত্মদানে কিন্তু সে রকম লক্ষ লক্ষ প্রাণীর সুখের পথ খুলে দিতে পারবে। তোমার মধ্যে সে শক্তি আছে। তা জানি ব'লেই বলছি, ভোগের পথ তোমার নয়, তোমার পথ ত্যাগের। নইলে আজই বলতাম—যাও তুমি আর দশজনেরই মতো দেশের ভার বৃদ্ধি করো গিয়ে, খাওয়া-পরা আর বিয়ের বেশি যারা ভাবতে পারে না, তাদের আর কী বলা যায়?"

শুনতে শুনতে আগেকার দিনের উদ্দীপনা সুপ্রিয়ার প্রাণে আবার যেন নূতন ক'রে ফিরে আসে।

ওর আগ্রহে উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে অনুপম স্পষ্ট প্রশ্ন ক'রে বসল, "যাবে এখন আমার সঙ্গে দু'একটি সভাসমিতিতে? সামনের ছুটিতে আরো অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে। ইতিমধ্যে এখানে যারা আছে আগে তাদের সঙ্গে যথাসাধ্য পরিচয় ক'রে নেওয়া ভালো।"

সুপ্রিয়া নিরুত্তরে সায় দেয়।···শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় মন তখন ওর ভরপূর। সব জেনেও অনুপম যে ওর উপর রাগ করেনি, এখনও যে সে তাকে সংসারের সাধারণ দশজনের থেকে বড় ক'রেই দেখে, যখন ওকে চায় তখন যে নিজেরই সুখ বা স্বার্থের জন্যে চায় না—চায় বহু মানবের হিতার্থে, এতে সুপ্রিয়ার হৃদয় আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষায় কাণায় কাণায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

* * *

মাস দুই না যেতে মিস মিত্রের নাম, কেমব্রিজের ভারতীয় মহলে সকলের মুখে মুখে। ছেলেদের সঙ্গে তাদেরই একজন হ'য়ে নিঃসঙ্কোচে

মিশতে এমন আর কেউ পারে না। দেশের দুর্ভিক্ষ ও বন্যার সময় চাঁদা তুলতে, প্রতি মিটিং-এ ছাত্র-সঙ্ঘের দরজার গোড়ায় ঠিক সময় মতো হাজির হ'তে ওর জুড়ি নেই। ইংরেজ-বান্ধবী জীন আর মেরীর দেওয়া সু-মিট্রা নামের ঈষৎ রূপান্তর ক'রে অনুপমের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ওকে নিজেদের মধ্যে সুমিত্র বলে ডাকে। সেই নামই দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল সকলের মাঝে।

বলা বাহুল্য, এত বাড়াবাড়িতে কেউ খুসি হ'ল না—না ওর প্রফেসর, না মহিলা বন্ধুরা—না ভারতীয় বা ইউরোপীয়—কেউ না। সুবিধা পেলেই সেকথা ওরা ওকে বুঝিয়ে দেয়, কিন্তু সুপ্রিয়া একবার যা নিজের কাজ ব'লে মনে মনে গ্রহণ করেছে, তার থেকে ওকে থামায় কে?

মাঝে মাঝে ওর সন্দেহ হয় যে ওদের এই পনরদিন অন্তর মিটিং, প্রতিমাসে অন্তত একটিবার ক'রে টি-পার্টি বা ডিনারপার্টি, আলোচনা-সমালোচনা-সভা ইত্যাদিতে দেশের স্বাধীনতা কতদূর এগিয়ে যাচ্ছে? কিন্তু অনুপমের ধীর অটল মুখের ও তেমনি অটল আদর্শের দিকে তাকিয়ে কোনোরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা উত্থাপন করতেও আজকাল ওর লজ্জা বোধ হয়। তাই মনে মনে নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা যতই বেড়ে যায়, ততই সে প্রাণপণে অপরের উপর নির্ভর ক'রে বাঁচে। অনুপমই ওর বল, অনুপমই ওর ভরসা। সে যখন বলে "দেখ মিনু, আর কিছু না হোক, অন্তত উচ্চ চিন্তা ও খাঁটি বন্ধুত্বের বন্ধনে যদি আমরা জনকয়েক ভারতীয় এক হ'তে পারি এবিদেশে, সেটাই কি কম লাভ? স্বদেশে এ-সুবিধাটুকুও পাওয়া কত শক্ত তা একবার মনে ক'রে দেখ। তাছাড়া এরা এখানে ভারতের নানা প্রদেশের লোক। ভবিষ্যতে কার সাহায্য যে দরকার হ'তে পারে, কে যে কী হবে—তা কি বলা যায়?"

এতক্ষণ সুপ্রিয়া বেশ মন দিয়ে শুনছিল। অনুপমের গোড়াকার

কথাগুলোতে ওর হৃদয় সম্পূর্ণ সায় দিয়েছিল, কিন্তু শেষের যুক্তিগুলো শুনে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত তিক্তকণ্ঠে ব'লে উঠল, "বেশ বলা যায় কে কী হবে ভবিষ্যতে। বড় জোর এক একজন আই-সি-এস্ বা আই-ঈ-এস্। তার বেশি কিছু নয়। তুমি বুঝি মনে করেছ যে অরবিন্দ ঘোষ, মহাত্মা গান্ধী বা চিত্তরঞ্জন পথে ঘাটে জন্মায়?"

অনুপম অবাক হ'য়ে গেল, "তোমার মুখে এরকম কথা শুনব আশা করিনি। নিজের দেশের লোকদের তুমি এত—"

"মন্দ ভাবি? মোটেই না। কিন্তু তুমিও দয়া ক'রে চোখ-কান দুইই একটু খুলে রেখো অনুদা।"

"ছাত্র-গান্ধীকে দেখে তখন কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিল যে ইনিই একদিন এক বিশাল দেশের জনপ্রিয় নায়ক, সাধুচরিত্র মহাত্মাতে পরিণত হবেন? বাঙালী হ'য়েও বাঙলা-অক্ষর-পরিচয়-হীন অরবিন্দকেই বা কে স্বদেশীযুগের নেতা হিসাবে কল্পনা করতে পেরেছিল? কার ভিতর কী লুকিয়ে আছে না জেনে এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা ভারি অন্যায়।"

"স্বীকার করছি আমরা কেউই অন্তর্যামী নই। কিন্তু গান্ধীজি নিজের মুখেই কি কবুল করেননি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কেমন ক'রে কী ভয়ানক প্রলোভনের গ্রাস থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে এসেছিলেন? সেটা কি কম শক্তির পরিচয়? কিন্তু তোমার বন্ধুরা—না, থাক। তুমি যদি নিজে দেখতে না চাও, আমি জোর ক'রে দেখাতে যাবো কেন? ছাত্রাবস্থায় অরবিন্দের বাঙলা বর্ণজ্ঞানের অভাব যতই বা যার দোষেই হোক তা নিয়ে তিনি কতখানি গর্ব বোধ করতেন, আমার জানা নেই। কিন্তু সেদিন নিজের কানেই শুনলাম তোমাদের বাঙালী দলপতিদের একজন এত বয়স অবধি মাতৃভাষায় তাঁর মোটে অক্ষর-পরিচয় না থাকার কথাটা বেশ গর্বের সহিত জোর

গলায় জাহির করছেন, যেহেতু তিনি নিজে না বললে আমরা কেউ ভাবতেই পারতাম না যে তিনি বাঙলায় চিঠি লিখতে পারেন না, কারণ বাঙলায় কথা বলেন তিনি চমৎকার। ভদ্রলোক অক্সফোর্ডের '—' কলেজের ছাত্র, তোমাদের নিমন্ত্রণ পেয়ে ডিবেট্‌-এ যোগ দিতে এসেছিলেন।"

"চিনেছি!"

"ভেবো না যে, আমি মিছামিছি লোকের খুঁত ধরতে ভালোবাসি বলেই এসব বলছি। তুমি সব আগে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের উপরই জোর দাও কিনা, তাই শুধু একটু দেখাতে চাই যে মিটিং-এ বা পার্টিতে সকলেই তোমার মতো একটি মাত্র উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আসে না। কার ভিতর কী আছে টের পাওয়া সহজ তো নয়ই। ডি দত্ত— যার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না—সে যে স্পাই, আগে কে জানত বলো? সেদিন লণ্ডনের '—' সভায় নিয়ে গেলে। আধ ঘণ্টার বেশি কেউ সিরিয়াস্‌ বুক্‌নি শুনতেই চাইলে না! 'এবার খাবার আসুক, খাবার আনা হোক, বক্তৃতা থামাও' ব'লে সে কী চেঁচামেচি! যতক্ষণ না খাবার আনতে দেওয়া হ'ল, মেজেতে পা ঘ'ষে আর শিস্‌ দিয়ে, যখন তখন আলো নিবিয়ে বাধা দিয়ে প্রশান্তর প্রবন্ধখানা শেষ পর্যন্ত শুনতেই দিলে না। সেখানে আমরা অনেকগুলি মেয়েও ছিলাম, তোমার ফরাসী বান্ধবী এস্তেল ছিল—ছেলেমেয়েদের মিশ্রিত সভায় বারবার আচমকা আলো নিবিয়ে দেওয়া যে ভদ্রতার পরিচয় নয় একটুও, তাও কি ছেলেরা শেখেনি এতদিনেও? অথচ এরাই তো দেশে গিয়ে হবে মহামান্য বিলেত-ফেরতার দল, নেবে কেড়ে সরকারের বড় বড় চাকরী—বড় বড় সুপারিশের জোরে! অমিয় দাঁড়িয়ে উঠে আপত্তি করতে সাহস করল ব'লে সবাই ষড়যন্ত্র ক'রে মিছে বদনাম দিয়ে পরের মাসেই ওর কোষাধ্যক্ষের কাজ নিল

কেড়ে। আরো কত বলব অনুদা? দুঃখে মনের ভিতরটা জ্বলে যায়। তখন এক একজনের ভণ্ডামির মুখোস পড়ে খ'সে—যখন দেখি—"

"কিন্তু মিনু—"

"ইস্টারের ছুটিতে '—'এ নিয়ে গেলে। দেশের দুর্ভিক্ষ আর এখানকার ভারতীয় গরীব ছাত্রদের সাহায্য-ফণ্ডের জন্যে চাঁদা চাওয়া হ'ল। ছেলেদের মুখপাত্র হ'য়ে একজন দাঁড়িয়ে উঠে ফস্ ক'রে কী জবাব দিলে? না—'তার চাইতে চলুন, আগামী রবিবারে মুরগী কেটে ভোজ দেওয়া যাক।' হাসির হর্‌রা উঠল কিন্তু চাঁদা উঠল না পাঁচ শিলিং-এর বেশি। অথচ রবিবারে যখন এসোসিয়েশনে নিমন্ত্রিত হ'য়ে গেলাম আমরা, দেখা গেল প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী আড়াই শিলিং ক'রে চাঁদা দিয়েছে সস্তা মুরগীর মাংস আর ডাল রেঁধে সবাই একসঙ্গে ফুর্তি ক'রে খাওয়ার জন্যে। শুধু তাই নয়, চাটার্জির কাছে শোনা গেল প্রায়ই ওখানকার ছাত্ররা এরকম করে। সেই আড়াই শিলিং-এর দু'শিলিং ভোজের জন্যে রেখে ছয় পেনি ক'রে চাঁদা দিলেও অন্তত পাঁচটি পাউণ্ড দেশে পাঠাতে পারতে পি, সি, রায়কে। পূর্ববঙ্গের ভীষণ দুর্ভিক্ষে দলে দলে মানুষ আর গরু বাছুর মারা যাওয়া কি এতই আনন্দের সংবাদ যে এদেশে বিরাট ভোজ দিয়ে তাকে celebrate করতে হ'ল?"

"সবই বুঝি সুপ্রিয়া, কিন্তু দেশের লোক নিজেদের ভালোমন্দ, নিজেদের মানসিক দুর্গতি ও পরস্পরের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে এত অচেতন ব'লেই তো তাদের জন্যে সর্বস্ব উৎসর্গ করতে হয়! তাতে অন্তত যদি একজনও জেগে ওঠে, স্বার্থপরতা আর বিলাসিতা ছেড়ে দেশের বৃহত্তর ডাকে সাড়া দেয়, জীবন আমাদের সার্থক হ'য়ে যাবে না কি?"

"কিন্তু সাড়া দিচ্ছে কই? সবাই তো দেখি নিজেকে নিয়েই

ব্যস্ত। তাছাড়া যারা হৃদয়হীন, যাদের এতটুকু সহানুভূতি নেই তোমার উদ্দেশ্যের জন্যে, তাদের মাঝে বহু চেষ্টায় অন্তত একজনকে জাগাবার জন্যে এ-রকম বৃথা পরিশ্রম ক'রে তুমি তোমার শক্তির অপচয় করবে কেন? তার চেয়ে—"

"কি?"

"যদি এমন কোনো উপায় জানা থাকত. যার সহায়ে একেবারে মূলে গিয়ে মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন সাধন করা যেত! এক এক ঘটি জলে ক্ষেত উর্বর করবার অসম্ভব চেষ্টা না ক'রে নদী থেকে স্রোত ডেকে আনতে পারা যেত যদি! অনুদা, এমন কোনো ধর্ম, এমন কোনো সত্য—কোনো পথই কি নেই যাতে মানুষ তার প্রকৃতির স্বার্থপরতা আর নীচতাকে ছাড়িয়ে উপরে উঠে যেতে পারে?"

"আছে বই কি। একের আত্মবিসর্জনে বহুর জাগরণ,—একটি martyr-এর রক্তস্রোতে এক এক নবধর্মের প্রতিষ্ঠা, শোনোনি ইতিহাসে?"

"কিন্তু তবু তো মানুষ যা ছিল তা-ই র'য়ে গেছে। সেই কাম, সেই ক্রোধ, সেই হিংসা! একজনের প্রাণ দেওয়াতে অনেক মানুষ যদি রাতারাতি দেবতা হ'য়ে যেত অনুদা, তবে বুঝতাম যে ও-আত্মবলিদানের সার্থকতা আছে। কিন্তু যে-ইতিহাসের নজির দেখাচ্ছ তুমি, সে নিজেই তো সাক্ষ্য দিচ্ছে উল্টো। দু'চারদিন হৈ-চৈ, তারপরে মানুষ. মানুষের সমাজ আবার যে-তিমিরে সে-তিমিরে। তুমি যাই বলো, আমার মনের সন্দেহ কিছুতেই ঘুচছে না—বুঝতে পারছি না যে-পথে চলেছি তা-ই সত্য পথ কিনা। কেবল মনে হচ্ছে, দেশ আর দেশের লোককে মহৎ ক'রে গ'ড়ে তোলবার যে-উপায় তুমি যথার্থ ব'লে মনে করেছ তা মরীচিকারও

বাড়া—মরুভূমিতে জলসিঞ্চনের মতনই মিথ্যে, পণ্ডশ্রম। চমক আছে কিন্তু সত্যিকার অস্তিত্ব নেই, তার পিছনে ছুটোছুটি ক'রে 'কাজ করছি' ভেবে আত্মপ্রসাদ থাকতে পারে, কিন্তু—"

"থাক সুপ্রিয়া, আর বলতে হবে না। একেবারে কিছুই না ক'রে হাত-পা গুটিয়ে হা-হুতাশ করার চেয়ে মরীচিকার পিছনে ছুটোছুটি করাও ভালো। নিষ্কর্মা জড়ভরত হ'য়ে মরণের অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়তে লড়তে মরা ঢের বেশি সম্মানের। আচ্ছা, তুমি যে এত বেশি ভাবনা চিন্তা করো, বলো দেখি তুমিই বা কোথায় এমন কোন্ উপায়ের কথা শুনেছ বা ভেবে পেয়েছ যাতে মানুষ দু'দিনের মাঝে ইন্দ্রিয়জয়ী মহামানবে পরিণত হ'তে পারে? স্বপ্নবিলাসেই শক্তির অপচয় হয় মিনু, কর্মে নয়। তা হোক না সে কর্ম তাদের মধ্যে যারা তোমায় একটুও চায় না, একটুও বোঝে না। ব্যর্থতাকে আমি ভয় করিনা, সার্থকতাও হ'লে হ'ল, না হলে নেই। আমার 'কর্মণ্যেবাধিকারঃ, মা ফলেষু'।"

"অনুদা, তুমি মহৎ, তোমায় আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি। আরো অনেকে যদি তোমারই মতন হ'ত, তবে ভাবনা ছিল না। পাশাপাশি চলতে চলতে বহুবার হয়ত আমাদের মতের অমিল হবে। সেটা গায়ে মেখো না।" তারপর একটু থেমে ইতস্তত ক'রে বললে, "তোমার সঙ্গে আমার মনের আসল অমিল কোথায় জানো? তুমি বলো যে তুমি দেশের উন্নতি, দেশবাসীর জাগরণ আর উত্থানের জন্যে কাজ করবে। এ-ই তোমার উদ্দেশ্য, এ-ই তোমার লক্ষ্য। কিন্তু ব্যর্থতাকে যে ভয় করে না, সার্থকতার জন্যেও যে লালায়িত নয়, যে ভ্রূক্ষেপও করে না যাদের জন্যে বা যাদের মাঝে কাজ করছে তারা তাকে চায় কি চায় না, বোঝে কি বোঝে না—এক কথায় যার motto 'কর্মণ্যেবাধিকারঃ', সে কি শুধু দেশ ও দেশ-

বাসীর মুক্তি আর উন্নতিকে উদ্দেশ্য ক'রেই কাজ করছে, না আপনার অজ্ঞাতে দেশের থেকেও মহত্তর বৃহত্তর পূর্ণতর কিছুকে লক্ষ্য ক'রে—আত্মসমর্পণ ক'রে? Aim আর process, লক্ষ্য আর উপায়, দুটোকে একই জিনিষ ব'লে ভেবে নিয়ে ভুল করছ না কি? দেশ-সেবা তোমার উপায়—the way you go by, কিন্তু লক্ষ্যও কি তাই?"

"লক্ষ্য—স্বাধীনতা, সব দুর্দশা থেকে মুক্তি; অজ্ঞান, সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, দলাদলি, সর্বরকম বন্ধন থেকে মুক্তি। মাকে রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে দেখব, এই আমার লক্ষ্য—কতবার বলেছি তোমায়।"

"কি জানি, হয়ত তাই, হয়ত আমি বুঝতে পারছি না তোমায়, কিন্তু আমার মনে হয় তোমার নিজের মধ্যেই রয়েছে একটা মস্ত আত্মবিরোধ—স্বতোবিরোধ। তোমার যে অংশটা সফলতা বিফলতায় সমভাবে একনিষ্ঠায় কর্ম ক'রে যেতে চায়, তাতে, আর যে অংশটা স্বদেশকে সম্রাজ্ঞীরূপে দেখে সুখী হ'তে চায়, ওতে—সম্পূর্ণ মিল নেই। প্রথমটা চায় আপনার মধ্যে এমন এক বস্তুর সন্ধান—যার অস্তিত্ব দেশকালের বহু ঊর্ধ্বে, যাকে পেলে মানুষ আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়; কর্ম করে, কিন্তু নিজের জন্যেও নয়, পরের জন্যেও নয়—অনাগত এক সম্পূর্ণতার জন্যে। কিন্তু সে কী, কোন্ নামে তাকে—"

"অভিহিত করবে জানো না, এই তো? তাই বলছি সুপ্রিয়া, দোহাই তোমার—নিজের মাথায় যথেষ্ট জট পাকিয়েছ, আমারটাও কেন গুলিয়ে দেবে? আমি ফিলজফির ছাত্র নই, জ্ঞানের চর্চা করবারও দুঃসাহস রাখি না। কর্মী মানুষ, কাজই করতে পারি; কার জন্যে, কিসের তরে তা ভেবে আমার লাভ কী? সূক্ষ্ম বিচার-বিতর্ক দিয়ে আমি করবই বা কী? আত্ম-সম্পূর্ণতা বলো বা ঈশ্বর বলো বা স্বদেশের স্বাধীনতা বলো—লক্ষ্য যাই হোক না

কেন, কর্ম'ই আমার উপায়। সেটি ঠিক মতো করতে পারলে যা পাবার তা আমি পাবই। তার জন্যে আগে থেকে এত ভেবে মরব কেন ?"

"ভালো, আর কখনো আমি তোমায় বিরক্ত করব না।"

"রাগ ক'রো না মিনু, কিন্তু আমার মনে হয় মিছামিছি অতশত চিন্তাবিলাসও এক ধরণের স্বার্থপরতা। শুধু তোমায় বলছি না— যারাই নিজের জন্যে অত্যধিক ভেবে মরে—সে ভাবনা নিজের মহত্তম মঙ্গলের জন্যে হ'লেও, তাকে আমি নিছক সময় নষ্ট, নিছক স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি নে।"

"এবার কিন্তু প্রতিবাদ করতে হ'ল। দেখ অনুদা, ঐ বাগানে হাজার রকমের ফুল হাজার ভাবে ফুটে আছে। তা'তে বাগানের কী শোভা !"

অনুপম মনে মনে একটু হেসে বললে, "অর্থাৎ মানুষগুলোও যদি ফুলের মতো হ'ত—"

"মানুষও যদি প্রত্যেকে নিজের মধ্যেকার সুন্দরতমের ফুটে ওঠার কথা আরো বেশি ক'রে ভাবত, যদি সর্বস্ব পণ করত তা'কে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে, তবে একদিন হয়ত সমস্ত পৃথিবী ঐ বাগানখানির মতোই সুন্দর হ'ত।"

অনুপম হেসে উঠল—"মিনু, তুমি কবি, এবং কবিরা যা হয়, তাই। ভাববিলাসী—কাজের লোক নও।"

"ফুলের ফুটে ওঠাও কি একটা মস্ত কাজ নয় ? তোমার কাছে না হ'লেও বিশ্বদেবতার কাছে নিশ্চয়ই। নিজের মহত্তম মঙ্গলের কথা যারা ভাবতে পারে, সর্বোত্তম আত্মবিকাশের পথে ধাপে ধাপে তারা এগিয়ে যাবেই। শুধু সে রকম লোক দিয়েই সমাজ উদ্ধার, দেশ-উদ্ধার, পৃথিবী উদ্ধার হ'তে পারে। যারা পরহিত দেশহিত ক'রে রাত্রিদিন

ছটফট ক'রে বেড়ায়, তাদের দ্বারা না হবে পরের উদ্ধার, না দেশের উদ্ধার। নিজের তো নয়ই!" ব'লেই সুপ্রিয়া চট্ ক'রে উঠে পড়ল।

অনুপম হেসে পিছন থেকে ডাকতে লাগল, "আমি রাগ করিনি, ভয় নেই। অমন ক'রে পালাতে হবে না তোমায়। মিনু, শুনে যাও।"

"কি? বলো—"

"তোমার মতামত তোমার থাক, আমারটা আমারই থাক। যার যার ভাবে তাকে ফুটে উঠতে দাও, কেমন?"

"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু কাজের বেলা যেন গাফিলি না হয়। এই দেখ, আজ প্রশান্ত আসছে। এই শনিবারে আমাদের লণ্ডনে যাবার কথা, মনে আছে তো?"

"কিন্তু প্রশান্ত কেন এ সময় আসছে তাহ'লে?"

"কি জানি, তা তো কিছু লেখেনি। বোধ হয় কোনো দরকার আছে। ভালোই হ'ল, এক সঙ্গে যাওয়া যাবে আবার।"……

সেদিনের আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক এমনি ক'রে শেষ হ'ল বটে কিন্তু তার রেশ থেকে গেল সুপ্রিয়ার মনে। কিছুতেই ভুলতে পারল না যে অনুপমে আর ওতে কোথায় যেন একটা মস্ত প্রভেদ আছে, কিন্তু সেটা এমন জায়গায় যা সহজে ধরাছোঁয়া যায় না। তবু কাজের ক্ষেত্রে সুপ্রিয়ার নিজের মতামতের উপর কোনো ভরসা নেই। কাজ যদি করতেই হয়, তাহ'লে অনুপমের মতানুবর্তী হ'য়ে করাই সব চেয়ে নিরাপদ।

অথচ যতই দিন যেতে থাকে, সুপ্রিয়ার অন্তরের গ্লানি বাড়ে বই কমে না। কেবলই মনে হয়, প্রতি মুহূর্তে সে যেন নিজেকে

ফাঁকি দিয়ে চলেছে। সহস্রবার অন্তরকে শুধায়, 'এ রকম কেন মনে হয়?'—কিন্তু কোনো সদুত্তর পায় না। তবু এই আত্মপ্রতারণা-বোধ ওকে ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। যখন মনের চাঞ্চল্য অত্যধিক বেড়ে যায়, তখন কোথাও কারো কাছে শান্তি না পেয়ে 'ক্যামে'র ধারে সেই উইলো গাছের তলায় গিয়ে বসে। অনেকক্ষণ একাকী ব'সে ব'সে হঠাৎ একদিন ওর মনে হ'ল, "ভগবান থাকুন আর নাই থাকুন, মহাপুরুষেরা তো একদিন ছিলেন। মৃত্যুর পরেও যদি অস্তিত্ব থাকে, তবে ডাকলে তাঁরা শুনবেন। আর যদি না শোনেন?···তাহ'লে বুঝব—সব শূন্য। কিছুই নেই কোথাও। যেখানে কোথাও কিছু নেই সেখানে সত্যই বা কী, অসত্যই বা কী? যে-কোনো রকমে জীবনটা কাটিয়ে দিলেই হ'ল। কিন্তু এই উপসংহারে আসবার আগে যাঁরা এক সময়ে এ পৃথিবীতে ছিলেন, আমি তাঁদের একবার ডেকে দেখব। ডাকার মতো ডাক হ'লে সত্যময় যদি কেউ থাকেন তিনি সাড়া দিতে বাধ্য।" কোথা থেকে যে ওর মনে এলো এ ভাবটি, তা সুপ্রিয়া নিজেই জানে না।

সেদিন থেকে শোবার ঘরে সে এক নতুন বন্দোবস্ত ক'রে নিলে। এক কোণে পর্দা দিয়ে ঘিরে ছোট একটি ঘরের মতো তৈরী ক'রে নেওয়া হ'ল। বাইরের কেউ দেখলে মনে করত এটি ওর ড্রেসিং-রুম বা সে রকম কিছু। সেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই। তার একমাত্র কারণ, সুপ্রিয়া ওর মনের এই নতুন-পাওয়া জিনিষটিকে সযত্নে সবার চোখের আর সমালোচনার আড়ালে রাখতে চায়। বাইরের হাসি-বিদ্রূপের ধূলোবালিতে পাছে ওর পূজার ফুল মলিন হ'য়ে শুকিয়ে যায়, এই ওর ভয়। ও ঠিক করেছে নিজেরও বিশ্বাস অবিশ্বাসকে তুচ্ছ ক'রে, অন্তত কিছু দিনের জন্যে পরীক্ষা হিসাবে মন প্রাণ দিয়ে ডাকবে প্রাচীনকালের সেই সত্যদর্শী ঋষিদের—যীশু,

বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—কাউকেই বাদ দেবে না। এঘরে ব'সে সে গীতা, উপনিষদ বাইবেল থেকে আরম্ভ ক'রে থেরীগাথা, রামকৃষ্ণ-কথামৃত, বিবেকানন্দের গ্রন্থাদি সকলই এক মনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বই পড়ায় তেমন শান্তি পায় না, যেমন পায় শ্রদ্ধাসহ তাঁদের মনে মনে স্মরণ ক'রে। শুতে যাবার আগে এখানে এসে একবার ক'রে আসনে বসা ক্রমে ওর অভ্যাস হ'য়ে গেল।

কোরাণে মহম্মদ কী বলেছেন জানবার জন্যে লাইব্রেরী থেকে তার ইংরেজী তর্জমা নিয়ে এলো একখানি। আরো যেখানে যত বই পায়, সবই যোগাড় ক'রে অন্তত একবার প'ড়ে দেখে। 'জন ক্রিস্টফার' প'ড়ে মনে হ'ল রোলাঁ যেন কোন্ এক সত্যের আভাস দিয়েছেন বইটার সে-জায়গায় যেখানে ক্রিস্টফার অন্তর দিয়ে কা'কে অনুভব করছে। কে সে? ভগবান?—রোলাঁ কি নিজেরই অনুভূতির কথা লিখেছেন তাঁর নায়ককে উপলক্ষ্য ক'রে? যাওয়া যায় না তাঁর কাছে? বিবেকানন্দ বেঁচে নেই, কিন্তু যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে একবার যেতে দোষ কী? মুখোমুখি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা যায়। সন্দেহভঞ্জন না হ'লেও চেষ্টা করতে দোষ কী? মহাত্মা গান্ধী অহরহ "Truth"-এর কথা বলেন। সে সত্য কী?—বুঝতে হবে।

এমনি ক'রে সুপ্রিয়ার মন নতুন ধারায় সকলের অগোচরে অন্তঃসলিলা এক নদীর মতো আপনার পথ আপনি খুঁজে ফিরতে লাগল। এ সন্ধানে বাইরে ওর সাথী কেউ রইল না, কারো কাছে সে তার গোপন কথা প্রকাশ করতে পারে না; পারে না ব'লেই, তার জোরও গেল শতগুণ বেড়ে। কল্পনায় নিজেকে সে পৃথিবীময় পর্যটন ক'রে বেড়াতে দেখে। যেখানে সত্যের এতটুকু আভাস, সেখানেই যেন জোড়করে উপাসিকার মতো ব'সে পড়ছে—বলছে, "তোমরা কী জেনেছ, কাকে পেয়েছ, দয়া ক'রে আমায় তার বার্তা শোনাও, অংশ

দাও।” এই একই কথা সেই কোণের ঘরে ব'সে বারবার সে বিবেকানন্দকে বলে, বুদ্ধকে বলে। ওর চেষ্টা—যাতে অন্ধ বিশ্বাস, অহেতুক ভক্তিকে একান্তভাবে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে। বলে, “হে রামকৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, ত্যাগী মহাপুরুষ সন্ন্যাসী সবাইকে আমার নমস্কার, কাউকে আমি অশ্রদ্ধা করব না, কিন্তু না জেনে, না দেখে তোমাদের দেবতাকে আমি মেনেও নেব না। আমি চাই এমন এক সত্যদর্শী মহাপুরুষের সন্ধান, যিনি নিজের পথ আমায় নির্বিচারে মেনে নিতে বলবেন না ; বলবেন না—‘আমি যা পেয়েছি তোর সত্যও তাই, নান্যঃপন্থা।’ তেমন লোকের কাছে আমি যাবো না। আমি যাবো তাঁর খোঁজে যিনি নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিকার, আত্মজ্ঞানী, যিনি শুধু আমায় ব'লে দেবেন নিজেকে জানার উপায় কী। আমার সত্য কী? এটিই আগে জানব আমি। তারপর দিনে দিনে পলে পলে সম্পূর্ণভাবে সেই সত্যের সঙ্গে এক ক'রে নেব নিজেকে, নিজের যা কিছু আছে সমুদয়কে। এমন যদি হয় যে তোমরা কেউ আমার মনের কথা শুনতে পাচ্ছ তবে দয়া ক'রে পথ দেখাও। বলো, কোথায় গেলে কী করলে জানতে পারব—আমি কেন জন্মেছি, কী আমার কাজ! তোমরা যদি অন্তর্যামী হও তবে অবশ্যই বুঝতে পারছ আমি ধন চাই না, মান চাই না। চাই শুধু—আমি কী, কোথা থেকে এলাম, কেন এলাম, কী-ই বা আমাকে করতে হবে, কার বা কিসের জন্যে—এই জ্ঞান। যদি দেশের সেবাই আমার কাজ হয়, নিঃসন্দেহে যেন তা-ই জানতে পারি, তখন আর অনুপমের সঙ্গে কোনো মতভেদ আমি থাকতে দেব না। কিংবা, যদি এমনই হয় যে অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য অতি সাধারণ কোনো কাজের জন্যেই আমার জীবন নির্দিষ্ট, আমি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তা-ই বরণ ক'রে নেব। কিন্তু প্রথমে জানতে চাই—জানতে চাই, নইলে শান্তি নেই যে কোথাও! কে আমাকে জ্ঞান দেবে, কোথা গেলে পাবো সেই

সর্বদর্শীর সাক্ষাৎ যাঁর চোখে অমিশ্র সত্য ধরা পড়ে বিনা আয়াসে”—…ভাবতে ভাবতে এক একদিন সুপ্রিয়ার অদ্ভুত অবস্থা হয়। সমস্ত ভাবনা চিন্তা হঠাৎ যায় থেমে, দেহমন স্তব্ধ নিথর হ'য়ে থাকে। কতক্ষণ ধ'রে, কোথায় আছে তাও মনে থাকেনা। কখনো কখনো এরকম স্থির শান্ত মন নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। দিনের বেলা কিন্তু আবার সেই অশান্তি।

একটি চিন্তাকে সুপ্রিয়া প্রাণপণে এড়িয়ে চলে। নির্মলের কোনো খবর জানবার জন্যে কখনো সে এতটুকু চেষ্টা করে না। ওর মন কঠিন পণ করেছিল সেদিন থেকে যেদিন অনুপমের ম্লান মুখ দেখেছিল। যে ইচ্ছা করলে যে-কোনো মুহূর্তে ওকে নিজের ব'লে দাবী করতে পারে, তারই কাছ থেকে সর্ববিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়ে সুপ্রিয়া এইটুকু বুঝেছে যে আর যাই হোক, চিরজীবনের জন্যে সে পর হ'য়ে যেতে চাইলে, অনুপম ব্যথা পেলেও বাধা ওকে দেবে না। ব্যথা যে সে পায়, তা সেই প্রথম দিনেই ধরা পড়েছিল। সেখানেই সুপ্রিয়ার দুর্বলতা। যে দুঃখ পায় অথচ পথরোধ ক'রে দাঁড়ায় না, তাকে আঘাত করা, অন্তত ওর সাধ্যে নাই; সেখানে সুপ্রিয়া স্বতোবন্দিনী—যেখানে যে প্রেমের মূলে রয়েছে একটি সহজ নিঃস্বার্থপরতা। নিজের অন্তরে এই একটি বিচিত্রভাব সে ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্য ক'রে আবাক হয়েছে যে অনুপমের প্রতি শ্রদ্ধা আর নির্মলের জন্যে অনুরাগ দুই-ই ওর সমান প্রবল; একটির জন্যে যদি অপরটিকে ছাড়তে হয়, তাহ'লে যেন জীবন ওর দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে যাবে; এই খণ্ডিত—অপূর্ণ জীবনে না পাবে সে সর্বাঙ্গসুন্দর সত্য, না আনন্দ। তাই নির্মলের প্রসঙ্গ ছেড়েছে কিন্তু তাকে ভোলে নি। ঠিক একই কারণে প্রথম প্রথম ভয়ে ভয়ে থাকত পাছে অনুপম এ বিদেশের 'স্বাধীন হাওয়ায়' কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওর সঙ্গে 'প্রেমের চর্চাও' সুরু

ক'রে দেয়। নির্মলের যে ব্যবহার ওর ঘুমন্ত প্রাণকে প্রবল নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল, ভুলতে পারে নি ব'লেই—তার উন্মাদনা সে আজও ক্ষমা করতে পারে নি। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে অনুপমের প্রতি ওর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, কারণ ক্রমে দেখা গেল যে নিজের পড়াশুনা সভাসমিতি ছেলেদের নেতৃত্ব ইত্যাদি কাজে ওর নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই। কাজের চাপ সত্যই ওর এত বেশি যে প্রতি মেলে দু'বাড়িতে চিঠি লেখা পর্যন্ত সুপ্রিয়াকে দিয়ে সারতে হয়।

এমনি ক'রে অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন উভয়ের সংঘর্ষ আর অমিলের বোঝা ব'য়ে ব'য়েও দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে মাসের পর মাস যায় কেটে! বহুদিন মনে মনেও আলোচনার অনভ্যাসের ফলে ধীরে ধীরে সুপ্রিয়ার চিত্তে স্টীমারের ও পারিসের সেই বেদনাময় স্মৃতি ঝাপসা হ'য়ে আসে। ক্রমে সে মনকে বোঝাতে পারল যে, যেখানেই থাকুক না কেন, নির্মলও এত দিনে ওর কঠোর ব্যবহার আর রূঢ় কথাগুলো নিশ্চয় ভুলতে পেরেছে। এই চিন্তায় মনে ওর ভারি একটা শান্তি নেমে এলো। আজকাল একান্তভাবে সে এই কামনা করে, এ-জীবনে আর যেন কেউ কারোর পথে না আসে। যাতে কোনো লাভ নেই, সে-রকম সমস্যা সুপ্রিয়ার সম্মুখে এসে আর যেন না দাঁড়ায়। নিরুদ্বিগ্ন শান্ত মন নিয়ে দিনের পর দিন জগতের মনীষী ও মহাত্মাগণের জ্ঞানের সমুদ্রে সে সন্তরণ ক'রে দেখবে; যেখানে মনের মতন জিনিষটি মিলবে সেখানেই দেবে ডুব। তাতে যা ভেসে যাবার, তা যাক। জীবনে যদি আর কূলের নাগাল না পায়? সেও ভালো, তবু হার মানবে না।

সন্ধানে

(২য় পর্ব)

সন্ধ্যাবেলা সিটি থেকে একখানা 'টিউব' এসে লণ্ডনের নর্থওয়েস্ট অঞ্চলের ভূগর্ভস্থিত এক স্টেশনে থামতেই তড়াক ক'রে একটি যুবক নেমে পড়ল। গায়ের রঙ কালো না হ'লে চালচলনে হাবভাবে কে বলত যে ইংরেজ নয়? লিফ্‌টে ক'রে উপরে এসে প্রফুল্লভাবে শিষ দিতে দিতে বাঁদিকের নির্জন রাস্তা ধ'রে শীঘ্র এক অনতিবৃহৎ সুন্দর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। পকেট হাতড়ে ল্যাচ্-কী বার ক'রে আস্তে দুয়ার খুলে নিঃশব্দে উপরে যাবে, এমন সময় ঠিক সম্মুখের ঘরের দরজা গেল খুলে। অপ্রস্তুত হ'য়ে যুবক হেসে বললে, "এ্যান্, আর যার কানকেই ফাঁকি দিই, তোমার কান আর চোখকে ফাঁকি দেওয়া বা এড়িয়ে যাওয়া সোজা ব্যাপার নয়।"

এ্যান চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে অভিমানের সুরে বললে, "এড়াতে চাইলে ধ'রে রাখছে কে মিঃ বোস? বেশ তো যাও না, কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে তোমার চিঠিখানা নিয়ে যাও। নইলে আমাকে আবার উপরে ছুটতে হবে, সেটা তোমার মোটেই ভালো লাগবে না।"

"ভালো লাগবে সখী, ভালো লাগবে! আর এই দেখ তার প্রমাণ"—নির্মল কাছে সরে এলো।

"আঃ কী করো! যেখানে সেখানে যখন-তখন—তোমার জন্যে দেখছি আমার চাকরী বজায় রাখা দায় হবে! সেদিন কর্ত্রী

মুখের উপর যা-তা বললেন। আমি ব'লেই টিকে আছি। তোমাকে উনি হাতে রাখতে চান, তাই বলেন না কিছু।"

"বললেই বা কী? এত বড় লণ্ডন সহরে কি আর বাড়ি জুটবে না নাকি?"

"তোমার তো সবই জুটবে মিঃ বোস, বাড়ি, বাড়ির কর্ত্রী আর—"

"লক্ষ্মী মেয়ে এ্যান, আজ আর ঝগড়া করে না। কাল তোমায় একটা জিনিষ কিনে দেব। এখন চললাম, কাজ আছে একটু।"

এ্যান চিঠিখানা ছুড়ে দিল, "এটা নিয়ে যাও।"

শোবার ঘরে এসে কোট আর হ্যাটটা খুলে মাটিতেই ফেলে রেখে হাত পা ছড়িয়ে নির্মল সোফায় শুয়ে পড়ল। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ কী চিন্তা ক'রে বিরক্ত হ'য়ে শেষে উঠে পড়ল। মনে মনে বললে, "এ বাড়িও ছাড়তে হ'ল দেখছি। কী যে রাতদিন ঘ্যান ঘ্যান—প্যান প্যান সুরু করেছে মেয়েটা! শেষে কি—"

কোটের পকেট থেকে চিঠিখানা মেজের উপর গেছে প'ড়ে। সেদিকে তাকিয়ে বললে, "আবার কার চিঠি এলো! মেয়েগুলো সব সমান, যেমন ডোরা তেমনি এ্যান! একটু যদি আমোদ করতে গিয়েছ তো অমনি—দূর হোক গে, এই হপ্তায়ই নোটিশ দিয়ে দেব।"

চিঠিখানা উঠিয়ে নিয়ে ঠিকানা না দেখেই খুলে ফেললে। বাঙলায় লেখা। নির্মল আশ্চর্য হ'য়ে গেল—একি, রেণুদির চিঠি—এতদিন পরে! খামটা উল্টিয়ে দেখলে ব্যাঙ্ক ঘুরে এসেছে। ওর বাড়ির ঠিকানা তো কেউ জানে না। নির্মলের হৃদয়হীন ব্যবহারের জন্যে অনেক দুঃখ ক'রে রেণু লিখেছে সে স্কটল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসেছে। কেমব্রিজে অনুপমের কাজ শেষ হয়েছে

সেও এইবার আসবে লণ্ডনে। সকলে একসঙ্গে থাকতে হ'লে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়া দরকার। নির্মল কি এসময়ে একটু সাহায্য করতে পারবে না?

খোলা চিঠিখানা টেবিলের উপর রেখে নির্মল ফিরে গিয়ে সোফায় বসল। ওধারে জ্বলন্ত আগুনের দিকে, একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ওর মন সুদূর অতীতের কত অকরুণ ঘটনার স্মৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললে।...... সেই এক রাত্রি—যখন ওর হৃদয়ভরা প্রেমাঞ্জলি কঠিন দু'কথায় উপেক্ষা ক'রে—না, না, থাক্; নির্মল তো ভিক্ষুক নয়!—তবে কেন মনের মধ্যে একটুও ক্ষোভ পুষে রাখা! তাছাড়া—ক্ষোভ, অভিমান—এসব কার উপর? সুপ্রিয়া তো ওকে ভালোবাসত না, কিন্তু সে কথা স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেবার মতো সরল ব্যবহারও কোনোদিন করেনি। একবারও বলেনি যে সে আকৈশোর অনুপমের বাগ্‌দত্তা। নির্মল জানত ওরা তিনজন কোনো-না-কোনো সম্পর্কে ভাই-বোন—স্টীমারে তাইতো বলেছিল রেণু। সে কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস না করলে নির্মলের মনে অন্য সন্দেহ একটুও উঁকি মারত না, এত বোকা তো নয় সে। পরের মুখ থেকে একথা শুনে ক্ষোভে লজ্জায় নিরাশায় ওকে সে রাত্রেই পালাতে হ'ল—যেখানে গেলে সুপ্রিয়ার নামও কানে পৌঁছোবে না, তেমন দেশে। তারপর এই এতদিন ধ'রে—এই এক বছরের উপর—কত চেষ্টায়, কত কষ্টে ধীরে ধীরে যে দুঃখের স্মৃতি মন থেকে প্রায় মুছে ফেলতে সমর্থ হয়েছে, এখন এক জনের মুখের ডাকে সাধ ক'রে গিয়ে পড়বে আবার সেই ঘূর্নির মধ্যে?......অসম্ভব! তাছাড়া ওদের সঙ্গে এখন কোথাও নির্মলের মিলবে না, কোথাও বনবে না। ওরা সব বড় বড় ভাবের ভাবুক, বড় কাজের কর্মী! আর নির্মল? না—কাজ নেই, তার

চাইতে এই বেশ।……উঠে ঘণ্টা বাজিয়ে মেডকে ডেকে দরজা খোলা রেখেই সটান সোফায় শুয়ে পড়ল আবার।

মিনিট পাঁচেক পরে এ্যান এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি চাই? খাবার এখানেই আনতে হবে নাকি?"

অন্যমনস্কভাবে নির্মল বললে, "খাবার? না। আমার কাপড়গুলো দিয়ে যাও।"

"ডিনার চাইনে?"

"না।"

ইস্ত্রিকরা কাপড়গুলো হাতে নিয়ে তরুণী মিসেস বার্টন স্বয়ং এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে, "এ্যান বলল আপনি আবার বেরোচ্ছেন?"

"হাঁ, কাজ আছে, ভুলে গিয়েছিলাম।"

"রাত্রে ফিরবেন তো?"

নির্মল কেমন একরকমের হেসে বললে, "কি জানি। ভালো কথা, মিসেস বার্টন, এই চেক নিন—গত সপ্তাহের বাকি টাকাটা।"

"কিন্তু এত কেন? আমি পাব তো মোটে দু'পাউণ্ড—"

"তা হোক, লুসিকে কিছু কিনে পাঠিয়ে দেবেন এ মাসে। স্কুলে আজকাল কেমন লাগছে ওর?"

"ধন্যবাদ মিঃ বোস। লুসি বেশ ভালোই আছে। আপনার কথা প্রায়ই লেখে।……রাত্রে যদি আসেন, কিছু চাই কি? এক গ্লাস দুধ—"

"দুধ? আমি কি কচি খোকা? এ্যানকে বলবেন এক বোতল সোডা, আর—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সেসব আমিই ঠিক ক'রে রাখব! কী যে আপনাদের ইণ্ডিয়ান প্রেজুডিস! যা সবাই খায়, তার কথা বলতে মুখে এত বাধে কেন বুঝি না। আর কিছু চাই না তো?··তা হ'লে আসি এখন, রাত বারোটা পর্যন্ত খিল দেওয়া হবে না সদর দরজায়। পারেন তো, আসবেন।"

ট্যাক্সি যখন বেলসাইজ পার্কের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে তখন সমস্ত ব্যাপারটার উপর নির্মলের কী যে বিতৃষ্ণা বোধ হ'ল! রাতের পর রাত একই অভিনয়—ডরোথীর সঙ্গে প্রেমের খেলা! অন্তত আজকের রাতটা নির্মল মুক্তি চায়, নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চায়। ডোরা তা'তে হাতপা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে না নিশ্চয়, হাজার হোক ইংরেজের মেয়ে।······মুখ বাড়িয়ে ট্যাক্সিকে ফিরে স্ট্যান্‌লী গার্ডেন্‌সে যাবার হুকুম দিলে।······

অশান্ত সবে খেয়ে উঠেছে। নির্মল বিনা ভূমিকায় ওর কোট আর টুপি তুলে নিয়ে বললে, "চলো"।

"কোথায়?"

"যেখানে হোক, চীনে রেস্তরাঁয়, থিয়েটারে—"

"কিন্তু আমি যে—"

নির্মল অসহিষ্ণুভাবে ঘাড় নেড়ে বললে, "তবে চললাম আমার—" ইংরেজীতে একটা অতি বিশ্রী শপথ উচ্চারণ করলে।

"ছি ছি, তুমি দিনের পর দিন কী হ'য়ে যাচ্ছ বলো দেখি!" অশান্ত ওর হাত ধরল—"একটু বোসো, মিনিট দশেক, আমার তৈরী হ'তে যতক্ষণ লাগে।"

"ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।"

"তবে থাক। চলো কোথায় নিয়ে যাবে।"

শোফার জিজ্ঞাসা করলে "কোথায় যাবেন, স্যার ?"

"যে-কোনো ভালো থিয়েটারে—যেখানে তোমার খুসী।"

সমস্ত পথটা নীরবে কাটল। মাঝখানে শুধু একবার অশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, "আজ আবার ব্যাপার কী বলো দেখি ?"

নির্মল উত্তর দিল না। কোটের কলারটা উঁচু ক'রে তুলে দিয়ে তার মধ্যে মুখ গুঁজে স্থির হ'য়ে ব'সে রইল।······

থিয়েটার শেষ হ'তে বললে, "চলো চাইনিজে"।

"এত রাত্রে ?"

"খাওয়া হয়নি আমার। আচ্ছা, কর্ণার হাউসেই চলো। পাছে ওখানে পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় তাই চাইনিজের নাম করেছিলাম। কিন্তু সত্যিই এত রাত্রে 'সোহো' তোমার ভালো লাগবেনা।"

নিরিবিলি একখানা টেবিল বেছে নিয়ে নির্মল ওয়েট্রেস্‌কে ডেকে বললে, "আমরা একলা থাকতে চাই।"

"বেশ স্যার।····· কি খাবেন বলুন তো ?"

"অশান্ত, আমার সঙ্গে তুমিও কিছু খাও, একটু রোস্ট—"

"না। শুধু একপেয়ালা কফি।"

অর্ডার লিখে নিয়ে মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করলে, "আর কিছু চাই না ?"

অশান্তর চোখের দিকে তাকিয়ে নির্মল ঘাড়টা ঈষৎ কাৎ ক'রে একটু হেসে বললে, "দুজনের জন্যেই কফি এনো।"

ওয়েট্রেস চ'লে যেতে অশান্ত বললে, "আমি তো তোমায় মদ খেতে বারণ করিনি নির্মল।"

"না, কিন্তু মদ খেতে ইচ্ছা হ'লে তোমার কাছে আসব কেন ?" ব'লে হাসলে।

ম্লানমুখে বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার মনে এত অশান্তি কেন বলো তো নির্মল ?"

"অশান্তি ? বাঃ, আমার মতো এমন বেপরোয়া ফুর্তিবাজ লোক আর কোথাও দেখেছ তুমি ?"

"না। তাইতো জানতে চাই কিসে এমন বে-পরোয়া করল ? এত ভয়ঙ্কর ফুর্তির উৎস কে ? নার্স রায়ান নয় তো ?"

গম্ভীর হ'য়ে নির্মল বললে, "ডরোথী আমার দুঃখের দিনের বন্ধু, তুফান-সমুদ্রে—"

"ভেলা যেমন ? থাক নির্মল, আমার কাছে আর কাব্যি না করলেও হবে। আমি তো তোমার এক পেয়ালার ইয়ার নই, অন্তত এখন সে বদনাম দিতে পারো না।"

"না।" খেতে খেতে কৌতূহলী দুই চোখ অশান্তর মুখের উপর তুলে ধ'রে নির্মল বললে, "তুমিও তো আগে এতটা সিরিয়াস ছিলে না হে। হঠাৎ এত বৈরিগী হ'য়ে গেলে কী দুঃখে শুনি ?"

"তোমাদের দেখে দেখে। প্রাণের মায়া ব'লে কথা শুনে থাকবে হয়ত ?"

নির্মল কথাটা ঘুরিয়ে দিলে, "থিয়েটার কেমন লাগল আজ ?"

"চমৎকার অভিনয় করেছে 'Father'-এর ভূমিকায় লোকটা। কি নাম যেন ? ·····কিন্তু কী ভয়ানক সিনিক্ এই স্ট্রীণ্ড্‌বার্গ !"

"নারী-বিদ্বেষী।"

"বড্ড বেশি। মাথায় গোলমাল একটু ছিলই, তা না হ'লে এতটা বাড়াবাড়ি—"

"বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হয় তোমার ?"

"তা না তো কী ? মানুষ কেউ হুবহু পিশাচ নয়।"

"দেবতাও নয়।"

"তবু—নীচে নামতে পারারও একটা সীমা আছে।"

"না, নেই। মানুষ সব পারে। আজ যা অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে, দু'দিন পরে হয়ত দেখবে তাই ঘ'টে গেছে। স্ট্রীণ্ড্বার্গের জীবনে নারী সম্বন্ধে কোনো ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হ'য়ে না থাকলে মিছামিছি এত বিদ্বেষ এলো কোথা থেকে? যে-কোনো কাজের কারণ একটা থাকেই পিছনে।"

"তবু, লোকের সামনে তাকে এমন অতিরঞ্জিত ক'রে প্রকাশ ক'রে ধরা শক্তির পরিচয় হ'তে পারে, কিন্তু সত্যের নয় নিশ্চয়ই।"

"সত্য কী—সত্য কী? নারী দেবী, নারী শক্তি, যত্র নার্য্যঃ পূজ্যন্তে ইত্যাদি—ছেলে-ভোলানো?"

"কী বলছ নির্মল?"

"তা নয়তো কী? আদিম-মন আর শিশু-মন, দুয়েতে কি পার্থক্য আছে খুব?"

"নির্মল!" অশান্তর মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল।

"আহা, রাগ করো কেন, বন্ধু? সবার অভিজ্ঞতা কিছু সমান নয়। অন্তত সেইটে স্বীকার করো, কিন্তু ভাগ্য যাদের ভরাডুবি ঘটিয়েছে, নিছক মিথ্যাবাদী ব'লে গালাগালও তাদের দিতে যেও না।" নির্মল নীরবে খাওয়া শেষ ক'রে ওয়েট্রেসকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিলে।

পথে এসে অশান্তর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষাকৃত নম্রকণ্ঠে বললে, "এতক্ষণ যে আমার সঙ্গ দান করেছ তার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু বিদায়ের আগে একবার ভালো ক'রে কথা বলো, নইলে আর একদিন দরকারের সময় তোমার কাছে যাবো কোন্ মুখে?"

অশান্ত একখানা হাত চেপে ধরল ওর—"দরকারের কথা তো কিছু বলো নি? কই, কী দরকার ছিল?"

মুখে জোর ক'রে একটু হাসি টেনে এনে নির্মল উত্তর দিলে, "তোমার সঙ্গ পাওয়া।...থাক্, আর কিছুই জিজ্ঞাসা কোরো না।"...

সমস্ত পথটা নীরবে অতিবাহিত ক'রে স্ট্যান্‌লী গার্ডেন্‌সের সামনে এসে অশান্ত বললে, "চলো আগে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"কেন? বরং এক কাজ করলে হয়। আজ রাতটা তোমার এখানেই থাকি।"

"মিসেস বার্টন অসন্তুষ্ট হবে না? রাত্রে বাইরে থাকা—"

অন্ধকারে নির্মলের মুখ দেখা গেল না, নইলে দেখত অশান্ত—কী অদ্ভুত হাসিতে ওর বন্ধুর ওষ্ঠাধর ক্ষণিকের জন্যে প্রসারিত হ'য়েই আবার পরস্পর দৃঢ়সংবদ্ধ হ'ল। বললে, "সত্যি কথা বলো, তোমার আপত্তি নেই তো?

"আমার আপত্তি? সে কি আজ নতুন জানলে?" দরজা খুলে অশান্ত ওকে জোর ক'রে ভিতরে টেনে নিয়ে এলো। সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠতে উঠতে নিম্নস্বরে বললে, "Father-এর লেখকের মতো তুমিও ক্রমে একটা ঘোর সিনিক্ হ'য়ে দাঁড়াবে দেখছি। তখন কী ভয়ানক ছবি সব আঁকবে কে জানে!"

"দ্বিতীয় স্ট্রীণ্ড্‌বার্গ—in embryo?" নির্মল হাসে।

"প্রায়। নইলে আমার আপত্তির কথাটা ভুলেও ভাবতে পারতে? যখন জানো যে আমি থাকি একেবারে একা, নিজের ভাবে—একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট নিয়ে?

"তোমারও তো ল্যাণ্ডলেডি আছে—"

"কেন মিথ্যে চালাকি করছ নির্মল?" বসবার ঘরে ঢুকে আলো জেলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অশান্ত মৃদু হেসে বললে, "ভরাডুবি ঘটিয়েছে তোমার—বলব?"

নির্মল মাথা নাড়ল, "Out with it."

"তোমার ভাবালু স্বভাব, আর hyper-sensitiveness—অল্পে

আহত, একটুতেই শিরপা তোলা! কেন জানো? তোমার ধারণা যে সবাই তোমায় মন্দ ভাবে।"

"মন্দকে মন্দ ভাববে না তো কি ভাববে দেবকুমার—cherub?"

পাইপ জ্বালিয়ে ধূমপান করতে করতে হঠাৎ এদিকে মুখ ফিরিয়ে মরীয়া হ'য়ে অশান্ত ব'লে ফেলল, "পরে কী ভাবে সে কথা না হয় থাক। নিজের যদি মনে হয় যে ভালোভাবে চলছ না, তাহ'লে জীবনের গতি বদলিয়ে ফেল না কেন?"

"টেম্‌স্‌কে বলো সাগরে না গিয়ে পাহাড়ে ফিরে যেতে!"

"বাজে অজুহাত।"

"আমার মতন অবস্থায় পড়লে তুমিই কি বলতে দেখতাম, বন্ধু।"

"বন্ধু বন্ধু করো মুখেই—দুঃখের ভাগ পর্যন্ত দিলে না।"

"বন্ধুকে খারাপ জিনিষ দিতে আছে? নিজের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভালো—"

"বেশ, কিন্তু তা-ই বা দাও কই? এত ডাকাডাকি করি, একবারও আমাদের মিটিং-এ এলে না।"

"মনে এক, মুখে আর—আমার ধাতে সয় না অশান্ত। যা বুঝতেই পারি না তার পিছনে ছুটাছুটি ক'রে লাভ কী? তোমাদের এত মিটিং ফিটিং-এর উদ্দেশ্য আমি আজ অবধি বুঝতে পারলাম না।"

"কখনও উঁকি মেরেও দেখেছ কি যে বুঝতে পারবে? আচ্ছা—থাক্ যা তোমার ভালো লাগে না, জোর ক'রে সে কথা শোনাতে যাবো না। চলো শুয়ে পড়া যাক।"

ঘণ্টাখানেক পরে অন্ধকারে ঠাহর ক'রে বিছানার এক প্রান্তে লম্বমান নির্মলের মাথায় হাত রেখে অশান্ত বললে, "যা ভেবেছিলাম

তা-ই। ঘুমোতে পারো নি এখনও।" একটু ইতস্তত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আজ এত বেশি অস্থির কেন?"

কথাটা নির্মল হেসে উড়িয়ে দিলে, "কেন আবার! nerves! আর এত রাত্রে ভূরিভোজন।"

অশান্ত আর কিছু বলল না।

এর পরে প্রায় মাসখানেক নির্মল অত্যন্ত সংযত হ'য়ে সাবধানে চলল। ঘন ঘন যাতায়াতে ওর সঙ্গে অশান্তর একটা নীরব বোঝাপড়ার মতো হ'য়ে রইল। আর কিছু না হ'লেও বন্ধু এটুকু বুঝতে পেরেছে যে নির্মল মনে মনে অত্যন্ত অসুখী; যখন ওর কাছে আসে, যেন অনেকটা আত্মরক্ষার জন্যেই আসে; কিসের হাত থেকে, তা জানা না থাকলেও এ নিয়ে অশান্ত আর ওকে উদ্ব্যস্ত করে না।

ছুটির দিনে নির্মল ফ্ল্যাটে প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোয়। অশান্ত প্রায়ই বাড়ি থাকে না। সভা-সমিতি ওর লেগেই আছে, আজ ইস্ট-এণ্ড-এ, কাল গাওয়ার স্ট্রীটে—আজ Seamen's Relief Committee, কাল Sidney Webb-এর বক্তৃতা!···

এক একদিন রাত্রেও নির্মল নিজের বাড়িতে ফেরে না। অশান্ত উদ্বিগ্ন হ'লে তাকে বলে মিসেস বার্টনের চোখে অভ্যাস হ'য়ে গেছে ওর বাইরে রাত কাটানো। অশান্ত কথাটা বুঝে দেখবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে এমন সব অপ্রিয় সম্ভাবনা মনে আসে যা বন্ধুর সম্বন্ধে কেউ ভাবতে ইচ্ছা করে না।

সেদিন অনেক রাত অবধি বসবার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে নির্মল উঠে অশান্তকে শীগ্‌গির এসে শুয়ে পড়বার জন্যে তাগিদ দিতে গিয়ে দেখলে সে একগাদা কাগজপত্রের মাঝখানে ব'সে

অত্যন্ত নিবিষ্ট-চিত্তে কী যেন লিখছে। মিনিটখানেক নিঃশব্দে থেকে হঠাৎ সাড়া দিতে অশান্ত এমন পাংশু হ'য়ে গেল যে দেখে নির্মল ব'লে উঠল, "বাইরের কেউ দেখলে মনে করত তুমি যেন এক গুপ্তদলের সর্দার—কিংবা কম্যুনিস্ট—হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে ভয় পেয়েছ!" ব'লে হাসতে লাগল।

অশান্তর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে গেল। ইঙ্গিতে ওকে ঘরের ভিতর ডেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বললে, "ঠাট্টা-ছলেও এসব বলতে নেই। দেয়ালেরও কান আছে।"

ওর অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য লক্ষ্য ক'রে নির্মল অবাক হ'য়ে গেল। সেদিকে চেয়ে অশান্ত এবার একটু হাসলে, "নির্মল, তুমি না হ'য়ে আর কেউ যদি হ'ত, নিশ্চয় সন্দেহ করতাম স্পাই-গিরি করতে এসেছে।"

"কিন্তু—অশান্ত!"

"এতে কিন্তু নেই ভাই, একাজই আমাকে মানুষ ক'রে তুলেছে। বছরখানেক আগেও যে-অশান্তকে জানতে, তাতে আর আজকের মানুষটাতে কত প্রভেদ বুঝতে পারো না কি?"

"তুমি—তুমি তাহ'লে সত্যি—"

"কম্যুনিস্ট!" অশান্ত স্থিরদৃষ্টিতে নির্মলের মুখের ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগল—"কেন, কম্যুনিস্টরা কি মানুষ নয়?"

"কিন্তু যে-সব ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে কাজ করো তুমি, তারা জানে?"

"না। তাদের মাঝে দু'টি লোক ছাড়া একজনও সিরিয়াস্ নয়, একজনও অতটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

নির্মল একটু জোর দিয়ে বললে, "তারা জানে?"

"এখনও জানে না। একজন হয়ত সন্দেহ করে কিন্তু কম্যুনিজ্‌ম্-এ সে বিশ্বাস করে না। তার ধারণা ভারতের স্বাধীনতা নির্ভর

করছে দলে দলে ভারতবাসী ছেলেমেয়ের”—অশান্ত বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললে—“আধ্যাত্মিক আত্মদানের উপর। অথচ ওর অধ্যাত্ম জিনিষটা যে কী,—আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না আমি।”

“জিজ্ঞাসা করোনি ?”

“করেছিলাম। সে বলে—নিজেকে দেবে, নিজের সর্বস্ব দেবে—অর্থ, চরিত্র, স্বাস্থ্য, কর্মশক্তি সব; কিসের জন্যে ? না—এক দল অহমিকাহীন স্বার্থশূন্য কর্মীসঙ্ঘ গ'ড়ে তোলবার জন্যে।” ব'লে অশান্ত হাসলে।

“কিন্তু এ তো ভালো কথা, অতি বড় আইডিয়ালিস্ট না হ'লে এমন কথা কে বলতে পারে ?”

“তুমিও আর এক পাগল। সে রকম সঙ্ঘ কি কখনো গ'ড়ে উঠবে, না তাতে যাদের স্বার্থ-হানি হয় তারাই সেটা গ'ড়ে উঠতে দেবে ? মূলেই নষ্ট ক'রে দেবে না সব ? তাছাড়া একেবারে বিনা স্বার্থে দেশের জন্যেও নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করবে, মানুষ এখনও ততটা অতি-মানুষ—Superman হয়নি।”

“যাঁর কথা বললে তিনিই তো একটি উদাহরণ যে অতি-মানুষ বা Superman না থাকলেও উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত সাধু মহাত্মা অন্তত আছেন যিনি নিঃস্বার্থভাবে—”

“কে বললে নিঃস্বার্থভাবে, কে বললে তারও কোনো স্বার্থচিন্তা নেই ? টাকা পয়সার না হ'তে পারে, মান সম্ভ্রমের না থাকতে পারে, কারণ তা ওর এমনিতেই যথেষ্ট আছে।”

“তবে আর কী স্বার্থ থাকতে পারে বলো ? তোমার কথা শুনে চোখে না দেখেও তাঁর উপর শ্রদ্ধা হচ্ছে যে! টাকাপয়সা আর মানসম্ভ্রমেরও লোভ নেই যাঁর—”

“স্বদেশের ‘হিরো’ হওয়ার, ‘মার্টার’ হওয়ার লোভ থাকতে

পারে না? ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি, শিবাজী, রাণা প্রতাপ প্রভৃতির সমকক্ষ ব'লে গণ্য হবার? 'পতিতের অভ্যুত্থানের' জন্যে নিজেকে ভগবানের যন্ত্র ব'লে ভাবে সে, এ সন্দেহ আমার মনে আজ বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে।"

"ওঃ, তাহ'লে তিনি নিজে বলেন নি তোমাকে এসব?"

"বলবে কি, সে নিজেই হয়ত জানে না কত বড় আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে ওর সমস্ত কর্মপ্রেরণার পিছনে···যদিও 'নিষ্কাম কর্ম নিষ্কাম কর্ম' ব'লে নিজেকে আর পরকে সে ভুলিয়ে বেড়ায়। তাই বলছিলাম, এক একরকম মানুষের এক একরকম স্বার্থ, কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ মন কবি-কল্পনা মাত্র।"

"এঃ, এইটে তোমার বাড়াবাড়ি হ'ল, অশান্ত। যা নিজের অভিজ্ঞতায় আসেনি তাকে কবির কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া সহজ হ'তে পারে কিন্তু যুক্তিযুক্ত না। সে যাক, এদিকে রাত কত হয়েছে দেখেছ?"

"দেখেছি, কিন্তু আমি কি মিছামিছিই এত কথা বললাম?"

নির্মল এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "আমি কী করতে পারি বলো? আর্টিস্ট মানুষ—যার উপর তোমাদের কোনো শ্রদ্ধা, কোনো নির্ভর নেই—"

"তোমার আর্টের উপর নির্ভর না থাকতে পারে, কিন্তু মানুষটার উপর শ্রদ্ধা না থাকলে এত কথা বলতে যাবো কেন? আর যা-ই করো তুমি কাউকে প্রতারণা করবে না কখনোই।"

"কি জানি।" নির্মলের অন্যমনস্ক দৃষ্টি দেয়ালের গায়ে জলন্ত আগুনের উপর ন্যস্ত হ'ল।

"নির্মল, শোনো।" অশান্ত কাছে সরে এলো।

—"তুমি আর্টিস্ট, তুমি নিরীহ—তোমার সম্বন্ধে সবার ধারণাই

এইটা তুমি ইচ্ছা করলে আমাদের অনেক উপকার করতে পারো, আর কিছু না হোক বিপক্ষ দলের সন্দেহের হাত থেকে বাঁচাতে পারো।"

"কী ক'রে ?"

"বলছি।" অশান্ত এলোমেলো কাগজপত্র গুছিয়ে একটা ছোট হাতবাক্সে তুলে রেখে নির্মলের কাছে এসে চেয়ার টেনে বসল। কী একটা বলবার উপক্রম করতেই হঠাৎ সচকিত হ'য়ে নির্মল জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু তোমরা—কারা ? ভারতীয় ছাত্ররা কেউ যখন নয়—"

"না।"

"তবে ?"

"আমরা—বিশ্বব্যাপী কম্যুনিস্টের দল, যাতে আছে সব জাত, সব ধর্ম, সকল পংক্তির, সকল শ্রেণীর লোক।"

"কিন্তু শুনতে পাই না কে তোমায় প্রথম একাজে টানল ?"

"একটি ইংরেজ ছেলে। তার বেশি আর বলতে পারবো না, হুকুম নেই।"

"বেশ, পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু আমায় কী করতে হবে ?"

"আমি যা চেষ্টা করছি তা-ই। সহানুভূতিসম্পন্ন ভারতীয়দের দলে টানা।"

"তোমার কি মনে হয় আমাকে দিয়ে একাজ হবে ? ...আমারই বা সহানুভূতি আছে কী ক'রে বুঝলে ?"

খানিক চুপ ক'রে থেকে অশান্ত বললে, "নির্মল, তোমার মনে আছে একসময় আমি কী ভয়ানক মদ খেতাম ? রাতের পর রাত dancing hall-এ কাটত—"

"বাস্তবিক, আমি ভেবে পাই না সেই তুমি এত শীগগির কি ক'রে এমন বদলে গেলে !"

"শুনবে সে গল্প? খুব ছোট্ট ক'রে বলব।"

"খুব বড় ক'রে বললেও আপত্তি নেই। কিন্তু গোটা দুই সিগারেট দাও আগে, আর এই নাও তোমার পাইপ।"

"তামাকের ব্যাগটাও অমনি ঠেলে দাও এদিকে। ব্যস্, এই বেশ হয়েছে। একটু আরাম না হ'লে রাত দুপুরে গল্প জমে কখনো?"

"নিছক গল্প? না—"

"শোনোই আগে।...বছর খানেক হ'ল এক প্রসিদ্ধ জায়গায়—নাম না বললে তোমার আপত্তি নেই তো?—জনকয়েক বয়স্কা মিশনরী মহিলার অভিভাবকত্বে কুড়ি ত্রিশজন ভারতীয় ছেলে ও মেয়ে বর্হিভ্রমণে যায়। সেখানকার ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা ছুটির সময় প্রায় কেউ খালি সহরে একলা প'ড়ে থাকে না, কোথাও না কোথাও বেরিয়ে যায়, কারণ কলেজের টার্ম্ ছাড়া অন্য যে-কোনো সময়ে সহরটা বড় যেন নির্জীব হ'য়ে থাকে। হয়ত এতগুলো সঙ্গী পেয়ে বা যে-কারণেই হোক, সব জেনেও আমি হঠাৎ এই মিশনরী পল্টনে যোগ দিয়ে ফেললাম। দিনের বেলা নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ানো হ'ত; পুরোনো গির্জা, খালি কলেজবাড়ি, নদীর ধার আর মিশনরী সাহেবদের বাড়ি বাড়ি টহল দিয়ে কে-যে কী রস পেত জানি না, আমি কিন্তু দুদিনেই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলাম। অগত্যা কেবল সাঁতার কেটে আর দাঁড় টেনেই সকাল বিকেল কাটিয়ে দেব ব'লে যখন মন স্থির ক'রে ফেলেছি তখন হঠাৎ এক নতুন জিনিষের সন্ধান পেয়ে গেলাম। একদিন সন্ধ্যার সময় কোনান্-ডয়েলের এক চমকপ্রদ নভেল হাতে নিয়ে শোবার ঘরের দরজা পর্যন্ত এসেছি, রুম্‌মেট ডেকে বললে, মিস কে-র হুকুম—সবাইকে মেন-বিল্ডিং-এ রোজ ৭-৩০ টায় হাজির হ'তে হবে এবং ন'টার আগে কেউ হল্ থেকে

উঠতে পারবে না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কী?' প্রফুল্ল বললে, 'এসেছ মিশনরীদের সাথে, সেটা ভুলে যাও কেন? ডিনারের পর সেখানে নানারকম তর্ক আলোচনা কিংবা ধর্ম নিয়ে মারামারি, না কী সব হবে শুনছি।'

'ধর্ম নিয়ে মারামারি? বাপ!'

প্রফুল্ল হেসে বললে, 'লাঠি উঁচিয়ে না—বচনের খোঁচায়। চলো যাওয়া যাক।'

বললাম, 'চলো তো দেখি গিয়ে ব্যাপারটা কী।'

দু'রাত্তির উপরি উপরি একই কাণ্ড—শুধু হিন্দুধর্মকে নিকৃষ্ট প্রমাণ ক'রে খৃষ্টধর্মের বিজয়পতাকা ওড়াবার জন্যেই এই সভা ডাকা। তুমি তো জানো আমি কখনো কোন ধর্মকর্ম নিয়েই মাথা ঘামাই না। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে কি যে হ'ল, চট্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে হিন্দু আর হিন্দু-ধর্মের স্বপক্ষে এক ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। মিস কে' থেকে সুরু ক'রে হলসুদ্ধ সবাই অবাক। আমার খৃষ্টান বান্ধবীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। যা বলবার ছিল ব'লে ফেলে মাথা ঠাণ্ডা হ'ল যখন, তখন এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্মরণ ক'রে আগে থেকে মানে-মানে স'রে পড়ছিলাম। পিছন থেকে মৃদুস্বরে কে বললে, 'শুনুন!' ফিরে দেখলাম একজন আমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছে—সমস্ত হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে, ভারতবাসীর পক্ষ থেকে।"

"ছেলে, না মেয়ে রে?"—

অশান্ত প্রশ্নটা কানে না-তুলেই ব'লে চলল, "ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হ'ল খুব। আশ্চর্য সংস্কারমুক্ত ওর মন, অথচ নিজের স্বপ্নরচা আদর্শ আর কর্তব্য-অকর্তব্যের হাজারো নিগড়ে বাঁধা। আমাকে সে কেন যে সমশ্রেণী ব'লে মনে করল জানি না। সবার সঙ্গেই মিশত, কিন্তু মনের কথা বলত খুব কম। ওর কেবল একটি বন্ধু, তার সঙ্গেই থাকত প্রায়

সারাক্ষণ। কিন্তু সেদিনের ব্যাপারের পর থেকে দুজনেই আমাকে অতি যত্ন করতে লাগল। বন্ধু তার বয়সে অনেক বড়; আমি প্রায় সমবয়সী। · বোধ হয় তাই নিঃসঙ্কোচে আমার উপর উপদ্রব করত অনেক। তার মধ্যে একটি এই, আর বক্তৃতা দিতে না পারলেও প্রবন্ধ লিখতে হবে, তারপর সে সব ছাত্রমহলে প্রতি মাসে প'ড়ে শোনাতে হবে। ওর বিশ্বাস আমার মধ্যে বলবার আর লিখবার প্রচুর শক্তি রয়েছে। আমি-যে কাজের লোক, আমার মধ্যে যে ভালো কিছু আছে, এ বিশ্বাস আগে আর কারোর দেখিনি। তাই লিখতে লাগলাম ওকে খুসী করবার জন্যে। ক্রমে নিজেরই সত্যিকার ঝোঁকও এসে পড়ল। কী-যে এক নতুন নেশায় পেয়ে বস্‌ল নির্মল, ব'লে বোঝাতে পারব না। আমার পরিবর্তন অনেকেই লক্ষ্য করলে। উদ্দাম অশান্ত কোন্ যাদুতে যেন ক্রমে শান্ত হ'য়ে আসতে লাগল। বন্ধু বললে, এবারে আমার এতদিনকার সুপ্ত প্রকৃতিই আত্মপ্রকাশ করেছে, আর আমার নাম অশান্ত রাখা চলে না। উল্টো নাম দিল সে—প্রশান্ত। আমি হেসে বললাম, 'প্রশান্তই ছিল আমার বাপমায়ের দেওয়া নাম। কিন্তু অশান্ত নামে আমাকে মানায় বেশি, কারণ কাজের মতো কাজ পেয়ে বাইরেটা আমার এখন শান্ত দেখালেও ভিতরের প্রকৃতিটা তুমি যা মনে করেছ তা মোটেই নয়।' দৃষ্টান্তস্বরূপ দুঃসাহসী হ'য়ে ওকে কতকগুলো কথা ব'লে ফেললাম; গতজীবনে আমি কোথায় কোথায় গিয়েছি, কী করেছি তারও দু'একটা বললাম। কথাশেষে চেয়ে দেখি নতমুখ বন্ধুর চোখে জল। দুঃখের—করুণার নয়! সেদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম ওর শ্রদ্ধার যোগ্য হ'তে হবে। ভাবলাম, এমন একটা কিছু করতে হবে যা সহজে কেউ করে না, যার মধ্যে আছে বিপদ, বীর্য। ভারতীয় ছেলেদের bugbear হচ্ছে কম্যুনিজম্। কারণ, তাতে সমূহ বিপদ সারাক্ষণ ওৎ পেতে আছে

শিকার অন্বেষণে ব্যাধের মতো। আমি তা-ই লুকিয়ে সে-সব বইই পড়তে লাগলাম যা ভারতে বাজেয়াপ্ত, যা এদেশেও পথেঘাটে কিনতে পাওয়া যায় না। এই আমার সুরু, অতি সামান্য কারণ থেকে, সন্দেহ নেই। কিন্তু যা সুরু করেছিলাম একরকম বীরত্বের নেশায়—ক্রমে তার পরিণতি হ'ল সত্যের আদর্শে: আমি কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর মহান আদর্শে মুগ্ধ হ'য়ে যেতে লাগলাম। ঘটনাচক্রে আমারই কলেজে একটি ইংরেজ ছেলে আমার গুরু জুটে গেল! তারপরে কী হ'ল আর বলবার অধিকার নেই। কিন্তু সেই থেকে আমি কম্যুনিস্ট।"

নির্মল নীরবে শুনছিল। হাতের ধ্বংসাবশিষ্ট সিগারেটে দু'এক টান মেরে দূরে আগুনের মধ্যে সেটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে আগ্রহে ঝুঁকে ব'সে বললে, "তারপর? তুমি কী বলতে চাও আমি এখনও তার কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

"যার স্বভাবের পক্ষে যেটি দরকার ঠিক সে জিনিষটা যখন জুটে যায়, অনাবশ্যক বাজে কাজের বোঝা তখন আপনি খসে পড়ে। ইকনমিক্সে বি, এস, সি-র পড়ায় আমার দুরাশী স্বভাব ঠিক খোরাক পায়নি তার। বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা সুরু ক'রে, নিম্নতর জীবনের ক্লেদাক্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে বেঁচে গেছি—একথাই বোঝাতে চেয়েছি তোমায়।"

"কিন্তু সুখী হয়েছ?"

"সুখ বস্তুটা কি মানুষের অদৃষ্টে লিখেছেন বিধাতা? কিন্তু শ্রদ্ধা করতে পারি নিজেকে। তাতে যে আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায়, সে তো সুখের চাইতে কম নয়।"

"না, বরং এক হিসাবে বেশি। আত্মগ্লানিতে মানুষের মনের ভিতরকার দেবতা অপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে, সে অপ্রসন্নতা তাকে দিনের পর দিন ধাপে ধাপে নীচে টেনে নিয়ে যায়, থামতে দেয় না কোথাও।"

"খানিকটা সত্যি, খানিকটা সত্যি নয়। দেবতার অপ্রসন্নতায় যদি বিশ্বাস করো, তবে থামবার উপায় আছে এতেও বিশ্বাস করতে হবে। পরখ ক'রে দেখ না একবার।"

"কেমন ক'রে?"

"কোনো গুরুতর কাজের ভার নিয়ে।"

মিনিটখানেক নিঃশব্দে ভেবে নিয়ে নির্মল মাথা নাড়লে, "আমি আর্টিস্ট—"

"তা কি জানি না? তুমি যা, তাই থাকবে।"

"তবে কী ক'রে তোমাদের কাজ হবে আমাকে দিয়ে?"

"সে ভাবনা তোমার নয়। আগে বলো আমাদের আদর্শে তোমার সহানুভূতি আছে কিনা?"

"দেখ অশান্ত, তোমার কাছে এলে আমার ভিতরের ঘুমন্ত মানুষটা জেগে উঠতে চায়, তাই আসি। আমার মধ্যে সে সত্য মানুষটা কী জানো? সুন্দরের পূজারী। যতই অপমান করি না কেন তার, কতবার মরণাপন্ন হ'য়েও আজও সে মরেনি। তোমার বন্ধুত্ব, তোমার মহত্ব, তোমার জাগ্রত মন—এসকলের ভিতরই পাই আমি সেই সুন্দরের স্পর্শ। কিন্তু সে-সবই তো তোমার নিজস্ব জিনিষ: যে-কোনো অনুকূল অবস্থায়, যে-কোনো মহৎ প্রেরণায় অন্তর তোমার একদিন না একদিন জেগে উঠতই আপনার ভাবে। সে বন্ধু ছিল উপলক্ষ্য, কম্যুনিজ্‌মও উপলক্ষ্য, নিজের জন্যে আমি যা খুঁজেছিলাম এককালে, ওরা তা না-ও হ'তে পারে। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও যদি কিছু মহৎ, যদি কিছু সুন্দর থাকে, তার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি, একান্ত প্রাণের যোগ হবেই, কারণ আমি সুন্দরের ভক্ত। সংসারের সর্বত্রই নির্মুক্তভাবে আমি তাঁকে খুঁজে বেড়াতে, উপলব্ধি করতে চাই। কোন্ মন্ত্রবলে, কোন্ স্বপ্নদেবীর সহায়ে আমার 'আমি'কে অতিক্রম

ক'রে গোপন অন্তরেও চির-সুন্দরের পথ খুঁজে পাবো, আজও জানি না। সময় সময় অন্য প্রবৃত্তি এত প্রবল, মন এত বিমুখ হ'য়ে থাকে যে জানতে ইচ্ছাও হয় না। যে-কোনো স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলি। তাতে আমার চিত্ত মলিন হ'য়ে যায়, দেবতা লুকোয় মুখ। সবই বুঝি, কিন্তু—আমার সব কথা তো তুমি জানো না, বলবার উপায়ও নেই। শুধু এটুকু বলি, কোনো সঙ্ঘে আমাকে বদ্ধ করতে চেও না, কোনো দলে টানতে যেও না। বাঁধাবাঁধির মাঝে আমি দু'দিনও টিকতে পারব না।"

"তবে তোমার জন্যেও বা কী করতে পারি, নির্মল? আর তো কোনো উপায় জানা নেই আমার।"

"কিছুই করতে হবে না, ভাই। শুধু তোমার মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের স্পর্শটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না—সত্যিকার উপকার কিছু হবার হ'লে ওতেই হবে। মানুষ যে ছোট নয় এটা প্রত্যক্ষ দেখতে পেলে বেঁচে যাবো আমি। আমার মধ্যেকার ছোট নির্মল লজ্জা পাবে—তাহ'লে হয়ত বড় নির্মল ফের বেঁচে উঠতেও পারে।"

"মানুষ ছোট—কে বললে তোমায়? বেরিয়ে এসো একবার তুমি যে-সমাজে মেশ সে সমাজ থেকে—"

বিষাদের হাসি হেসে নির্মল বললে, "উপায় থাকলে বেরিয়ে আসতাম, কিন্তু এখন too late অশান্ত, too late!"

অশান্ত আশ্চর্য হ'য়ে গেল—"কেন?"

"কিছু না, কিছু না। থাক্ সে কথা! সুখের আশায় মদ ধরেছি, সুন্দরের অভীপ্সায় দিয়েছি জলাঞ্জলি বহুদিন। আত্মবিস্মৃত হ'লে মানুষ করতে পারে না, এমন আছে কোন্ কাজ? তোমার মতো পরম বন্ধুর কাছেও এর বেশি আর বলতে ইচ্ছা হয় না।"

বহুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থেকে অশান্ত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে,

"কোনো কাজ করতে হবে না তোমায়, কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের সভাসমিতিতে যেতে আপত্তি কী ?"

"কী হবে গিয়ে ?"

"সুখের আশায় মদ খেতে পারো, আর এটুকু পারো না নির্মল ? নিজে না-ই বা করলে কিছু। তাছাড়া—" তাড়াতাড়ি বললে, "এ রবিবারে —স্ট্রীটের অভিনয়ে আমার সেই বন্ধুটি আসবে।"

"কম্যুনিস্ট ?"

"বলেছি তো সে নিজেও এবিষয়ে কিছু জানে না, ওর অভিভাবক বন্ধুও না।"

"আশ্চর্য ! এত বন্ধুতা অথচ তাদের বলোনি কিছু ?"

"বড় জনের সঙ্গে মতে মিলবে না, তার অগোচরে ছোটকেও এখন কিছু বলবার যো নেই।"

"কেন ?"

"কেন ? সে—নিতান্তই ওর আজ্ঞানুবর্তী, তাই।"

"ছেলে, না মেয়ে, তা তো বললে না ?

অশান্ত রাত্রের কাপড়গুলো আগুণের কাছে নিয়ে গরম করতে করতে বললে, "গেলেই দেখবে।"

"নাম কী ?"

"তাও তখনই জানবে।" অশান্ত হাসতে লাগল।

হঠাৎ নির্মলের মনে কী-একটা সন্দেহ হ'ল, জেদ ক'রে বললে, "নাম না বললে কোথাও যাবো না আমি।"

"সে কি, এমন সর্বনাশা পণ কেন ?"

নির্মল উত্তর দিল না।

"নাম তার—সত্যি যাবে না নাম না বললে ?"

"না।"

"তোমার মতো ছেলেমানুষের সঙ্গে সুমিত্রর বনবে খুব, আরো অনেক বিষয়ে মিল আছে তোমাদের।"

"সুমিত্র নাকি ওর নাম?"

"হাঁ।" অশান্তর চোখে কৌতুকের আভাস, কিন্তু নির্মল তা লক্ষ্য করল না।

নিশ্চিন্ত হ'য়ে নির্মল আবার বললে, "সুমিত্র? বেশ নাম কিন্তু। কী পড়ে ছেলেটি?"

"কাল বলব, ঘুমে চোখ বুজে আসছে এখন।"

এর পরের কয়দিন নির্মল অশান্তর কথাগুলো অনেকবার ভেবে দেখল। একটি বিষয়ে ওর সন্দেহ নেই যে কম্যুনিস্ট হওয়া ওর পোষাবে না, তার একমাত্র কারণ কম্যুনিজম্-এ সে বিশ্বাস করে না। তাছাড়া, নির্মলের দেশ-উদ্ধার, জাতি-উদ্ধার, পৃথিবীর পরিত্রাণ ইত্যাদি উচ্চাকাঙ্ক্ষার বালাই কোনোদিনই—ছিল না। দেশ ও দরিদ্র-সেবা মহৎ আদর্শ ব'লে মনে হয় ওর, কিন্তু সেটা নিজের জন্যে যতটা, দেশ বা দরিদ্রের জন্যে ততটা নয়। অর্থাৎ যে-কোনো মহৎ আদর্শ, যে-কোনো মহৎ কাজকে নির্মল এক একটা উপলক্ষ্য, উপায় বা সহায়মাত্র ব'লে জানে ও মানে। কিসের?—নির্মলের অন্তর থেকে অসঙ্কোচে জবাব আসে নিজেরই পূর্ণতম বিকাশের, হৃদয়ের গহন-মন্দির-তলশায়ী দেবতার পলে পলে আত্মপ্রকাশের। তার জন্যে কার পক্ষে কী যে শ্রেয়, বলা যায় না। যাতে যার অন্তর যতখানি জেগে ওঠে নিশ্চয় সেটিই তার পথ, তাতেই তার সত্য প্রয়োজন। নির্মলের জাগরণের সোণার কাঠি কম্যুনিজম নয়,

নির্বিরোধ অসহযোগ-আন্দোলন বা কোনো নিষ্কাম ব্রতপালনও নয়। কী—তা কিন্তু সে একেবারেই জানে না। এদের সংস্পর্শে আসার ফলে জানবার আগ্রহ কখনো দুর্নিবার হ'তে চাইলে নির্মল অমনি তাকে নিরস্ত করে। নিজের উপর, পরের উপর এবং সর্বোপরি ভগবানের উপর এক দুর্জয় অভিমান ওর অন্তরগত সত্যের উৎসমুখে যেন প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। জীবনে যাকে সে দেবতার বর ব'লে মনে করেছিল, হাতের কাছে ধরা দিয়েও তা-ই যখন অভিশাপের মূর্তিতে প্রকাশ পেল, তখন তাকে সে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনি। এমন অকরুণ যে দেবতা, তাঁর কাছে নির্মল আর কি কোনোদিন নিজের জন্যে কোনো কিছু প্রার্থনা করবে? বরং ভুলে যাবে যে একদিন প্রেমের শুভ্র নির্মাল্য নিয়ে শান্ত শুদ্ধ চিত্তে সে তাঁর কাছে হাত পেতেছিল। যে ভগবান ভক্তের প্রার্থনা অগ্রাহ্য ক'রে অপমানের অবহেলার নিদারুণ আঘাতে তার পুষ্পকলির মতো বিকাশোন্মুখ চিত্তকে অঙ্কুরেই কীটের কবলে সঁপে দেন—তাঁর উপর প্রতিশোধের পালা নির্মলের এ জীবনে আর সাঙ্গ হবে না। সে কথা আর কেউ না জানলেও সে জানে। তাছাড়া আশা যার নেই, আকাঙ্ক্ষাই বা তার কোথায়? তবে কেন নির্মল অশান্তর সঙ্গে আর্ট নিয়ে, আদর্শ নিয়ে বড় বড় তর্ক করল সেদিন? যে দেহ, যে প্রাণ দেবতার পূজায় দেবার আর উপায় নেই, তার দ্বারা অপর কারোর একটুও উপকার হয় যদি হোক না, সে কেন তাতে বাদ সাধতে যাবে? ডরোথীকে সে ফেরাতে পারে নি, এ্যানকে পারে নি বিমুখ করতে, মিসেস বার্টনকেও না; কেবল এক বন্ধুর বেলাতেই নিজেকে দিতে যত আপত্তি? কম্যুনিজ্ম্-এ ওর আস্থা নেই, নাই-বা থাকল, কিন্তু বন্ধুর প্রয়োজনে দরদ তো আছে! ...তথাস্তু।......

পথে যেতে যেতে অশান্ত বললে, "তুমি একটু আগে এসে ভালোই করেছ। অভিনয় আরম্ভ হ'য়ে গেলে সুমিত্রর সঙ্গে আলাপ করবার সুবিধা হ'ত না।"

"কেন, ও কি অভিনেতাদের মধ্যে একজন ?"

"কে ? সুমিত্র ? Never ! ও ভয়ানক লাজুক !"

"বড্ড ছেলেমানুষ বুঝি ?"

"তোমার আমার চেয়ে বছর দু'তিনের ছোট।"

"তাহ'লে এমন আর কি ! কুড়ি একুশ বছরের পুরুষমানুষ—এত লজ্জা কেন ?"

"স্বভাব।" অশান্ত কষ্টে হাসি গোপন করলে। "তুমি নিজেও তো কিছু কম লাজুক নও, নির্মল।"

নির্মল সেকথার উত্তর দিল না।

"কী ভাবছ ?" অশান্ত জিজ্ঞাসা করলে।

"ভাবছি তোমার সেদিনের কথাগুলো। আমাকে দিয়ে সত্যিই যদি কোনো কাজ হয়—"

অশান্ত সোল্লাসে বললে, "ঠিক বলছ ?"

"ঠিকই বলেছি।"

"তবে হাত দাও বন্ধু। নির্মল, আমি এত নিঃস্বার্থ নই যে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। তাছাড়া আমার বিশ্বাস, এতে তুমিও সুখী হবে।"

উত্তরে নির্মল হাসল, "দেখি—সুখের সঙ্গে এবার যদি সই পাতাতে পারি। খোঁজার শেষ রাখব না পৃথিবীময়,—আরে, ঐ যে মিসেস লাড্‌লো—"

অশান্ত চেয়ে দেখল…"তাই তো !"

"সঙ্গের ও-মেয়ে দুটি কে ? চেন নাকি ?"

"চিনি। ওঁরা অন্যপথে চ'লে গেলেন দেখছি, এতদূর থেকে আমাদের দেখতে পান নি! একটু জোরে পা চালিয়ে এগোও তো।"

—স্ট্রীটে পৌঁছে দেখা গেল অভিনয় আরম্ভ হ'তে তখনও অনেক দেরী। প্রকাণ্ড হলের একেবারে একপ্রান্তে জানলার গায়ে হেলান দিয়ে নির্মল দাঁড়িয়ে আছে অশান্তর অপেক্ষায়। কতদিন পরে ওর এরকম সভায় আসা! মানুষের সঙ্গ কী বিচিত্র! প্রতি প্রফুল্ল মুখে, প্রত্যেক চঞ্চল ভঙ্গিতে জীবনের আনন্দ যেন উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিল। মনে যার যা-ই থাকুক, অন্তত এইক্ষণে প্রাণের সজীবতায় সকলেই ভরপূর, কৌতুক আর কৌতুহলের হিল্লোলে ঘরের বায়ু পর্যন্ত আন্দোলিত।—দেখে দেখে নির্মলের চোখে স্বপ্ন এলো নেমে। এই তো জীবন, এই তো তার যাত্রীদল—আনন্দের পাল তুলে প্রাণের নদী বেয়ে শাশ্বতের সমুদ্রের দিকে আপনারও অজ্ঞাতে অগ্রসর হচ্ছে ধীরে ধীরে। নির্মলও কি মিশে যেতে পারে না তাদের সঙ্গে? বড় দেরী হ'য়ে গেছে কি? না-ই বা পেল পথচলার সাথী, না-ই বা জুটল শ্রান্ত ললাটে দরদী করের কোমল পরশ। সে-ও সর্বজনের স্রোতে নিশ্চিন্তে গা ঢেলে দিয়ে একদিন-না-একদিন এমন এক জায়গায় পৌঁছোবে না কি যেখানে সবাই পৌঁছোয়—যার সমাপ্তি নেই! একটু আগে, আর—একটু পিছে, এইটুকু তফাত বৈ তো নয়! কিন্তু চলেছে সকলে সেই একেরই উদ্দেশে।···নির্মলের মন ভাবে আবিষ্ট, মুখে তৃপ্তির হাসি, দৃষ্টি অসংলগ্নভাবে ইতস্তত সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে।···সুন্দর, সুন্দর! কে জানত যে সংসারের সীমাহীন সহস্র কুশ্রীতার মধ্যেও সুন্দর আছে আত্মগোপন ক'রে! এত নিপীড়নেও নির্মলের হৃদয়ে মানুষের প্রতি প্রীতির অভাব হয়নি তো

আজও ! তবে কেন সে আবার চেষ্টা ক'রে দেখবে না—কেন আবার—আবার ডাকবে না ওর অন্তর্যামীকে ? সে ধূলোয় লুটালেও তিনি তো অন্তরে তেমনি—

পিছন থেকে মৃদু মিষ্ট স্বরে কে বললে, "কই ?"

"এখানেই তো ছিল—এই যে—"

হাসি-হাসি মুখে নির্মল ফিরে দেখলে। অশান্ত পরিচয় করিয়ে দিতে এগিয়ে এলো, "নির্মল, সুমিত্র—"

মুহূর্তের জন্যে চোখে চোখ মিলল। নিমেষে নির্মল কঠিন—যেন মর্মরে রচা। নিমেষ মাত্র, পরক্ষণে কথাটি না ব'লে ভিড় ঠেলে দ্রুতপদে নির্মল অদৃশ্য হ'য়ে গেল।···

সুপ্রিয়ার পাংশু মুখের দিকে চেয়ে শুষ্কস্বরে অনুপম বললে, "মিসেস লাডলো একলা রয়েছেন রেণু, চলো আমরা ওদিকে যাই।"

গোপনে চোখ মুছে রেণু স'রে গেল—

কিন্তু অশান্ত তেমনি পাষাণের মতো স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল ওখানেই। একটু আপত্তি, একটা অস্ফুট ভদ্রতার কথাও উচ্চারণ করতে পারল না।

* * *

পরদিন ভোর না হ'তেই নীচের তলা থেকে ফ্ল্যাটের ঘণ্টা বেজে উঠল। মনে মনে কঠোর হেসে অশান্ত বললে, "যা ভেবেছি তা-ই, ভোরেই হাজির হয়েছে।"

সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দেখে নির্মল উঠে আসছে, মিসেস হলের শীগ্‌গির ওঠা অভ্যাস, দরজা খুলে দিয়েছে সে-ই। ঘরে ফিরে অশান্ত স্টোভ জ্বালতে বসল। তারপর জানলার কাছে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বই খুলে ধরল।

ওধার থেকে নির্মল আস্তে আস্তে বললে, "অতদূরে গিয়ে বসবার

দরকার নেই, আগুনের কাছে এসো। বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না তোমায়।"

অশান্ত উত্তর দিল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, অবশেষে নির্মল আর সহ্য করতে পারল না। উঠে কোট আর টুপিটা তুলে নিয়ে বললে, "চললাম।"

"যাও, কিন্তু আর কখনো এসো না।" অশান্তর স্বরে কোমলতার আভাসমাত্র নেই।

নির্মলের মনে হ'ল ওর নিজের কানেরই প্রতারণা, কী শুনতে বুঝি কী শুনল!

কাছে এসে হাত থেকে বইখানা কেড়ে নিয়ে শুষ্ক বিবর্ণ মুখ অশান্তর চোখের সামনে তুলে ধ'রে শুধালে, "কী বললে?"

"মিস মিত্রকে যারা নাহক্ এতখানি অপমান করতে পারে, তারা আমার কেউ নয়। কোনো সম্পর্ক রাখতে চাইনে তাদের সঙ্গে।" চৌকি ছেড়ে সে স্নানের ঘরের দিকে চলল।

"অপমান? দাঁড়াও এক মিনিট। কিছু না জেনেই তুমি এমন—"

"কিছুই জানবার দরকার নেই।"

"সত্যি?"

"খুব সত্যি।" অশান্ত বেরিয়ে গেল।

চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে নির্মল চেঁচিয়ে বললে, "তবু দয়া ক'রে শোনো। মিস মিত্রকে বোলো নাম ভাঁড়িয়ে তুমি—"

সুপ্রিয়ার সেই মুখের স্মৃতি অশান্তর মনে আগুন ধরিয়ে দিলে, ফিরে এসে মুহূর্তখানেক থম্‌কে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "চেঁচামেচি কোরো না, হাজার হোক এটা পরের—ভদ্রলোকের বাড়ি মোদো-মাতালের নয়।"

"থামো—থামো! আর বলতে হবে না, এখনই যাচ্ছি আমি।

কেবল তোমার বন্ধুকে—” নির্মল পাগলের মতো হেসে বললে, “বন্ধুকে ব'লো আমার সর্বনাশের বাকি যেটুকু ছিল, তাঁকে দিয়ে আজ তা-ও—”

“চুপ! নইলে—” অশান্তর চোখে ক্রুদ্ধ পশুর দৃষ্টি! সৃষ্টির আদিম কাল থেকে নারীর জন্যে যে নরের বিচারহীন উন্মাদনা, তা তখন ওকে পৃথিবীর আর সর্ববিষয়ে অন্ধ ক'রে দিয়েছে। মুহূর্তেক সেদিকে তাকিয়ে হতভাগ্য নির্মল ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে অশান্ত পোস্ট আফিসে গিয়ে মিসেস লাডলোর বাড়িতে ফোন্ করলে।

“মিস রায় বাড়ি আছেন?”

“কে, প্রশান্ত?”

“হাঁ রেণুদি। একবার আসতে পারি এখনই?”

“নিশ্চয়। আমারও বিশেষ দরকার—তুমি ফোন্ না করলে আমাকেই আসতে হ'ত।”

“তা হ'লে তো ভালোই হ'ল, এখনই আসছি।”

পথে গোল্‌ডার্‌স্ গ্রীণে এক দোকানের সামনে সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলে, “এত সকালে কোথায় যাচ্ছ?”

“কই, তুমি আসবে জানতাম না তো?”

“রেণুদি বলেননি?”

“আমি যে সেই সকাল থেকে মিসেস লাডলোর সঙ্গে বাইরে ঘুরে মরছি। কত কাজ! উনি এইমাত্র ব্যাঙ্কে গেলেন, আমারও ফিরবার সময় হ'ল।”

“বাড়ি ফিরবে? চলো না ‘হীথে’ ঘুরে যাই একটু। কতদিন যাওয়া হয়নি।”

"কেন, তোমার বাড়ি থেকেও তো 'হীথ্' খুব দূরে নয় ?"

"সময় কই ? দাঁড়াও, এই রাস্তা দিয়ে গেলে শীগ্‌গির পৌঁছে যাবো।"

যেতে যেতে সুপ্রিয়া বললে, "খুব পড়ছ বুঝি আজকাল ?"

"পড়ি, লিখি—কাজের কি শেষ আছে ?"

সুপ্রিয়া স্নিগ্ধ হাসলে, "ভালোই তো।"

বাগানঘেরা, ছবির মতো ঝকঝকে সুন্দর ছোট ছোট কুটীরের পাশ দিয়ে 'হীথে' যাবার রাস্তা। দূরে একখানা বেঞ্চ দেখিয়ে অশান্ত বললে, "ওখানে বসা যাক।" মাথার উপর ঘনপত্রবহুল তিনচারটা গাছ, পায়ের নীচে সবুজ ঘাস।

"সুপ্রিয়া, আজ তুমি এত অন্যমনস্ক কেন ?"

"কই, না !"

অশান্ত জোর দিয়ে বললে, "হাঁ ; কেন—তাও জানি। বলব ?"

সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসু মুখে চেয়ে রইল।

"বিরক্ত হয়েছ আমার উপর ?"

"কেন ? তোমার অপরাধ কী।"

"নির্বুদ্ধিতা ! আমায় ক্ষমা করো সুপ্রিয়া ! আর কখনো অজানা অচেনা কাউকে অমন বিনা পরিচয়ে তোমার কাছে—কোনো ভদ্রমহিলার কাছেই—নিয়ে যাবো না। শুধু এবারটি আমাকে মাপ করো। বিশ্বাস করো—"

"কিন্তু—"

"চিরদিনের মতো সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছি ওর সঙ্গে। বলেছি ও-মুখ যেন আর দেখতে না হয়।"

রুদ্ধকণ্ঠে সুপ্রিয়া বললে, "বলেছ এসব কথা ?"

"বলব না তো কী। তোমার অপমান—এক ঘর লোকের সামনে! স্বপ্নেও ভাবতে পারো তেমন লোকের বন্ধুত্ব আর এক মিনিটের জন্যেও সহ্য হবে আমার? রাগের মাথায়ও গায়ে-যে হাত তুলিনি, এই ওর ভাগ্য।"

"প্রশান্ত!"

"কেন সুপ্রিয়া, অশান্তকে না জানে কে?······ভাল করতে গিয়েছিলাম, তা বুঝলে না। যত রাজ্যের লো-ক্লাস মেয়েদের সঙ্গে মিশে ব'য়ে যাচ্ছিল একেবারে, চরিত্রহীন মাতাল—! ভারতীয় মেয়েদের উপর, ভারতের সমস্ত কাল্চারের উপর কী বিদ্বেষ! তাই ভাবলাম দিই তোমার আর রেণুদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে। স্নেহ করতাম এক সময়, তাই। নইলে কী মাথাব্যথা পড়েছিল আমার! নাম না বললে কিছুতেই আসে না, শুধু একটু রহস্য করবার জন্যে তোমার ডাকনামটি বললাম। তা'তেই এত!"

অধোমুখে নিরুত্তরে ব'সে রইল সুপ্রিয়া। রাগে অশান্তর সকল বুদ্ধি-বিবেচনা আচ্ছন্ন হ'য়ে না থাকলে ওর মুখের ভাব দেখে আশ্চর্য হ'য়ে যেত। একবারও সেদিকে না তাকিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে নিজের মনে ব'লে চলল, "কত চেষ্টা করেছি জানো মদ ছাড়াতে? আরো কত—কিন্তু সে সব শুনলে ঘৃণা হবে তোমার। মনের জোর নেই এতটুকু; অথচ দায়ী করে অপরকে! আজ সকালে বললে কী জানো? 'মিস মিত্রকে—তোমার বন্ধুকে বোলো, সর্বনাশের যেটুকু বাকি ছিল, ওঁর দ্বারা আজ তাও হ'ল।' অর্থাৎ—"

সুপ্রিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় নত শির তুলতে চেষ্টা করলে। অশান্ত তা লক্ষ্য ক'রে দ্বিগুণ ক্রোধে বলতে লাগল, "কী ভয়ানক লোক দেখেছ? কিন্তু আমিও কি সহজে ছেড়েছি? অপমানের একশেষ ক'রে তবে বিদায়—"

সুপ্রিয়ার শুষ্ক শীর্ণ ওষ্ঠাধর থেকে কিছুতেই কোনো কথা বের হ’তে চাইল না।

দুষ্ট সরস্বতী অশান্তর স্কন্ধে, থামতে দিল না। বললে, “আর যদি মিনিটখানেকও দাঁড়াত সেখানে, কী যে করতাম জানি না। ছুটে চ’লে গেল—ঠিক পাগলের মতো !”

বহু চেষ্টায় ভগ্নকণ্ঠে সুপ্রিয়া ব’লে উঠল, “কেন তুমি এত কাণ্ড করতে গেলে ? কেন ওঁকে—”

“কেন তা কি তুমি জানো না ? ব’লে দিতে হবে সুপ্রিয়া ?”

মুহূর্তে সুপ্রিয়ার সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হ’য়ে ওর স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আপনারও অজ্ঞাতে সরে বসল।

অশান্তর মুখ কালো হ’য়ে গেল, “ছুঁতে যাইনি তোমায়, ভয় নেই। নিজে আমি মর‍্যালিটির এতটুকু ধার ধারি না, কিন্তু তোমাকে তো চিনি। জানি মনে তোমার সুখ নেই, তবু সাহস ক’রে অনুপমকে—”

“অশান্ত !”

“যাক, এতদিনে আমার যথার্থ নামটা ধরতে পেরেছ ! কাছ থেকে স’রে ব’সে অপমান কেন করো ? সুপ্রিয়া, আমি অনুপমের মতো শিষ্ট শান্ত আধ্যাত্মিক স্বদেশ-হিতৈষী নই। বাঙলা দেশের চির-দুর্দান্ত, চির-অশান্ত, চির-দুঃসাহসী ছেলে আমি। বিদ্রোহের রক্তপতাকা ওড়াই কেবলমাত্র অত্যাচারী মানুষেরই বিরুদ্ধে নয় ! মানুষের মনগড়া যত ধর্ম, যত নীতি, যত সংস্কার, যত মিথ্যা আবর্জনা —যত বন্ধনের বিরুদ্ধে। আমি বিদ্রোহী—”

“বিদ্রোহী ?”

“অমন ক’রে কী চাও সুপ্রিয়া ? জানো না, কে প্রথম আমায় ও-পথে মতি দেয় ? তুমি ছাড়া আমার ’পরে এত শক্তি কার !”

“কী বলছ !”

"তোমায় ভালোবেসে, সমাজের বাঁধাবাঁধিতে তোমার লক্ষ্যহীন জীবনের গোপন অশান্তি নিজের চিত্তে পলে পলে অনুভব ক'রে, সকল সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান খুঁজে বার করবই—এই ছিল আমার পণ। কিন্তু খুঁজে যখন পেলাম, তখন তোমায় তা উপহার দিতে এসে দেখি, আর দশজন ভীরু বাঙালী মেয়ের মতোই তোমার মন জীবন-সমুদ্রে সংস্কারের একমাত্র নিরাপদ নোঙরকে আশ্রয় ক'রে—"

"থামো—থামো অশান্ত।"

"বলতে দাও সুপ্রিয়া। রোজ কি তোমায় জ্বালাতে আসব! আমার যা বলবার আছে, একটা দিন ধৈর্য ধ'রে শোনো। সাধারণ মেয়েদের থেকে অনেক উঁচুতে আসন দিয়েছিলাম তোমায়, ভেবেছিলাম নিজের মনের মাঝে যা মিথ্যা ব'লে জানো, বাইরে তা ত্যাগ করার মতো শক্তি আছে তোমার। কিন্তু বরাবর দেখেছি, এখনো দেখছি ভুল করেছিলাম। সত্যকে স্বীকার ক'রে বরণ ক'রে নেওয়া দূরে থাক্, তার আভাসও সহ্য করতে পারো না তুমি। অনুপমকে ভালোবাস না, তবু একটা মিথ্যা আইডিয়া, একটা লোক-দেখানো-মিথ্যা সম্পর্কের বাঁধনে কেন যে—"

অবশ আড়ষ্ট জিহ্বাকে কোনোমতে বশে এনে সুপ্রিয়া বললে, "তুমি যদি না থামো তো আমিই চললাম।"

"যাবেই তো, বলেছি না দুর্বলতা তোমার নিজেরই মনে!"

"দেখ অশান্ত, প্রথম থেকেই যদি তোমায় ভাই ব'লে মনে না করতাম—"

"ওসব নিজের মনকে মিছে চোখ ঠারা। নর-নারীর পরস্পরের প্রতি সকল আকর্ষণের হেতু সেই আবহমান কাল থেকে মাত্র একটি। সেখানে ধর্ম নেই, সমাজ নেই, মূল্য নেই সুনীতি-দুর্নীতির দোহাইয়ের। সহজ যা, তাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারাই তো মুক্ত মনের

পরিচয়। আর একজনকে যে ভালোবাস, সে কথা তুমি মুখে স্বীকার না করলেও—যাবে? আচ্ছা, কিন্তু মনে রেখো 'সত্য কী, সত্য কোথায়' ব'লে মাঝে মাঝে অত হা-হুতাশ করো বলেই তোমার নিজের মধ্যেকার একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম আজ। যতদিন সাহস ক'রে—"

ক্রুদ্ধস্বরে সুপ্রিয়া বললে, "কিন্তু তোমার এত কথা বলার অর্থ বা অধিকার? যদি অনুদা শোনে—"

"অনুপমকে ব'লে দেবে? পারবে সুপ্রিয়া?"

ক্ষণেক অশান্তর উজ্জ্বল অস্থির চোখের দিকে তাকিয়ে সুপ্রিয়া হঠাৎ হেসে ফেললে—লঘু, তাচ্ছিল্যের হাসি!

তিক্তকণ্ঠে অশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, "এত হাসির কারণটা কী শুনতে পাইনে?"

"না হেসে উপায়? অশান্ত, অহংকারটা যদি আর একটু কম হ'ত তোমার, তাহ'লে হাসির কারণ বুঝিয়ে দিতে হ'ত না।" ব'লে পায়ের নীচে ঘাসের উপর থেকে ছাতা আর পার্স টা তুলে নিয়ে আবার একটু হাসলে।

বহুক্ষণ পরে অপমানে আরক্ত মুখ যখন তুলতে পারল অশান্ত, সুপ্রিয়া তখন 'হীথে'র আবেষ্টন পার হ'য়ে দ্রুতপদে রাস্তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

গেটের কাছে রেণু উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছিল। সুপ্রিয়ার মুখ দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিলে। অবশের মতো সুপ্রিয়া সেখানে ধুলো-বালির উপরই ব'সে পড়ল। এতটা পথ এই দিনের আলোয়, ওই অফুরন্ত জনতার মাঝখান দিয়ে কি ক'রে যে এসেছে তা ও নিজেই জানে না। এটুকু কেবল মনে আছে,

এখনই বাড়ির ভিতরে যাওয়া চলবে না। মিসেস লাডলোর সস্নেহ উৎসুক দৃষ্টি, আর অনুপমের নীরব প্রশ্নভরা চোখের সামনে চোখ তুলে দাঁড়াবার মতো মনের বল সুপ্রিয়ার আজ আর নেই। সংসারের সকল কোলাহল থেকে মুক্তি চায় সে, মুক্তি চায়! আজ ডাক এসেছে সুপ্রিয়ার নিজের মনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার জন্যে। অন্তরের এই বিচারালয়ে অন্তর্যামীর সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে হ'লে বাইরের কারোর কথা ভাবলে ওর চলবে না, পরম বন্ধুরও পদক্ষেপ সহ্য হবে না অব্যবহিত অস্থির ভাবনারাশির মধ্যে। তাই বিপুল চেষ্টায় আবার উঠে দাঁড়াল। গেট খুলে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই রেণু পিছু নিল। শক্ত ক'রে হাত চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে?"

সুপ্রিয়া হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলে।

রেণু স্থিরনেত্রে ওর দিকে তাকিয়ে বল্লে, "পাগলামি করিস্‌নে। কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, নির্মলের—?"

সুপ্রিয়ার অধর একটুখানি কেঁপে উঠল শুধু।

"ঘরে আয়।"

সুপ্রিয়া মাথা নাড়ল।

"তবে দাঁড়া এক মিনিট, আমিও আসছি।" ছুটে উপরে গিয়ে বেসিকে ডেকে ওদের দুজনের লাঞ্চের যোগাড় করতে বারণ ক'রে দিল। তারপর শোবার ঘর থেকে গরম কোটটা তুলে নিয়ে রাস্তায় আসতে যতক্ষণ। কিন্তু বৃথাই এত ছুটোছুটি, সুপ্রিয়া কোথাও নেই।

সারা দুপুর, সারাদিন হ্যাম্পস্টেড, গোল্‌ডার্‌স্ গ্রীণ প্রভৃতি কাছাকাছি সকল জায়গায়, বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি, 'হীথের' আনাচে-কানাচে, সুপ্রিয়ার প্রতি প্রিয় বন-উপবনে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে সন্ধ্যার পরে শুষ্ক বিরসমুখে অনুপম বললে, "পুলিসে খবর দেওয়া যাক।"

শ্রান্তপদে কষ্টে দাঁড়িয়ে উঠে রেণু বললে, "তার আগে বাড়িতে একবার ফোন্ করো। হৈ-চৈ করবার বা আর কাউকে দিয়ে করাবার মেয়ে তো নয়। এতক্ষণ হয়ত ফিরে এসেছে।"

তাই বটে, রেণুর অনুমান যথার্থ। মিসেস লাডলোই টেলিফোনে উত্তর দিলেন, সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে ভয়ানক পরিশ্রান্ত হ'য়ে সুপ্রিয়া এইমাত্র ফিরে এসেছে। বেসিকে জল গরম করতে বলা হয়েছে, স্নান ক'রেই শুয়ে পড়বে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন ওদের বাড়ি আসতে কত দেরি! রেণু বললে, "একটু দেরি হবে। আপনারা ব'সে থাকবেন না, যাহোক কিছু তুলে রেখে খেয়ে নেবেন।"

খবর শুনে অনুপম বললে, "যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তুমি তাহ'লে বাড়ি যাও রেণু, তোমার শরীর ভালো নয়।"

রেণু অনুনয় ক'রে বললে, "শুধু আর একটা কাজ, পথে বেল্‌সাইজ পার্কে নামব একবার।"

অনুপম কিছু বলল না। মনের ভাব গোপন করতে আবাল্য অভ্যস্ত সে।

—স্ট্রীটের সভায় অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে নির্মলের নীরব উপেক্ষার পর থেকে সুপ্রিয়ার অতি-বিষাদ, তারপরে আজকের এই হঠাৎ নিরুদ্দেশ, এই উভয়ের মধ্যে যে বিশেষ কোনো সম্বন্ধ আছে, পরস্পর আলোচনা না করেও দুজনেরই মনে সেই একই সন্দেহ বারবার আনাগোনা করছিল। কিন্তু এমনই সূক্ষ্ম বেদনার ব্যাপার, নিজে থেকে না বললে রেণু কিছুতেই সাহস ক'রে ওর কাছে নির্মলের প্রসঙ্গ তুলতে পারছিল না। তবু বেল্‌সাইজ পার্কে নেমে অশান্তর বাড়ির দিকে যেতে যেতে কম্পিতকণ্ঠে একবার বললে, "জীবনে এমন দুঃখের সময়ও কি আসে অনু, যখন চিরকালের স্নেহ দরদও এতটুকু কাজে লাগে না!"

অনুপম সেকথার কোনো উত্তর দিল না! অশান্তর ঘরের নম্বর

দেখিয়ে দিয়ে ঘণ্টা টেনে বললে, "উপরে আলো জ্বলছিল। আছে বাড়িতে। পারো যদি, ওকে নিয়েই ফিরে যেও। আমি চললাম একটু কাজে।"

ব্যাকুল চোখে জল ভ'রে রেণু বললে, "না অনু, না। অন্তত আজকের রাতটা থাকো আমার কাছে।"

"সত্যিই একটু দরকার ছিল। আচ্ছা থাক্, তুমি তাহ'লে বেশি দেরি কোরো না। আমি রইলাম বাইরে।"

আর পীড়াপীড়ি না ক'রে রেণু একলাই উপরে উঠে গেল। অশান্ত ঘরের বাহিরে এসে নীচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘণ্টা শুনে। রেণু ওর চেহারা দেখে অবাক হ'য়ে গেল—এমন শুষ্ক শ্রীহীন, যেন এই-মাত্র রোগশয্যা থেকে উঠে এসেছে। বললে, "ব্যাপার কী প্রশান্ত? সকালে যাবে ব'লে গেলে না, ব'সে ব'সে শেষটা আশা ছেড়ে দিলাম। শরীর ভালো?"

······যাক্, সুপ্রিয়া তাহ'লে সব কথাই ব'লে দেয়নি! এটুকু দয়া যে করেছে এই ওর ভাগ্য। কিন্তু তাহ'লে রেণু কেন এখানে এত রাত্রে?...বিবর্ণ মুখে হাসি টেনে এনে অশান্ত বললে, "জবাবদিহি চাইতে এসেছেন?"

"তাই ভয়ে মুখ শুকিয়ে এতটুক হ'য়ে গেছে? খুব সাহসী ছেলে তো!"

"বসবেন না?" অশান্ত চেয়ার এগিয়ে দিল।

"একটা বিশেষ দরকারে এসেছি ভাই।"

অশান্ত মনে মনে হাসলে। দরকার না হ'লে শুধু পরোপকারের জন্যে কেউ অশান্তর কাছে আসে! স্ত্রীগুবার্গের অত সিনিক্ হ'য়ে ওঠার কারণটা এবার বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ওর নীরবতায় মনে মনে একটু আশ্চর্য হ'য়ে রেণু বললে, "নির্মল

যে তোমার বন্ধু তা আমরা জানতাম না। তুমিও তো কোনোদিনই বলোনি। ও থাকে কোথায় ?"

অশান্তর মনে হ'ল সোজা ব'লে দেয়, "জানি নে।" কিন্তু শান্তভাবে বললে, "সে বাড়িতে নির্মল এখন নেই। কোথায় চ'লে গেছে।"

"কী ক'রে জানলে ?"

"খবর নিয়েছিলাম। আপনি যদি ঠিকানা চান তো দিতে পারি, তবে আমার বিশ্বাস লণ্ডনে ও নেই।"

"কোথায় তাহ'লে ?"

"বলতে পারিনে।"

একান্ত নিরাশা রেণুর মুখে এমন স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠল যে দেখে অশান্তরও দুঃখ হ'ল। বললে, "সত্যি কথাই শুনুন তাহ'লে। আজ সারাদিন ওরই খোঁজে ঘোরা-ফেরা ক'রে মাত্র এই কতক্ষণ আগে বাড়ি ফিরেছি। যেখানে যেখানে থাকার সম্ভাবনা, একটা জায়গাও বাদ দিইনি। সন্ধ্যার একটু আগে আবার ওর বাড়ি গেলাম, ল্যাণ্ডলেডি বললে ঘণ্টাখানেকের জন্যে এসে একটা স্যুটকেস হাতে কোথায় বেরিয়ে গেছে—বিশেষ দরকার। কবে ফিরবে ঠিক নেই।" ব'লে অশান্ত হাসল।

সে হাসি এতই অদ্ভুত, মুহূর্তের জন্যে রেণু ভয়ে কেঁপে উঠল, "প্রশান্ত, তোমার কী হয়েছে ? ব্যাপার কী ? সব কথা খুলে বলতে পারো আমায় ?"

"কী জানতে চান ?"

"যতটুকু তুমি জানাবে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে অশান্ত বললে, "বেশ।"

* * *

সমস্ত শুনে রেণু স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। নীচে অনুপম যে

ঘণ্টাখানেকেরও উপর অপেক্ষা ক'রে আছে ওর জন্যে, সেকথা তখন ওর মন থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে। মনে পড়ল, যখন অশান্ত বললে, "চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

নীচের তলায় নামা মাত্র মিসেস হল্ বললে, "দেরি দেখে আপনার ভাই চ'লে গেছেন। কোথায় নাকি বিশেষ কাজ আছে।"

পথে যেতে যেতে অশান্ত বললে, "জীবনে অনেক সময় অনেক ভয়ানক মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু আজকের দিনটার সঙ্গে তাদের কোনোটারই তুলনা হয় না। নানাদিক থেকে আঘাতের পর আঘাত, বিস্ময়ের পর বিস্ময়, সর্বোপরি আত্মগ্লানি অনুশোচনা আর—ভয়, পাছে যে-কোনো মুহূর্তে খবর আসে ওর আত্মহত্যার!" রুমাল দিয়ে দ্রুত কপালটা মুছে নিয়ে বললে, "চেয়ারিং ক্রস্ হাঁসপাতালে গিয়ে যখন শুনলাম নার্স রায়ানও হঠাৎ নিরুদ্দেশ, তখনই শুধু বুঝলাম সর্বনাশের দিকে শেষ-যাত্রার জন্যে কোন্ পথ বেছে নিয়েছে—বন্ধু। কেবল, ভুলতে পারছি না যে, এই চরম অধঃপতনে চিরদিনের জন্যে দায়ী হ'য়ে রইলাম আমি—একদিন যাকে সে নিজের সর্বশেষ আশ্রয় ব'লে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিল। আমার কাছে এলে নাকি ওর—" অশান্তর কণ্ঠস্বর ভারি হ'য়ে এলো।

রেণু উত্তরে অস্ফুটকণ্ঠে কী যে বললে ভালো বোঝা গেল না।

একটু পরে অশান্ত আবার বললে, "সবাই বলে আমি ভয়ানক বদ্‌রাগী। আমি নিজেও কারো চাইতে কম জানি না ওকথা। কিন্তু এত!—রাগের বশে অবিবেচনার, অন্যায়ের পরিমাণ যে এতই বেশি—"

এবার রেণু বাধা দিলে, "তুমি কী ক'রে লোকের সব কথা জানবে বলো!"

অশান্ত ম্লান হেসে বললে, "সকালে তাড়াতাড়ি এসেছিল বোধ হয় ওই জন্যেই।"

রেণু—চুপি-চুপি, যেন কেউ শুনতে পাবে এমনি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আর—সুপ্রিয়া এসেছিল কখন ?"

"বাড়ি ফিরি আমি তিনটে আন্দাজ। নীচেই মিসেস হলের সঙ্গে দেখা। বুড়ি বললে এর আগে নাকি আরো দু'বার এসে ফিরে গেছে। উপরে গিয়ে ব'সে রইলাম, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না।" একটু হেসে বললে, "ভাগ্য যে মানুষের সঙ্গে এত বিদ্রূপ করতে পারে তা আগে কে জানত ? দু'চারটে কথার পরেই ও কান্নায় ভেঙে না পড়লে বিশ্বাস করা—কিন্তু আপনারা কেউ বুঝতে পারেননি, একি সত্যি ?"

"প্রশান্ত, তোমায় জানি ব'লেই—"

"ভয় নাই রেণুদি, আমাকে দিয়ে কিছুই প্রকাশ হবে না। তাছাড়া দু'দিন পরে এই এত বড় লণ্ডন-সহরে এমন লোক খুঁজে পাবেন না প্রশান্তর মুখের একটা কথায়ও যার বিশ্বাস হবে।"

"সে কি, কেন ?"

প্রশান্ত নীরবে নতমুখে পথ চলতে লাগল।

রেণু ভাবলে আজ সারাদিন ধ'রে নানা বিরোধী ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে মনটা ওর বিকল হ'য়ে আছে।

"ওই পনেরো নম্বর বাস্ এলো, আর টিউবে গিয়ে কাজ নেই রেণুদি। চলুন খোলা হাওয়ায়।"

বাড়ির কাছে এসে রেণু জিজ্ঞাসা করলে, "সুপ্রিয়া তাহ'লে সবই জানে ?"

"সব। না বললে নিজে গিয়ে খোঁজ করতে চায়। চেয়ারিং ক্রস্ থেকে যতক্ষণ না ফিরে এলাম, একই ভাবে ব'সে কাটিয়ে দিলে। এক টুকরো ফল, এককৌটা চা পর্যন্ত খাওয়াতে পারিনি। ও ভয় না দেখালে নির্মলের আত্মহত্যার সম্ভাবনা আমার মাথায় আসত

না। এত অল্পে যে মানুষ নিজের হাতে নিজের প্রাণ নষ্ট করতে পারে, তা সন্দেহ করবে কে?"

রেণুর অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু শুধু বললে, "তাহ'লে সুপ্রিয়া ভয়েই—"

অশান্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখখানা একবার দেখে নিলে, মনে মনে ভাবলে, "যদি তাই বিশ্বাস করতে পারতাম!" গেট খুলে ধ'রে বললে, "এবার আমি যাই, এত রাত্তিরে আর ভিতরে আসব না।"

মৃদুকণ্ঠে রেণু বললে, "সারাদিন কিছু খাওনি, অন্তত কফি এক পেয়ালা—"

"না, একেবারে বাড়ি গিয়েই খাবো। শীগ্‌গির ফেরা দরকার।"

"দেখা হবে কাল?"

"চেষ্টা করব।" ব'লে সামনের রাস্তা পার হ'য়ে ডানদিকের মোড়ে দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভিতরে ঢুকে, রুগ্ন শ্রান্তদেহে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে রেণু উপরে উঠতে লাগল। মনে হ'ল, যেন এক অফুরন্ত যাত্রার সীমাহীন ওই নিষ্ঠুর সোপান-শ্রেণী বেয়ে কোন্ এক অন্ধকার অনন্ত শূন্যে কেবল—কেবলই আরোহণ করছে। সুকোমল আশ্রয়-নীড় কোথায়!

এক দুই ক'রে তিনদিন কেটে গেল, অশান্ত আর আসেই না। রেণু মনে মনে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। বাড়িতে এমন একটি লোক নেই যার কাছে গেলে ওর নিজের মনের থেকে দু'দণ্ড রেহাই পাবে। এত কাণ্ড যে হ'য়ে গেল, মিসেস লাড্‌লো তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। সুপ্রিয়াকে বাইরে থেকে দেখলে কিছুই কি বোঝবার যো আছে? একে তো অভিমানী চাপা-প্রকৃতির মেয়ে, আত্মমর্যাদাজ্ঞান যার এমনিতেই অত্যন্ত বেশি, তার উপর আজকাল এত ভয়ানক গম্ভীর হ'য়ে গেছে যে দেখে রেণুর দুশ্চিন্তা বাড়ে বই কমে না।

কতবার ও মনে মনে ভেবেছে দু'জনে একদিন নিভৃতে ব'সে খোলাখুলি কথা ব'লে দেখবে। সুপ্রিয়া কিন্তু তার এতটুকু সুযোগ দেয়নি এপর্যন্ত। ওর ক্লাস, ওর বই, এগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ওকে কাছে পাওয়া এক দুর্ঘট ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে।

এমনি ক'রে আরো চার-পাঁচদিন কেটে গেল। রেণুর মনে অভিমান উদ্বেল হ'য়ে ওঠে। দুঃখের সময় সবাই যে ওকে এতটা পর ভাববে, নিজেদের ভাবনা-বেদনার একটুখানি অংশও দেবে না, সমস্ত ওর কাছ থেকে গোপন ক'রে ওর মনের ক্লেশ আরো বাড়িয়ে তুলবে, এ তো রেণুর জানা ছিল না! একি সেই অনুপম, যে একদিন জীবনের ভালোমন্দ সকল কথা রেণুকে না বললে এতটুকু স্বস্তি পেত না! আজ অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়েই কি বোনের কাছে ওর মনের কপাট নিষ্ঠুরভাবে রুদ্ধ হ'য়ে গেল? পুরুষের কাছে প্রিয়াই সব, বোন এতই পর—একের কাছে বেদনা পেলেও তা অন্যের কাছে উদ্‌ঘাটিত করা যায় না? কত অভিযোগ অনুযোগ, কত অভিমানের কথাই যে রেণুর মনে আসে, কিন্তু ওদের কঠিন নীরবতার বাঁধ ভেঙে মনের তলের গোপন কথাটি জানবার সৌভাগ্য হয় কই!

অবশেষে একদিন মুখ ফুটে প্রস্তাব করলে—সবাই মিলে '—' স্ট্রীটের এসোসিয়েশানে খেতে যাওয়া যাক। ওর মনের আশা যদি সেখানে অশান্তর দেখা পায়। কিন্তু প্রকাশ করলে না কারো কাছে।

অনুপম যেতে রাজি হ'ল সহজেই। সুপ্রিয়া যখন দেখলে যে রেণু ওর কোনো আপত্তি গ্রাহ্য করলে না, তখন বললে, "মিসেস লাড্‌লোকেও ডাকো।"

"বেশ তো।"

অনুপম কিন্তু মনে মনে আঘাত পেল। সুপ্রিয়ার আপত্তির কারণ বুঝতে ওর দেরি হয়নি।

এসোসিয়েশানে রেণু প্রথমেই অশান্তর খোঁজ করলে। সেক্রেটারী অবাক হ'য়ে বললেন, "সবাই জানে এ খবর, আপনারাই শুধু শোনেননি? দাস যে প্রকাশ্যভাবে কম্যুনিস্টদলে যোগ দিয়েছে!"

"সেকি কথা!"

"কাগজে বেরিয়েছে। আপনি থাকেন কোথায় মিস রায়? স্কট্‌ল্যাণ্ডের জংলী পাহাড় থেকে নেমে আসছেন না তো? সেদেশে শুনেছি খবরের কাগজ যেতে পারে না।"

ছেলেরা হেসে উঠল, "ইংলণ্ডের সহুরে পাহাড়টি কোথায় সেক্রেটারী মশাই?" বলে সবাই প্রৌঢ় রসিককে ঘিরে ধরলে।

রেণু কিন্তু আজ আর হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিতে পারলে না। ওর অবাক লেগেছে এমন খবরের পরেও সুপ্রিয়া আর অনুপমের নিশ্চিন্ত শান্তভাব দেখে।

ফিরবার পথে মিসেস লাড্‌লো ভয়ানক উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। বললেন, "এমনি ক'রেই ভারতীয় ছাত্ররা নিজেদের ভবিষ্যত মাটি করে! পড়তে এসেছ এদেশে, কোথায় ভদ্রলোকের মতো পড়াশুনো করবে, তা না—আজ এটা কাল ওটা—এ্যাড্‌ভেঞ্চার—দুঃসাহসের কাজ একটা-না-একটা জনের পরে জন ক'রেই চলেছে। এই সেদিনও স্যার রথেনস্টাইনের ছাত্র, একটি আর্টিস্ট ছেলে, কাউকে কিছু না ব'লে হঠাৎ কোথায় উধাও। পরে শুনলাম, সে এমন এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড!—বলতে মুখে বাধে। দু'দিন না যেতে আবার এই! এর পরে আর দোষ দিতে পারো সরকারকে? কিংবা আমাদের—যদি

ভারতের প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে এখন আমরা সন্দেহ আর বিদ্বেষের চোখে দেখি?”

রেণু আশ্চর্য হ'য়ে শুনল অনুপম বলছে, “আপনার কি উচিত হ'ল এমন ক'রে বলা?”

“অন্যায় কী বলেছি বুঝিয়ে দাও। ভুল ধরা পড়লে শোধরাতে আমি রাজি।”

অনুপম বললে, “আপনার দেশের ছেলে আর ভারতের ছেলেতে তফাত কোথায়? গায়ের রঙে বই তো নয়! এদেশে যদি থাকে কম্যুনিস্ট, ওদেশেও থাকতে পাবে না কেন?”

“কিন্তু পরিণামটা? ভারতবাসী কেউ কম্যুনিস্ট হ'লে তার শাস্তি—”

“যা-ই হোক না কেন, ওরা জেনেশুনেই ওপথে যায়। মতের স্বাধীনতার অধিকার সকলেরই সমান, সে ক্ষেত্রে ভারতবাসী আর ইংরেজে প্রভেদ করেন কেন?”

“কিন্তু ইংরেজ কম্যুনিস্টকেও আমরা আদর ক'রে ঘরে ডেকে আনি না। ওই নামের যে-কেউ আমার দেশের শত্রু।”

“তার কারণ আপনারা আসলে জাত-ক্যাপিটালিস্ট। সারা পৃথিবীরই টাকার থলেটা ওদের থেকে বিপদ আশঙ্কা করে। ভয় ওই জন্যেই। তা না হ'লে ওরাও আমাদেরই মতন রক্তমাংসে তৈরি দোষে-গুণে-মেশানো সাধারণ মানুষ মাত্র।”

মিসেস লাড্‌লো হঠাৎ সোজা অনুপমের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, “তোমার সহানুভূতি থেকে কি বুঝতে হবে যে—”

“কম্যুনিস্ট কিনা আমিও, জানতে চান তো? মাভৈঃ। হ'লে নির্ভয়ে স্বীকার করতাম।”

“জানি ঘোষ, জানি। মাপ করো আমাকে। লুকোচুরি অন্তত

তোমার স্বভাবে নেই। কিন্তু এমন কপট এই মিঃ দাস! ওর জন্যে তোমাদেরও এখন বিপদ না হ'লে বাঁচি। আর সেই আর্টিস্ট ছোকরা—"

রেণুর কাসিতে বাকি কথাটা ভালো শোনা গেল না।

সন্ধ্যার পরে অনুপম একা বাগানে বসেছিল। সুপ্রিয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এখনই কি আবার বাইরে যাবে?"

"না, আজ আর কোনো কাজ নেই। দাঁড়িয়ে কেন, বসো।

সুপ্রিয়া বসল না, একটা আধ-ফোটা গোলাপের কুঁড়ি ছিঁড়ে সেদিকে চোখ রেখে নতমুখে বললে, "আচ্ছা, এই কম্যুনিজ্‌ম্‌-এ আর আমাদের আদর্শে তফাতটা কী?"

"এত বড় প্রশ্নের জবাব চাই দু'এক কথায়?"

"কিছু বললে ভালো হ'ত।"

"ধর্মহীন ভারত কল্পনা করতে পারো সুপ্রিয়া? কম্যুনিস্টরা ভগবান মানে না, জাতীয়তা-বিরোধী, নর-নারীর মিলনে কোনোরকম আধ্যাত্মিক শাসনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না—তফাতের কি অন্ত আছে!"

এর পরে আর কী বলা যায় সুপ্রিয়া ভেবে পেল না। অনুপমও অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "রেণু কোথায়?"

"উপরে। ডেকে দিচ্ছি।"

সুপ্রিয়া পিছন ফিরতেই অনুপমের নিজেরও অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। এরকমই হয়েছে আজকাল। দু'চার মিনিটের দেখা-সাক্ষাত, দু'চারটি ভাসা-ভাসা কথা। এক বাড়িতে থেকেও কেউ পায় না কারোর মনের নাগাল। পরিবর্তন যে কোথায় বা কী, বাইরে তা

বোঝবার উপায় যেমন নেই, এই অদৃশ্য সূক্ষ্ম বাধাকে অন্তরে নিরন্তর অনুভব করার হাত থেকেও নিস্তার নেই তেমনি।

রেণুর ঘরে ঢুকে সুপ্রিয়া অবাক হ'য়ে বললে, "সন্ধ্যা না হ'তেই শয্যা নিয়েছ যে?"

"তবু ভালো, এতদিনে মনে পড়ল!"

"গা যে গরম, জ্বর নাকি!"

খবর পেয়ে অনুপম এসে বললে, "নিজের ডাক্তারি এবার অচল, রেণু। কালই আমি বড় ডাক্তার ডাকব—বিশেষজ্ঞ।"

রেণু হাসলে, "তারপরে বিশেষ ব্যবস্থাটা কী হবে শুনি?"

"সন্দেহ যা করেছ, যদি সত্যি হয় এমাসেই তোমায় দেশে পাঠিয়ে দেব।"

"দেশে? সেখানে আমার মুখে আগুন দেবে কে?"

"রেণু!"

"তা-ই যদি হ'য়ে থাকে অনু, দেশে ফিরে লাভ? ও-রোগের চিকিৎসার জন্যে এদেশই তো ভালো।"

সুপ্রিয়ার মুখ পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেল। দেখে রেণু আবার হাসলে। কী বলবে, অনুপম তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "না, কোনো কথা নয় এখন। মিনু, মিসেস লাড্‌লোকে খবরটা দাও।"

সেদিন ঘরে যখন আর কেউ নেই, রেণু অনুপমের হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে চুপি-চুপি বললে, "এবার যদি তোমাদের সেই বিশ্বাস ফিরে পাই অনু!"

অনুপম অধোমুখে নিরুত্তরে ব'সে রইল।

চোখের জল আর বাধা মানে না, তবু রেণু আর একবার বললে, "জানি কষ্ট পাচ্ছ—আমি কি কেউ নই?"

ঈষৎ মুখ তুলে বাইরের দিকে দেখিয়ে অনুপম বললে, "ওর কষ্ট আরো বেশি।"

একটি উদ্গত নিশ্বাস সাবধানে বুকে চেপে রেণু বললে, "উপায় ?"

''জানিনে।"

সেদিন '—' স্ট্রীট্ থেকে অমন করে হঠাৎ ফিরবার পরে নির্মলের মনে অনুশোচনার অবধি ছিল না। নাটুকেপনাকে সে যতই ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলতে চায়, ততই কি ঠিক সেটাই এসে ঘাড়ে চাপে ওর? কোথায় শান্ত শিষ্ট, একান্ত উদাসীনভাবে আলাপ-আলোচনা ক'রে সুপ্রিয়া, অনুপম, রেণুদি সবাইকে বুঝিয়ে দেবে যে নির্মল এখন আর কারো জন্যে হা-হুতাশ ক'রে মরে না, তা নয়—হঠাৎ এ কী হ'য়ে গেল! ঝোঁকের মাথায় ক'রে এলো যা, তাতে যে বোঝাল সবই উল্টো। সুপ্রিয়া হয়ত এ নিয়ে মনে মনে কতই হেসেছে, রেণুদি হয়ত-বা একটু কৃপার নিশ্বাস ফেলে ভেবেছে, "আহা বেচারা!" —ছি ছি! নির্মলের ইচ্ছা হ'ল দেয়ালে মাথা ঠুকে মরে! কী করলে এখন এ-লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ওদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে 'তোমরা যা ভাবছ, তা নয়'?

তাড়াছা সুপ্রিয়াকে অপমান ক'রে ওর লাভ? অমনি মনে পড়ল অশান্ত কিন্তু এত কথা বুঝবে না। বরং ভুল বুঝবে। সমগ্র লণ্ডন সহরে অবশিষ্ট এই একটি মাত্র বন্ধু, তাকেও হারালে নির্মলের জীবনে আর থাকে কী?

রাতটা দুশ্চিন্তায় আর দুঃস্বপ্নে কাটিয়ে ভালো ক'রে ভোর না হ'তেই বেরিয়ে পড়ল। পিছন থেকে এ্যান কী একটা কথার উত্তর না পেয়ে অবাক হ'য়ে তাকিয়েই রইল। মিঃ বোস খামখেয়ালী, সবাই জানে! কিন্তু অভদ্র, একথা অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না।

অথচ আজ ঠিক সামনেই গৃহকর্মরতা এ্যানকে যেন দু'পায়ে মাড়িয়ে চ'লে গেল, একবার ফিরে দেখাও দরকার মনে করল না !

অশান্তর ফ্ল্যাটে সে একলা বাসিন্দা হ'লেও এত ভোরে, অন্ধকারের ঘোর না কাটতে, নীচের তলার মিসেস হল সদর দরজা খুলে দেবে না। এটুকু সময় ধৈর্য ধরতেই হবে নির্মলকে।

ভোরের সুতীক্ষ্ণ শীত ! ভালো ক'রে কোটটা গায়ে জড়িয়ে এক-পা এক-পা করে ক্রমে হ্যাম্পস্টেড হীথের কাছে এসে পড়ল। রাস্তার ধারেই একা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ক্লান্তিতে দু'চোখ বুজে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে চাইল। কিন্তু সাধ্য কী ! যে কারণে রাত্রে ঘুম হয়নি সেই একই কারণ—সুপ্রিয়ার বিহ্বল চকিত চোখের স্মৃতি, মুখে পাণ্ডুরাভা—ওর অন্তরের পাষাণে দাগ কেটে ব'সে গেছে। চোখ বুজলেই সেই করুণ দৃষ্টি ! সর্বনাশ, নির্মলকে কি ও পাগল ক'রে তবে ছাড়বে ? সজোরে চোখ খুলে সে দ্রুত স্ট্যানলী গার্ডেন্‌সের দিকে ফিরে চলল।..... তবু ভালো, মিসেস হল্‌ জেগেছে !

কোন্‌ অদৃশ্য সূত্রে বেঁধে, ভাগ্য মানুষকে পুতুলের মতো নাচিয়ে বেড়ায় কে জানে ! নইলে, ঘরে ঢুকে অশান্তর মুখের অমন অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখেও একবার সন্দেহ হ'ল না—মুহূর্ত কয়েক পরেই আসছে জীবনের কোন্‌ চরম অপমান, কী অভাবনীয় লাঞ্ছনা !

পরবর্তী জীবনে বহু চেষ্টা ক'রেও স্মরণ করতে পারত না নির্মল—সেদিন অশান্তর সেই উচুঁ তেতলা ফ্ল্যাট্‌ থেকে নীচে নামবার সব সিঁড়িগুলোতেই কি পা পড়েছিল ওর, না একসঙ্গে গোটা-তিনচার লাফিয়ে অতিক্রম ক'রে চোখের পলক না ফেলতে ঘরের কণ্ঠরোধকারী বিষাক্ত স্তব্ধতা থেকে রাস্তার খোলা হাওয়ায় এসে

দাঁড়িয়েছিল? মিসেস হল্‌-এর এক মিনিটে একরাশ উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরেই বা কী বলেছিল?

মনে আছে কেবল, বিষাক্ত গোখরো সাপের দংশনের মতো এক তীব্র ইচ্ছার দাহন—যেমন ক'রে হোক, এই দেহ থেকে এ-পৃথিবীর ক্লেদাক্ত পঙ্কিল বায়ুগ্রহণের পথ চিরতরে রুদ্ধ ক'রে দিতে হবে, ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে এই অপমানিত সংক্ষুব্ধ ঘৃণিত অস্থি-পঞ্জরের কুৎসিত খাঁচাটিকে!

বেল্‌সাইজ পার্ক স্টেশনের সামনে, প্রাতের নির্মুক্ত রাস্তায় অতি দ্রুত-ধাবমান ট্যাক্সির পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে 'ববী' যখন ওকে ফুটপাথের উপর ফেলে দিল, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের জবাবদিহির উত্তরে কঠোর ক'রে বললে, "হর্ণ দিলে কী হবে, ভদ্রলোক পালাতে পথ পাচ্ছিল না এত ভয়ানক স্পীড্‌ দিয়েছিলে তুমি!"—যখন সে বেচারী নম্রভাবে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করছিল, "সত্যি বলছি কনস্টেবল, উনি যেন ইচ্ছা করেই আচম্‌কা আমার পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন", তখই শুধু নির্মল তন্দ্রোত্থিতের মতো মাথা তুলে চারদিকে চেয়ে দেখলে। ওর উঠবার প্রয়াস দেখে পাহারাওয়ালা লোকটি কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "লেগেছে খুব?"

"সামান্য।"

"দেখি—ও কিছু না। বলি, মাত্রা ঠিক রাখতে পারেননি বুঝি? না নতুন এসেছেন এদেশে?"

এ শ্লেষের কোনো প্রতিবাদ না ক'রে ধীরে ধীরে নির্মল স্টেশনে গেল। অভ্যাসবশত স্ট্র্যাণ্ডের টিকিট কিনে কলের পুতুলের মতো লিফ্‌ট্‌-এ নেমে টিউবের ধূমপান-কক্ষে উঠে বসল। কিন্তু সিগারেট ধরাবার শক্তি কই? দস্তানাজোড়া কখন্‌ হাত থেকে খ'সে পায়ের কাছে মাটিতে প'ড়ে গেছে, সামনের মহিলাটি বারবার সেদিকে ওর

দৃষ্টি আকর্ষণ কররার চেষ্টা করছেন। নির্মল ভ্রূক্ষেপও করলে না, সিটের উপর মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে ভাবতে লাগল, "এই সংসার, এরই নাম বন্ধুত্ব!"

স্ট্র্যাণ্ডে নামবার আগে সেই সহযাত্রিনীই দস্তানাটা হাতে গুঁজে দিলেন। নির্মল ধন্যবাদ দিল কি? না—দিল না! কেন বাজে লোক-দেখানো ভদ্রতা করতে যাবে ও? মানুষের দয়া চায় কে? যে যা ভাববে ভাবুক।

স্ট্র্যাণ্ডের উপর নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে রুদ্ধ রোষে ভাবল, মরতে যাবো, সেখানেও ভগবান বিরোধী। কিন্তু কেন?

চেয়ারিং ক্রসের কাছাকাছি এসে একবার দাঁড়াতেই হঠাৎ ওর মনকে বিদ্যুতের মতো চম্‌কে দিয়ে গেল ডরোথীর কথা। আশ্চর্য, কী ক'রে ভুলে ছিল ও? নির্মল তো জগতে একা নয়! ওর প্রাণটার উপর যে অন্য দু'চার জনেরও আছে অধিকার!...একটু বিদ্রূপের হাসি নির্মলের মুখে ফুটতে না ফুটতে মিলিয়ে গেল।

লাঞ্চের সময় দেখা হ'ল যখন, ডরোথী ওর প্রস্তাব শুনে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু এমন হঠাৎ?"

নির্মল অসহিষ্ণুভাবে ঘাড় নেড়ে বললে, "তুমি থাকো তাহ'লে, আমার না গেলেই নয়।"

"আমি কি বলেছি যাবো না? কিন্তু ছুটির দরখাস্ত করলেই তো বেশ দু'দিক রক্ষা হয়। আজকের দিনটা অন্তত—"

"তার সময় নেই, আর একটা দিনও লণ্ডনে থাকতে হ'লে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা। আমি রাজি।" একটু পরে বললে, "প্রথমে কোথায় যাবে?"

"ভিক্টোরিয়া হ'য়ে ডোভার।"

"আহা, সে তো সবাই জানে। ইউরোপের কোন্ সহরে গিয়ে উঠব তা-ই জিজ্ঞাসা করছি। পারিস?"

"না, দক্ষিণে—অনেক দূরে। যেখানে কেউ আমাদের জানে না শোনে না, তেমন জায়গায়।"

মলিনমুখে ডরোথী বললে, "নির্মল, আমার সঙ্গে কেউ তোমায় দেখে ফেলবে এইজন্যে—"

"ডোরা, দোহাই তোমার, অন্তত আজকের দিনটা আর ছেলে-মানুষি মান-অভিমান ক'রে জ্বালা বাড়িয়ো না আমার।"

"কিন্তু কেন পালাচ্ছ এমন ক'রে, তাও জানতে পাবো না?"

"কোনো মন্দ কাজ ক'রে না, এটুকু জানলেই যথেষ্ট নয় কি? থাক্ কফি, আর বসতে পারছি না আমি। এখনও সময় আছে, ভালো ক'রে ভেবে দেখ। সঙ্গে তোমায় যেতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই।"

"তা না থাকতে পারে। কিন্তু—আমি না গেলেও এ্যান যাবে তো?"

নির্মল নিরুত্তরে উঠে পড়ল।

"কখন আসবে আমায় নিতে?"

"কিন্তু—"

"বলো—কখন্ আসবে?"

"ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টাখানেক আগে।"

ডরোথী সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এলো, "আমি পথ চেয়ে থাকব, ভুলে যেয়ো না। আচ্ছা ট্রেণ তো সেই কখন্, সারাদিনটা করবে কী?"

"দেখা যাক। মনে রেখো ডোরা, আমি কোথায় কতদূরে যাই তার ঠিক নেই। তুমি সঙ্গে যেতে না পারলেও খোরপোষের সকল বন্দোবস্ত—"

"হয়েছে, হয়েছে। আমার মনে আঘাত দিতে পারলে আর কিছুই যেন চাও না তুমি!"

নির্মল আর কিছু না ব'লে বেরিয়ে গেল। ইংরেজের মেয়ের পক্ষে বিদেশী—তার উপর কৃষ্ণকায় প্রেমাস্পদের জন্যে এতটা স্বার্থত্যাগ, আশ্চর্য বটে। হৃদয়হীন নয় নির্মল, কিন্তু উপায় কী? ডোরা সব জেনে শুনেই এই হতভাগ্যের জীবনের সঙ্গে শতপাকে জড়িয়েছে নিজেকে। এখন মুক্তি এসে পায়ের কাছে সাধলেও ফিরে চায় না। আসক্তি আর বলে কা'কে? নির্মলের একলা চ'লে যাওয়ার প্রস্তাবেও খামোকা উল্টো বুঝল!

সে-ই বা ডরোথীর আপ্রাণ চেষ্টাতেও সুখী হ'তে পারে না কেন? এই প্রেমে ওকে এত বিঁধেছ কিসে? এই যে আহ্বান মাত্র ডোরা হেসে প্রত্যাখ্যান না ক'রে বরং কাঙালের মতো আঁকড়ে ধরল ওকে, এতে নির্মলের মন খুসী, প্রাণ উৎফুল্ল গর্বিত না হ'য়ে বরং যেন ভিতরে ভিতরে বিরক্ত উত্যক্ত হ'য়ে উঠেছে। লজ্জিত দুঃখিত হ'য়ে যতই সে সেটা ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়, অক্ষমতার জন্যে যতই নিজের উপর আক্রোশ বেড়ে চলে, ততই মনে হয় ডোরার এই ভয়ঙ্কর আসক্তি থেকে এ জীবনে যেন নিষ্কৃতি পাবে না আর। মনে হয়, সেটা ওকে এক অতল-গহ্বর বিরাট অজগরের মতো ধীরে ধীরে নিজের সবল পেষণে চেপে ধ'রে একটু একটু ক'রে অবশেষে সম্পূর্ণ গ্রাস করবার চেষ্টায় আছে। এতদিন নির্মল হাত-পা ছুড়ে মাথা কোনোমতে একটুখানি খাড়া রেখেছিল, এইবার কিন্তু ডরোথীর সঙ্গে এই নিরুদ্দেশ-যাত্রায় আলোর মুখ দেখা থেকে চিরবঞ্চিত হ'তে চলল।

ভাবতে ভাবতে এই প্রথম ওর মন ভয়ে নিরাশায় অবসন্ন হ'য়ে এলো। লণ্ডন থেকে পালিয়ে কোথায় যাবে? কোথায় গেলে স্মৃতি ওকে চিরকাল অনুসরণ ক'রে বেড়াবে না? সুপ্রিয়ার সুকঠিন উপেক্ষা,

অশান্তর অহেতুক অপমান, লণ্ডনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন—ওর বুকের এই এত অনির্বাণ আগুনের নিরন্তর দাহ নিভিয়ে জুড়িয়ে দেবার মতো শান্তিজল আছে কি ডরোথীর প্রেমে—আছে কি এই জগতের কারোরই প্রেমে? তবে—নির্মল আবার এ-কোন্ নতুন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলল? নানা কারণে যে-একত্রবাসকে এতদিন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল, হাঁসপাতাল থেকে ওকে কর্মচ্যুত ক'রে দু'জনে এমনভাবে পালিয়ে গেলে ভবিষ্যতে আর তার অব্যাহতি নেই। কিন্তু এখন উপায়?

কী ভেবে যে নির্মল তখনই চেয়ারিং ক্রস্ পোস্ট অফিসে গিয়ে ডোরাকে ফোন্ ক'রে বসল তা ও নিজেই জানে না, কিন্তু ডোরা নেই। ঘণ্টাকয়েকের ছুটি নিয়ে হঠাৎ কোথায় বেরিয়ে গেছে। যে নার্সটি টেলিফোন ধরেছিল তাকে নিজের নাম আর কাছেই এক রেস্তোরাঁর নম্বর জানিয়ে, ডরোথী এলে খবর দিতে ব'লে প্রায় সারা দুপুরটা সেখানে চা খেয়ে, খবরের কাগজ প'ড়ে, আশেপাশে ঘোরাঘুরি ক'রে কাটিয়ে দিলে। কিন্তু বিকেল নাগাদও যখন ডোরার কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না তখন হতাশ হ'য়ে ভাবলে বিধি-লিপি অখণ্ডনীয়, অতএব যা ঘটবার ঘটুক। যে জালে বহুদিন পূর্বে সে নিজেই সাধ ক'রে ধরা দিয়েছে, যার অবশ্যম্ভাবী ফল দু'দিন আগে হোক পিছে হোক—সকলের চোখের সামনেই ফলবে, বড় জোর আর বছর তিন-চার তাকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে কী-ই বা লাভ? বরং এখনই সকলের কাছে সকল রকম দেনা-পাওনার চরম নিষ্পত্তি হ'য়ে যাক। সমস্ত জগতের চোখে সে এতই মন্দ হ'য়ে গেছে যে বোঝার উপর শাকের আটির মতো এটুকুর জন্যে কেউ আর ওকে মন্দতর ভাববারও অবকাশ পাবে না।

ভাবতে ভাবতে নির্মলের মাথায় আবার যেন খুন চেপে গেল।

ঘণ্টাকয়েক আগেকার এত ভয় ও বিতৃষ্ণা, মনের কোণে আপনারও অজ্ঞাতসারে একটা ঊর্ধ্বমুখী জীবনযাপনের স্পৃহা ও আগ্রহ—সকলই দেখতে দেখতে দিগন্তব্যাপী মেঘান্ধকারে ক্ষীণ তারকাদীপ্তির মতো চকিতে নিভে গেল। রইল শুধু নিজের প্রতি চিরদিনকার সেই অদ্ভুত আক্রোশ, সেই নিস্ফল অন্ধ অভিমান, আপনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন কণিকাপ্রমাণ দেবত্ববীজের বিরুদ্ধে শত শত দানবী-শক্তির অহেতুক হিংস্র তাণ্ডব অভিযান।

সন্ধ্যার একটু পরে স্যুটকেস্ হাতে চেয়ারিংক্রস্ স্টেশনে নেমে ক্লোক্-রুমের জিম্মায় সেটি ও সামান্য জিনিষ পত্র গচ্ছিত রেখে, মিসেস বার্টনকে সম্প্রতিকার মতো একখানা ছোট চিঠি লিখে ডাকে দিয়ে নির্মল যখন ডরোথীর হাঁসপাতালের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন ওকে দেখলে অশান্তরও সে তীব্র অনুশোচনা মুহূর্তে অন্তর্হিত হ'ত। মানুষ যে নিজেই নিজের কতবড় শত্রু তা জানলে ইচ্ছা ক'রে সর্বরকম ক্ষুধা ও বাসনার স্রোতে এমন স্বচ্ছন্দচিত্তে গা ভাসিয়ে দিতে পারত না। ডরোথীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়াই যখন স্থির হ'ল, তখন থেকে নির্মল মনকে 'মদ ও মেয়ে' ছাড়া কিছুই আর ভাবতে দেয়নি। ফলস্বরূপ ঈষৎ বিভ্রান্ত আরক্ত চোখে পথচারিণী প্রতি যুবতীকে এখন যে-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল, তা দেখে দেখে ঘটনাক্রমে অদূরে দণ্ডায়মানা আগাগোড়া গাঢ়-নীলরঙের শাড়ি-পরিহিতা একটি মেয়ে কখনো ঘৃণায়, কখনো বিতৃষ্ণায়, কখনো বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক অজানা সহানুভূতিময় তীব্র ব্যথায় বারবার শিউরে উঠছিল। সুপ্রিয়া এসেছিল চেয়ারিংক্রস্ হাঁসপাতালে এখনো ডরোথীর কোনো খবর পাওয়া যায় কিনা দেখতে। যে বিষয়ে নিশ্চিত সংবাদের জন্যে, অশান্তর কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরবার পথে হঠাৎ ঝোঁকের উপর সিটির ট্রেণে উঠে চেয়ারিংক্রসে এসেছিল, তারপর হাঁসপাতালে মিস রায়ান সত্যিই নেই জেনে বিশ্বের

শ্রান্তি ও নিরাশা বুকে চেপে সহরতলীর বাস্-এর অপেক্ষায় জনতা থেকে ঈষৎ স'রে কোন্ এক দোকানের ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ হাত-তিনেক দূরে নির্মলকে ওই অবস্থায় দেখে সে-খবরই সম্পূর্ণ-রূপে পাওয়া হ'য়ে গেল। নিঃসন্দেহ হ'য়ে সুপ্রিয়া তখনই চ'লে যেতে পারত, কিন্তু বেদনার কী যে মোহ—শেষ অবধি না দেখে নড়তে পারলে না। নির্মলের প্রত্যেক চঞ্চল ভাব-ভঙ্গী দু'টি ব্যথাতুর চোখের অনিমেষ দৃষ্টি দিয়ে বুকের পটে যেন চিরতরে এঁকে নিতে লাগল।

অপেক্ষা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে বিরক্ত নির্মল যখন অবশেষে হাঁসপাতালেই ঢুকে পড়ল তখনই শুধু ওর খেয়াল হ'ল যে রাত কম হয়নি। সারাদিন ওর অনুপস্থিতির জন্যে বাড়িতে এতক্ষণ হয়ত হৈ-চৈ প'ড়ে গেছে। গোল্‌ডার্‌স গ্রীণের পথে সমস্ত সময়টা অর্ধ-মূর্ছিতবৎ মনটাকে একই কথা বারবার শুধিয়ে চলল—ভগবান জানেন নির্মলের জন্যে শুভ ছাড়া অশুভ-কামনা তো ওর মনের কোণেও ছিল না। তবে কেন দেখতে হ'ল ওকে, তবে কেন দায়ী করা ওকে—এই ভয়ানক অধঃপতনের জন্যে! সুন্দরের যত ধারণা সে আবাল্য অন্তরের মাঝে সঞ্চিত ক'রে রেখেছিল, বাস্তব জগতের পরুষ হাতের নির্দয় আন্দোলনে সে-সবই টলমল ক'রে উঠল কেন? সবচেয়ে দুর্বোধ্য এই যে, সমস্ত সত্ত্বেও একি অদ্ভুত আকর্ষণ ওই দায়িত্বহীন চরিত্রহীন—হয়ত বা হৃদয়-হীন—লোকটার জন্যে! সুপ্রিয়ার এ দুঃখ কি কোনোদিন যাবে, যে, নিষ্কলঙ্ক অনুপমকে ভুলে অবাধ্য মন ওর বারেবারেই এক অব্যবস্থিত দুর্বলচিত্ত বিলাসীর পদপ্রান্তে কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়তে চায়?

এমনি ক'রে কখনো ঘৃণা, কখনো কৃপা, কখনো বা বেদনাতুর অনুরাগের আলোড়নে সুপ্রিয়ার মনের ভিতরে যখন এক সমুদ্র-মন্থনের ব্যাপার চলেছে, তখন ওদিকে নির্মলের জন্যেও কম বিস্ময় অপেক্ষা ক'রে ছিল না।

ট্রেণের সময় উত্তীর্ণপ্রায়, তবু ডরোথীর দেখা নেই দেখে অগত্যা নির্মল ভীত হ'য়ে বড় নার্সকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে ডেকে পাঠাল। আধঘণ্টা কেটে যায়, তবু কোনো খবর নেই। নির্মল চিন্তিতমুখে উঠবার উপক্রম করছে এমন সময় ব্যস্ত-সমস্তভাবে নার্স ঘরে ঢুকে বললেন, "মাপ করবেন, আপনিই তো মিঃ বোস? এইমাত্র স্পেশাল ডাকে দু'খানা চিঠি এলো, এই নিন আপনারটা। নার্স রায়ানের কাকার নাকি ভয়ানক অসুখ, তাই সে হঠাৎ—সায়ারে চ'লে গেছে; ছুটির দরখাস্ত পেলাম, ওবেলা জরুরী তারও করেছিল। সিস্টারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ছুটি দেওয়াই স্থির করেছি। ওর রেকর্ড ভালো, নইলে—" কর্মব্যস্ততার মুখোস ফেলে ভিতরের সন্দিগ্ধ কৌতূহলী নারীপ্রকৃতি একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নির্মলের আপাদমস্তক দেখে নিলে।

সে কী বলবে ভেবে পেলে না, অসহায়ভাবে শুধু চেয়ে রইল। নার্সের ঠোঁটের প্রান্তে একটুখানি হাসির আভাস দেখা দিল, ভাবলে, "ব্যাপার মন্দ নয়, কিন্তু ছেলেটি দেখছি সত্যিই কিছু জানে না।"

হাঁসপাতাল থেকে বিদায় নিয়ে নির্মল বাইরে এসে দাঁড়াল। ডরোথী এ কী চাল চাললো আবার? কাছেই চাইনিজ রেস্তোরাঁ, এক পেয়ালা কফির অর্ডার দিয়ে নির্মল সেখানেই চিঠি খুলে ব'সে পড়ল। ডোরা লিখেছে—

"নির্মল, প্রথমেই ব'লে রাখি, দু'চারটে অপ্রিয় কথা শোনবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে থেকো। তোমার মনে আঘাত দেবার জন্যে নয়, সত্য কথা সত্যি ক'রেই না বললে আর চলে না, তাই সব লিখতে হচ্ছে।

আমি জানি প্রথম থেকেই তুমি আমায় ভালোবাসতে পারোনি। তবু আকৃষ্ট হয়েছিলে। আকর্ষণ করবার জন্যে ছলা-কলা আমিও কম করিনি। কিন্তু সে যাক। প্রেম আর আসক্তিতে তফাত বোঝবার

মতো শক্তি বা অন্তর্দৃষ্টি কোন্ দিনই বা ছিল আমার! তবু তোমাকে দেখে মনে হ'ত অন্তরের গভীরতা তোমার মধ্যে এত বেশী যে, যে-নারী ভাগ্যক্রমে তোমার ভালোবাসা পাবে, জীবনে সে ঠকবে না কখনো। স্বভাবতই প্রেমিক তুমি। তোমার হৃদয়ের মণি-হর্মের দুয়ার খুলে দেবে যে-সোনার চাবি, তা প্রেম। সে-ই তোমায় ঊর্ধ্বে তোলে, তারই অভাবে ধূলোয় লুটোও তুমি। এ তোমার দোষ বা গুণ নয়, তোমার প্রকৃতির বিশেষত্ব। কিন্তু নির্মল, আজ প্রায় দেড়বছরের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক ও মেলামেশায় এটুকু অন্তত নিঃসংশয়ে জেনেছি যে সে-নারী আমি নই যার ভাগ্যে রয়েছে তোমার অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রেমের স্পর্শবর। আমার যা ছিল, একে একে সবই তো দিয়ে দেখেছি। তোমারই তৃপ্তির জন্যে, নিছক নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণ থেকে দিয়েছি, বললে সত্য বলা হবে না। যেমন ক'রেই পারি তোমায় আমার করব, তোমার দেহমনের একেশ্বরী হব—দেওয়ার পেছনে এটিই ছিল একটা প্রধান প্ররোচনা। তাছাড়া আরো যে যে কারণ ছিল সব বলার দরকার নেই। কিন্তু একটি না বললেই নয়। সে অভিজ্ঞতা কখনো তোমার হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু এ বিরাট বিশ্বে এত অগণ্য লোক থাকতে শুধু বিশেষ একজনের জন্যেই কারো দেহ মন এমন ক্ষুধিত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে কেন বলতে পারো? কী আছে তোমার, নির্মল? ঐ তো কৃশ কৃষ্ণ দেহ, তবু যখন ভাবি—যখন মনে পড়ে ওরই দু'বাহুর আলিঙ্গনে, আমায় ছেড়ে, অন্য নারীকে ক্ষণেকের তরেও—অসহ্য! ভাবতেও অসহ্য, লিখতেও অসহ্য! বিষে আমার সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হ'য়ে যায়নি কেন তাই ভাবি যখন দিনের পরে দিন পথে-ঘাটে, হোটেলে রেস্তোরাঁয়, সিনেমায় থিয়েটারে তোমার লালসা-লোলুপ দৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিকে সুন্দর তরুণ মুখের, যৌবনপুষ্ট দেহবল্লীর, বিলাস-বিভঙ্গ নৃত্যশীল গতির

দিকে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে দেখেছে। সুন্দরের প্রেমিক যেভাবে সুন্দরকে চেয়ে দেখে, তোমার দৃষ্টিতে সে পূজারী-দীপ যে কখনোই দেখিনি, তা নয়। কিন্তু কদাচিৎ! অন্যথা—কিন্তু থাক্, থাক্; অনেকদিন অনেক যন্ত্রণা পেয়ে আজ আমি নেহাত আত্মরক্ষারই জন্যে তোমার কাছ থেকে দূরে স'রে দাঁড়িয়েছি। জানি, এতে তোমার এতটুকু কষ্ট হবে না, বরং মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে। জানি ব'লেই ওই হেয় ঘৃণ্য জীবন আর ভালো লাগল না। দেহদানে তোমায় তৃপ্ত করেছি, ভেবেছিলাম অন্ততঃ এই একটা দিকে একলা আমিই জয়ী। কিন্তু যেদিন মিসেস্ বার্টনের কাছে শুনলাম এ্যানের কথা, এ্যানের অনুযোগপূর্ণ কান্নায় ধরা পড়ল মিসেস বার্টনের কথা, সেদিন—মুহূর্তের জন্যে—নিজের এই দেহখানাকে জলে, আগুনে বা ট্রেণের নীচে মৃত্যুমুখে তখন-তখনই সঁপে দেবার ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু ওই মুহূর্তমাত্র, তারপরেই উঠে প'ড়ে লাগলাম তোমার মনকে নতুন ক'রে বাঁধতে। গেলাম দু'জনে সমুদ্রের ধারে। যা চেয়েছিলাম তাই তো পেলাম, তুমি আমারই হ'লে—মার্কামারা সম্পত্তি, নির্মল! কিন্তু হায়, হৃদয়টাকে কি সেদিন থেকে ঐ সমুদ্রের জলেই বিসর্জন দিয়ে এসেছিলে? এর পরে যে তোমার চক্ষুলজ্জাও গেল ঘুচে। আমারই সামনে আমার নার্স-বন্ধুনীদের নিয়ে কী করেছ!

জিজ্ঞাসা করতে পারো, স্বাধীন সমাজের মেয়ে আমি, কেন এত সহ্য করলাম? আমিও এতদিন ভেবেছি—কেন?

তবু, যদি দেখতাম যে ওসবেও তুমি সুখী হয়েছ, আমি একদিন হয়ত স্বেচ্ছায়ই মুক্তি দিতাম তোমায়। প্রাণ দিয়েও যে-ধন পাওয় যায় না, তার উপর স্বভাবতই মানুষের বৈরাগ্য, বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি আসে। আমার মধ্যে এখন কোন্‌টা প্রবল জানি না, শুধু জানি

নিজের উপর কী মর্মান্তিক ঘৃণা! তুমি হেয় ব্যবহার করো তাতেও ছিলাম রাজি, যদি কখনো-সখনো দেখতাম যে তোমার বিন্দুমাত্র স্নেহ রয়েছে আমার'পরে; যদি তোমার চুম্বন তোমার স্পর্শের মধ্যে জ্বলন্ত দৈহিক লালসাছাড়া মুহূর্তের জন্যেও একটুও অকপট ভালোবাসা অনুভব করতাম!

কিন্তু কা'কে এসব বলা? যে জ্বালায় পুড়ে যাচ্ছি তার কিছুই কি তুমি বুঝতে পারলে? পারবার কথাও নয়। অতএব থাক্ সে চেষ্টা।

আবার বলি, জিজ্ঞাসা করতে পারো এতদিন তোমায় ত্যাগ করিনি কেন? উত্তর: এতদিন পারিনি, কারণ—আশা ছিল। আমার সর্বস্ব নিয়েও তুমি সুখী হ'লে সে সুখই একদিন তোমায় আমার কাছে ধরা দিতে বাধ্য করবে, এ-ই ছিল আমার বিশ্বাস। কিন্তু আজ হাঁসপাতালের কাজে ইস্তফা দিয়ে, এখানকার বন্ধুবান্ধবকে জন্মের মতো ছেড়ে, তোমার সঙ্গে নিরুদ্দেশে অদৃশ্য হবার প্রস্তাবেও সম্মত হ'তেই যখন একটা গভীর নিরাশা তোমার সমস্ত মুখে ছেয়ে গেল, তোমার সকল অবয়বে প্রকাশ পেল—নির্মল, তখন আমার মানুষের প্রাণ এমন স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ-দেখা সত্যকে আর তো উপেক্ষা করতে পারে না। আর কেউ না জানলেও তুমি জানো—ভালো ক'রেই জানো—ডরোথী প্রাণপণেই চেষ্টা করেছিল। আয়ত্তের জিনিষ যে কাছে থেকেও এমন দূর, এত পর, এতই আয়ত্তের অতীত হ'তে পারে, ইংরেজের মেয়ে হ'য়ে আমার—possession-ই যার মূল-মন্ত্র—শীগ্‌গির এ সত্য বোঝা কি সহজ? তোমায় টাকা দিয়েছি, দেহ দিয়েছি, বিলাস-উপকরণ দিয়েছি, কিন্তু এ সকলের পেছনে যে-সত্যিকার মানুষটা, তাকে কি একটা দিনের তরেও দিতে পেরেছি! তা-ই যখন দাওনি, তখন আর না। আর আমি যা হবার নয়, তার জন্যে কান্নাকাটি ক'রে মরব না। ইংরেজ ভারতকে পূর্ণ অধিকার

ক'রেও ভারতের হৃদয় যেমন জয় করতে পারেনি—প্রেম পায়নি, শ্রদ্ধা পায়নি, পায়নি এতটুকু বিশ্বাস—তেমনি ডরোথী তোমার দেহ, আদর, যত্ন সব পেয়েও তোমার দেহবাসীকে পায়নি। সে যে কী আক্রোশে আমার দিক থেকে চিরকাল মুখ ফিরিয়ে রইল কে জানে। ভারতে কখনও যদি ফিরি আবার, তোমাদের সাধু-সন্ন্যাসীকে এ-রহস্যের কথা ভেঙে ব'লে ভিতরের সত্যটা কী একবার জানবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু সেদিন কি আর আসবে কখনো?

তোমার সঙ্গে এখন আর যাতে দেখা না হয়, তাই—সাসারের এক ছোট্ট গ্রামে পালিয়ে গেলাম। দেখা-সাক্ষাতে বিশ্বাস নেই নিজেকে। ভালোবাসা ছাড়াও মানুষ যে মানুষকে এত আকর্ষণ করতে পারে, তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে তা কে জানত?

ফিরব তখন, যখন নিশ্চিত জানব যে তোমার সম্পূর্ণ মুক্তির পথ নিজেই তুমি তৈরি ক'রে নিয়েছ। বুঝতে পারলে তো কথাটা? কিংবা ডাক্তার কাওয়ান এদেশে থাকলে আমিই চেষ্টা ক'রে দেখতাম। তোমার কাছে সেটি হ'ত আমার শেষ উপহার!

আর, আমার এই শেষ প্রেমপত্রের (?) মধ্যে যা কিছু তিক্ততা রইল তার জন্যে ক্ষমা কোরো। ভাববার বেশি সময়ও পাইনি। স্পেশাল বন্দোবস্তে এ চিঠি দিনে দিনে না পাঠালে তোমার একটু অসুবিধা হ'ত। তবু আজ নেহাত পারলে না যেতে। তা হোক। একটা দিনে কী এসে যায়। কাল যাচ্ছ তো? সঙ্গে যাবে কে?

যে-ই যাক্, সুখী হও—বিদায় কালের এই শুভ-ইচ্ছাটি অন্তত আন্তরিক ব'লে জেনো।"—

পেয়ালার কফি যেমন তেমনই পড়ে রইল। কী দিচ্ছে না দেখেই ওয়েটারের হাতে একখানা দশ শিলিং-এর নোট গুঁজে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের

মতো নির্মল বাইরে ছোট গলিটাতে বেরিয়ে এলো। টেম্‌সের ধারে ধারে বহুক্ষণ পায়চারি ক'রে কত কথাই যে ভাবতে লাগল। বিগত দেড় বছরের স্মৃতি, ডরোথীকে কেন্দ্র ক'রে লণ্ডনে ও পারিসে, পাহাড়ে ও সমুদ্রে, শান্তিহীন বিলাস-জীবন—সুখ না থাকলেও মোহের ঘোর যার এখনও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি, সেই জীবন থেকে ডোরা কি সত্যিই ওকে মুক্তি দিল আজ? তাও স্বেচ্ছায়? আশ্চর্য! সেই ডোরা, যে ওকে একদিন না দেখলে উতলা হ'য়ে উঠত! কোথা থেকে এলো ওর এই মনের জোর? ঘৃণা থেকে—আত্মগ্লানি থেকে—না, নির্মলের ব্যবহারে?

দু'হাতে কপাল টিপে ধ'রে ও সেখানেই একখানা বেঞ্চের উপর ব'সে পড়ল। এই তো মুক্তি। কিন্তু নির্মলের তা'তে আনন্দ হয় না কেন? ডোরা কি জানে না যে এক ডোরা গেলেও সহস্র ডোরা আছে লণ্ডনে! পৃথিবী যতদিন নারীশূন্য না হবে ততদিন নির্মলের মুক্তি কোথায়, শান্তি কোথায়? কিন্তু তা যখন হবার নয়, এ ভুল এখনি ডরোথীকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার!

উত্তেজনার উপর উঠে দাঁড়াতেই মনে পড়ল ওর ঠিকানা জানা নেই। চিঠিখানা পকেট থেকে বের ক'রে বাতির নীচে খুলে ধ'রে দেখল ডোরা লিখেছে "—সায়ারের এক ছোট্ট গ্রামে," কিন্তু কোথায় সে গ্রাম? এতক্ষণে নির্মলের সত্যই বিশ্বাস হ'ল যে ও মিথ্যে ভয় দেখায়নি। নিছক মান-অভিমানের ব্যাপার যদি হ'ত, কোথায় গেছে তার আভাসমাত্র না দিয়ে চ'লে যেত না—খবর দেবার সকল উপায় এমন নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলত না। যে গেছে সে বড় দুঃখেই গেছে, তা'কে এ জীবনে আর ফিরে পাওয়া যাবে না—নিঃসংশয়ে বিশ্বাস হ'তেই কী একরকম শূন্যতায় নির্মলের প্রাণ মন যেন অবসন্ন হ'য়ে এলো। এদিকে নদীর হাওয়ায় আর শীতে হাত-পা জ'মে যাবার

উপক্রম। কিন্তু বাড়ি ফিরবার কথা মনে হ'তে সকল সত্তায় নিজেরই বিরুদ্ধে এক অদ্ভুত বিদ্রোহের ভাব এলো ঘনিয়ে—আবার সেই এ্যান, সেই মিসেস বার্টন? অন্তত আজকের রাতটা অসম্ভব, কাল সকালে যা হয় ভেবে দেখা যাবে।

ফিরে গিয়ে কাছেই পরিচিত এক হোটেলে আশ্রয় নিল। রাতটা কাটল ছটফট ক'রে। সকালে উঠে মনে হ'ল আজকের প্রথম ডাকেই মিসেস বার্টন ওর গতরাত্রির লেখা সেই চিঠিখানা পাবে, হয়ত এতক্ষণ পেয়েছে। সবাই জানে নির্মল লণ্ডনে নেই। হঠাৎ মনে হ'ল—লণ্ডনে এখন আর থাকাই বা কিসের জন্যে? গেলেই হয় দু'চারদিনের জন্যে বাইরে কোথাও। ততদিনে ডোরা হাঁসপাতালে ফিরে আসতেও পারে। নির্মল যদি একবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, বহুবারের মতো এবারও সে সব মিটমাট ক'রে ফেলবে। বেচারী ডোরা! বাইরে এত চপল, ভিতরে যে ওর এতখানি গভীরতা ছিল তা কে জানত? কিন্তু একটা জায়গায় ওর ভুল হয়েছে; নির্মল ভালোবাসে না ওকে, সে তো সত্যি নয়। সত্য এই যে, সেই ভালোবাসায় ও কোনো দিনই সুখ পায়নি। নিজে অসুখী হ'লে পরকে সুখী করবে সে কোন্ পুঁজিতে? ডোরা অবশ্য চেষ্টার ক্রটি করেনি, কিন্তু ও জানে না যে শুধু দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। কী দিচ্ছে প্রিয়জনকে, তাও দেখতে হয়। সকলের সুখের ধারণা কি এক, না সুখী হওয়ার ক্ষমতাই সমান? ডোরার উভয় হস্তের অকুণ্ঠ যে-দান পেলে ডাক্তার কাওয়ান নিজেকে ধন্য মনে করত, তারই গুরু ভারে নির্মলের জীবন যে হ'য়ে উঠেছে একান্ত দুর্বহ, উচ্ছৃঙ্খল! কিন্তু যে নিজেরই অন্তরের অনুভূতি দিয়ে প্রিয়জনের সুখ-দুঃখ বা সত্যিকার প্রয়োজন বুঝতে পারে না, তাকে বোঝাতে যাওয়ার মতো দুরূহ ব্যাপার সংসারে আর কী আছে? সম-অনুভূতিহীন স্নেহ বা আসক্তি যে কী ভীষণ, জীবনের প্রায় পনেরো-

আনা দুঃখের মূলই যে ওই, তার পরিচয় পেতে হ'লে সংসার ছেড়ে বহুদূরে তো যেতে হয় না। এতদিনের ঘনিষ্ঠতা বা একত্রবাসেও নির্মলের হৃদয়নিবাসী প্রকৃত পুরুষটির পরিচয় কি ডোরা কখনই পেয়েছে ?

কিন্তু ওরই বা দোষ কী ? যার যেমন মন, যেমন স্বভাব, জগতকে সে সেইভাবেই তো দেখবে ! দুঃসহ স্বেচ্ছাচার আর বিলাসিতার কূপে আকণ্ঠ নিমজ্জনের মধ্যেও যে নির্মলের শান্তিহারা প্রাণ কোন্ অমৃতের পরশের জন্যে বুভুক্ষু, উন্মুখ, অধীর হ'য়ে থাকে এবং তা পায় না ব'লেই পৃথিবীর সর্বত্র সকল কিছুর প্রতি ওর বিরক্তি ও তিক্ততার সীমা থাকে না, সে রহস্য বোঝবার মতো মনের গড়ন তো ডরোথীর নয়। ছিল বটে একজনার, কিন্তু নির্মলের ভাগ্যদোষে সে যে অস্ফুট কৈশোরেই তাকে হারিয়ে বসেছে। আরো একজন—কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাতই তো ওর জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। মরীচিকার পিছনে ভ্রান্ত মরুযাত্রীর মতো তবু প্রাণ সেই মিথ্যারই অভিসারে চায় ছুটে যেতে, বাধা পেলে কেঁদে মরে !

অন্তর-বাহিরের অন্তহীন শূন্যতা ও একান্ত নিরুদ্যম আলস্যে আরো কতক্ষণ যে নির্মল এমনিভাবে প'ড়ে থাকত কে জানে, হয়ত সারা-দিনটা এই হোটেলেই শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিত। কিন্তু দুয়ারে করাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই পুরনো পরিচিত একটি 'মেড' ঘরে ঢুকে, ওর মুখের দিকে বিলোল কটাক্ষে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে মধুরস্বরে যখন জিজ্ঞাসা করলে, "এবারেও যে বড় একা ? শ্রীমতীর এত ঘন ঘন মান হয় কেন বলতে পারেন ?"—তখন হঠাৎ কোথা থেকে যে এক অপরি-সীম লজ্জা আর ক্লিন্ন আত্মগ্লানি এসে ক্ষণেকের জন্যে ওকে প্রায় অভিভূত ক'রে ফেলল, তা ভেবে ওর নিজেরই আশ্চর্য লাগল। এমনিই ছোট ক'রে ফেলেছে নিজেকে যে হোটেলের এক সামান্য

পরিচারিকাও আজ মুখের উপর ঘনিষ্ঠ, লঘু রসিকতা করতে ছাড়ে না!

চুপ ক'রে আছে দেখে কাজের ছলে ইসাবেল আরো কাছে স'রে এসে বললে, "তাহোক, অত মন খারাপ করবার দরকার কী মিঃ বোস? আজ রাত্তিরটাও আছেন তো?" একটু অর্ধব্যঞ্জক হাসি হেসে আবার বললে, "Tivoli-তে ভালো ছবি আছে আজ।" নীচু হ'য়ে শিয়রের কাছে কী-একটা গুছিয়ে রাখতে যাবে—ক্যাপের আড়াল থেকে ঈষৎ উঁকি-মারা ইসাবেলের কুঞ্চিত কেশের একটি গুচ্ছ বোধ হয় অসাবধানতাবশতই নির্মলের কপোলে ঠেকে গেল। পাউডারের একটুখানি মিষ্ট মৃদু গন্ধ—পরক্ষণে নির্মলের সজোর আকর্ষণে ইসাবেল টাল সাম্‌লাতে না পেরে খাটের উপর ওর বুকের কাছে লুটিয়ে পড়ল। খিল্ খিল্ ক'রে হেসে রঙ্গিনী বললে, "তবু ভালো, এতক্ষণ যেরকম মুখ গোম্‌ড়া ক'রে ছিলে, ভাবলাম হয়ত বা ঠাকরুণই মাথার দিব্যি দিয়ে—"

কথা শেষ হবার আগেই নির্মল চকিত হ'য়ে ওর হাত ছেড়ে দিল।

অবাক হ'য়ে ইসাবেল বললে, "কী হ'ল?"

"কিছু না।" নির্মল তাড়াতাড়ি ওপাশের বারান্দা ঘুরে স্নানের ঘরের দিকে চলল।

এক মিনিট অপ্রতিভের মতো দাঁড়িয়ে থেকে ঘাড়টা ঈষৎ উঁচু ক'রে ক্রুদ্ধ ইসাবেল মনে মনে বললে, "ডার্কিকে বোঝাই দায়। আজ এমন, কাল তেমন—একবার একটা কাজ যদি ক'রেই ফেলল তো তার জন্যে দশবার হা-হুতাশ! সাধে ঠাকরুণটির সঙ্গে লাগে অমন চব্বিশ ঘণ্টাই! সাদা-কালোয় মিলন!—এজন্মে নয়! জীবনটা কাটবে লড়াই ক'রেই—" আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিপর্যস্ত চুলের গুচ্ছ সযত্নে যথা-স্থানে বিন্যস্ত করতে করতে নিজের যৌবনফুল্ল মোহন মুখখানার দিকে

তাকিয়ে ইসাবেলের মেজাজ চট্ ক'রে ভালো হ'য়ে গেল। রাঙা অধরে ঈষৎ হেসে ঘাড় দুলিয়ে বললে, "আবার যদি এখনি ফিরে না আসে তো কী বলেছি। জানি তো ওকে!"

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে প্রতি মুহূর্তেই নির্মলের প্রত্যাগমন আশা ক'রে যথাসম্ভব দেরি করতে লাগল। অবশেষে যখন নির্দিষ্ট সময় নিতান্তই উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল, তখন বাধ্য হ'য়ে অন্য ঘরে যাবার মুখে বারবার সতৃষ্ণ নয়নে ইতস্তত দেখতে দেখতে গেল। কিন্তু খুঁজছিল যাকে, তার দেখা আর পাওয়া গেল না।

ফিরে আসবে কি, ঘৃণায় লজ্জায় নির্মলের ইচ্ছা করছিল এখনই এই হোটেল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ডরোথী কি সাধে অমন চিঠি লিখেছে! সুপ্রিয়াও কি শুধু শুধুই প্রত্যাখ্যান করেছে ওর প্রেম। ওদের অন্তর্যামীর কাছে নির্মল নিজের স্বভাব গোপন রাখতে পারেনি, তাই না সবাই বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়—এমন কি ডোরার মতো মেয়ে, স্বয়ং যে অদ্বিতীয় ফ্লার্ট?

দু'দিন পরে বন্ধুমহলেও যখন প্রচার হ'য়ে পড়বে সব কথা, সবাই জানবে ডরোথী ওকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, তখন নিন্দার এবং টিটকারীর সে-কলরোল ও থামাবে কী দিয়ে? এতদিন সকল দোষ পরের ঘাড়ে চাপিয়ে—ভগবান এবং মানুষের উপর ব্যর্থ অভিমান ও আক্রোশে অন্ধ হ'য়ে নিজের দিকটা কী ক'রে একেবারেই ভুলে বসেছিল? এই ইসাবেল, ওই এ্যান, মিসেস বার্টন, চাইনিজের সেই কেরোলাইন—

বেচারী, বেচারী ডোরা!

এই 'বেচারী ডোরা' কথাটা কতবার কতরকমে যে ও মনের মাঝে আবৃত্তি ক'রে চলল তার ঠিক নেই। কোনো একটা খবর পাওয়ামাত্র নিজে গিয়েই হোক বা চিঠি লিখে হোক, ক্ষমা চাওয়াও স্থির ক'রে

ফেলেছে আগেই। তবু নিজের অন্তরে একথাটা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারলে না যে ডরোথীর এরকম হঠাৎ চ'লে যাওয়ায় কেমন ক'রে যেন একটা মস্ত গ্রন্থি কেটে গেছে ওর জীবনের। মনের মধ্যে এই অহেতুক স্বস্তিবোধের জন্যে বারবার ও সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠতে লাগল; ডোরার প্রতি কতদিনকার কত স্নেহহীন ব্যবহার স্মরণ ক'রে দুঃখিত অনুতপ্ত হ'য়ে ভবিষ্যতে আর যাতে সেরকম না হয়—এই ব'লে বিবেককে কষাঘাত করতেও ছাড়ল না। তবু জেগে রইল সেই অদম্য ইচ্ছা—আজই, এখনই লণ্ডন ও তার স্মৃতি, তার পারিপার্শ্বিক সকল আবহাওয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে, আর কোথাও পালিয়ে যাওয়া। কোথায় গেলে দিনকতক সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে পারবে এইসব হোটেল রেস্তোরাঁ, হ্যাম্পস্টেডের সে-বাড়ি—যেখানে রয়েছে মূর্তিমান কুগ্রহের মতো হাতের কাছে সহজ-লভ্যা এ্যান, কুটিলা মিসেস বার্টন! কোথায় গেলে দু'দিনের এই অপ্রত্যাশিত নব-লব্ধ মুক্তিকে নির্মল একান্তই আপনভাবে ভোগ করতে পারবে!

ভাবতে ভাবতে এক উচ্ছ্বসিত আবেগ ও অহেতুক আনন্দে সারা অন্তর এমন উদ্বেল হ'য়ে উঠল যে, অভিমানিনী প্রেমিকার মান-ভাঙানোরূপ কর্তব্যও তখনকার মতো তুচ্ছ হ'য়ে গেল। নতুন ক'রে জিনিষপত্র গুছিয়ে, তাড়াতাড়ি সামান্য কিছু খেয়ে বিল মিটিয়ে দেবার জন্যে নীচে নামতেই সিঁড়ির কাছে ইসাবেলের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। একখানা দশ শিলিং-এর নোট জোর ক'রে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে একরকম দৌড়তে দৌড়তে নির্মল বললে, "বিদায়, ইসাবেল।"

"সে কি, কোথায়? আবার কবে—"

ততক্ষণে নির্মল অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো সেদিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে ইসাবেল উপরে উঠে গেল। হাতের নোটখানার দিকে তাকিয়ে মনে

মনে ভাবলে, "ডার্কি হোক, যা-ই হোক, ওর প্রাণটা কিন্তু মস্ত। এমন লোক পথে-ঘাটে মেলে না। কিন্তু কী যেন ঘটেছে আজ, জানতে পারলে হ'ত। এদের বন্ধুত্ব বজায় রাখলে লাভ আছে।"

তবু, এক মলিনকান্তি নগণ্য ভারতবাসীর হাত থেকে পাওয়া এতখানি উপেক্ষার বেদনা বহুদিন পর্যন্ত ইসাবেলের মনে গাঁথা হ'য়ে রইল।

এতদিন লণ্ডন-প্রবাসের মধ্যে এই প্রথম নির্মল সুন্দরী রমণীর উদ্ধত চটুল প্রণয়-নিবেদনকে যথার্থ অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করতে পারল। আত্মশক্তির একটা দিকের এই হঠাৎ আবিষ্কারের বিস্ময়-পুলকে ওর পক্ষে বোধ হয় অশান্তর মতন অবিবেচক বন্ধুকেও তখন-তখনই ক্ষমা ক'রে পূর্বের সহজ সম্পর্কে ফিরে আসা অসম্ভব হ'ত না। এমন কি বহুদিনের মতো ইংলণ্ড ছেড়ে দূর দেশে চ'লে যাবার আগে অশান্তকে একবার দেখে যাবার ইচ্ছা থেকে থেকে এতই প্রবল হ'য়ে উঠতে লাগল যে, কী করা উচিত মন স্থির করতেই সারা সকালটা কেটে গেল। দুপুরে মনে হ'ল, বন্ধুর সেই অন্যায় অকারণ রাগ এখনও যদি তেমনি প্রবল থাকে তবে যাওয়া বৃথা। বরং যে-প্রসন্নতায় অনেকদিনের পরে আজ এই প্রথম ওর উন্মুখ চিত্ত নববর্ষার প্রথম সিঞ্চনে তাপদগ্ধা ধূলি-ধূসরিতা ধরিত্রীরই মতো স্নাত ধৌত হ'য়ে উঠেছে, সেটুকু হবে অন্তর্হিত। বাকি যা থাকবে, তা আবার যে ওকে কোন্ রসাতলে টেনে নিয়ে যাবে এবং ঝোঁকটা পুনরায় সেদিকে মোড় নিলে এ-জীবনে নিজের জন্যে আশা বা আকাঙ্ক্ষা করবার কিছুই আর থাকবে কিনা ভাবতেও সাহস হ'ল না ওর।

তবু এ কী আশ্চর্য! লণ্ডন থেকে বহুদূরে যাবার কল্পনামাত্রই, কোথায় কোন্ প্রিয়তমকে পশ্চাতে নিরুপায়, একাকী ফেলে যাওয়ার বেদনার মতো কিসে যেন ভিতরে ভিতরে—বড়ই গোপনে—মনটাকে

ওর পীড়িত সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে লাগল। অবসর ছিল না, নইলে সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে নিজেই অবাক হ'য়ে যেত। তবু, অর্ধচেতন মনের অজানা প্রেরণাতেই বোধ হয় ইংলণ্ডের মায়া কাটাতে পারলে না। তখন ঠিক করলে, দিনকয়েকের জন্যে Stratford-on-Avon-এ গিয়ে সেক্স্‌পীয়রের কুটীর দেখে আসবে।

সেদিনই বার্মিংহাম এবং পরদিন সকালে Stratford-on-Avon.

কর্মচঞ্চল জনতাবহুল লণ্ডন থেকে হঠাৎ আসার জন্যে কিনা কে জানে, Stratford-এ নামতেই এক অপূর্ব শান্তি ও স্নিগ্ধতা নির্মলের সমস্ত প্রাণে যেন সুধা মাখিয়ে দিলে।

সেক্স্‌পীয়রের কুটীরখানিতে নির্জনতার অবকাশ নেই। এখন বিদেশী লোক, বিশেষ ক'রে আমেরিকান টুরিস্টদের আসার সময় না হ'লেও নির্মলের মতো অসময়ের অতিথি বা ভবঘুরের অভাব নেই। কোনোমতে সে-বাড়ি দেখা শেষ ক'রে এ্যান হ্যাথাওয়ের কুটীরের উদ্দেশে যেতে যেতে রাস্তার দু'ধারের ছোট ছোট আবাস, ফলভারে নত আপেল গাছ, বাঁদিকে একটুখানি মাঠের মধ্যে চাষীদের মটরশুঁটি, মুলা, শালগম ইত্যাদির ক্ষেত—তারই আশেপাশে ইতস্তত দু'চারটি গৃহপালিত সাদা শূকর, ইংলণ্ডের এই নতুন রূপ ও দৃশ্যে নির্মলের শ্রান্ত মন রঙে রসে সিঞ্চিত হ'য়ে উঠল।

এ্যান হ্যাথাওয়ের কুটীর দেখা যখন শেষ হ'ল, মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে কুটীরের ডানদিকে একটুখানি পোড়ো-ভিটার মতো উঁচু জায়গায় একটা আপেলগাছের ছায়ায় শুয়ে শরৎপ্রভাত-তুল্য স্নিগ্ধোজ্জ্বল সুনীল আকাশের দিকে তাকিয়ে নির্মল মনে মনে বললে, "আর আমি বার্মিংহামে ফিরছিনে, লণ্ডনে তো নয়ই। এবার থেকে এরকম সহর ছেড়ে দূরে কোনো গ্রামের একান্তে এম্‌নি একটি কুঁড়েতেই রচব আমার অনাড়ম্বর অজ্ঞাতবাসের নীড়খানি। মঞ্জুশ্রী পল্লীমায়ের

স্নেহালিঙ্গনে নিজেকে এমনি নিশ্চিন্ত আরামে সঁপে দিয়ে কলা-লক্ষ্মীর বর-লাভের সাধনায় কাটিয়ে দেব দিনের পর দিন—সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল। কেউ জানবে না কোথায় আছি।" একটুখানি চুপ ক'রে থেকে আবার ভাবতে লাগল, "এই নগণ্য গ্রামের ওই সামান্য কুটীরে, চারপাশের এই অতি সাধারণ আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়েও সেক্‌স্‌পীয়র অমর সাহিত্য রচনা ক'রে গেছেন। পারিপার্শ্বিক আবহ মানুষকে গড়ে, না মানুষই তার আবেষ্টনীকে গ'ড়ে তোলে? এখানকার আলো-ছায়ায় এই যে অপূর্ব প্রেরণার আভাস পাচ্ছি আমার অন্তরে, এ কোথা থেকে এলো—তা ভেবে আর আমি নিজেকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলব না। এ আমারই নিজস্ব জিনিষ, না সেক্‌স্‌পীয়রের স্মৃতিমণ্ডিত স্থানমাহাত্ম্য, তাও জেনে আমার লাভ কী? বরং কতদিন পরে—যাঁর কৃপায়ই হোক, এই যে শান্তি ফিরে পেলাম, ফিরে পেলাম নতুন শিল্প-সৃজনের প্রেরণা, তাঁকে আজ আমার অন্তরের নতি জানিয়ে নবজীবন স্থরু ক'রে দিই। প্রিয়া সঙ্গিনীলাভের জন্যেও আর আমি ভাবব না। আর্টকেই সহায় ক'রে অন্তরের মধ্যে দেব ডুব। পথের রেখা যদি কোথাও ফোটে, ফুটবে সেই ধ্যানময় নিস্তব্ধতার মধ্যেই। বাইরে কোথাও নয়, কোথাও নয়! বাইরের জগত আমায় বড্ড ভুলিয়েছে। এবার থেকে নিরালায়—একলা!"

অল্পকালের মধ্যে অপরিমিত ভোগ ও বহির্মুখিতার ফলে অবসন্ন শ্রান্ত মন-প্রাণ যখন এমনি ক'রে নির্জনবাসের জন্যে তৃষার্ত হ'য়ে উঠেছে, Stratford-এর নিঃসঙ্গ মুক্ত প্রান্তরে, জনবিরল মেঠো পথ-প্রান্তে, গৃহকর্ত্রীর ক্ষুদ্র কুটীর-লগ্ন অপরিসর ফলের বাগানে এক একটি মধুর স্বপ্নের মতো দিনের পরে দিন যাচ্ছে কেটে, তখন প্রতিবেশিনী মিসেস লাভ্‌লেস্ এক সুখবর নিয়ে এলো।

নির্মল থাকে গ্রামের একেবারে একান্তে। সেক্‌স্‌পীয়রের

কুটীরের অনতিদূরে বেড়াতে গিয়ে একদিন রাস্তায় ক্রীড়ারত একটি সুন্দর শিশুকে দেখে নব-কল্পিত এঞ্জেলের ছবি-খানার মডেল করতে ইচ্ছা হয়। সন্ধানে জানা গেল ছেলেটি এক গরীব বিধবার। তখন থেকে নানারকম যুক্তির অবতারণা বা পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়েও আজ পর্যন্ত নির্মল কিছুতেই বিধবাকে ঘণ্টাখানেকের জন্যেও ছেলেটিকে একলা ওর কাছে রেখে যেতে রাজি করাতে পারেনি। ও বলে, "তুমি যদি নেহাত টমের ছবি আঁকতে চাও, তবে আমিও এখানে ব'সে থাকব। যতক্ষণ তোমার দরকার ততক্ষণই রাখতে পারো ওকে, কিন্তু একলা কিছুতেই নয়।"

নির্মল জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, খুলে বলো তো তোমার এত ভয় কিসের ?"

মেয়েটি লজ্জিত হ'য়ে বললে, "ভয় ? না, না, ভয়ের কথা হচ্ছে না।"

নির্মল বিরক্ত হ'য়ে বললে, "মিথ্যে কথা। যাও, তোমার সঙ্গে কাজ করা মুস্কিল হবে।"

মেয়েটি এবার কেঁদে ফেললে, "টমির বাবা নেই, সংসারে আমি একলা মানুষ—"

"তাতেই বা কী ? তোমার আপত্তির কারণটা ঠিক বুঝতেই পারলাম না মিসেস জোন্স্। বিনা পারিশ্রমিকে তোমার ছেলেকে বসতে বলিনি এখানে।"

"তা কি জানি না সার্ ? গরীবের উপর কত যে অনুগ্রহ, তা এরই মধ্যে সকলের মুখে মুখে। কাউকে একটা পয়সা ঠকানো নেই, বরং—এই সেদিনও মিসেস লাভ্‌লেস্ বলছিল—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ওসব থাক্। কাজের কথাই বলো। টমির সঙ্গে তোমারও এখানে ব'সে থাকায় আমার নানা আপত্তি; আর্টিস্টদের

'মুড' কখন কী রকম থাকে দেবতারাও বলতে পারেন না, তাছাড়া রুচিও ঠিক তোমার মতন নয়, আর মেজাজ!—"

মিসেস জোন্স্ ফিক্ ক'রে হেসেই অপ্রতিভ হ'য়ে চেয়ে রইল!

"নাঃ, তোমায় এত কথা বোঝানোও এক দায়! সোজা দিকটাই ভেবে দেখ না—কাজকর্ম ফেলে এখানে ব'সে থাকবে, লোকসান নয়?"

উত্তরের জন্যে যেন তৈরিই ছিল, এমনিভাবে মিসেস জোন্স্ বললে, "টমিকে যদি নেহাৎ চান—মাঠের কাজে আজকাল ঘণ্টায় আড়াই-শিলিং ক'রে পাই, আপনাদের কাছে ওকি আবার একটা পয়সা?"

রাগে নির্মল খানিকক্ষণ জবাবই দিতে পারলে না। পেটে পেটে এত বুদ্ধি—গরজ বুঝে!

সেদিন মিসেস জোন্স্ প্রায় কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে, মনে আর মুখে 'ডার্কি'-মাত্রেরই মুণ্ডপাত করতে করতে বাড়ি ফিরল।

ছোট্ট টমের আশা ছেড়ে দিয়ে নির্মল অন্য শিশুর সন্ধান করবে কিনা ভাবছে, মিসেস লাভ্‌লেস্ একদিন বললে, "মিঃ বোস, কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি। সারা জোন্স্ খাঁটি পাড়াগাঁয়ে মেয়ে, মাথাটা নানান্ কুসংস্কারে ভরা। টমের উপর পাছে কিছুর দৃষ্টি পড়ে—এই, যাকে বলে 'চার্ম'—সলজ্জে মিসেস লাভ্‌লেস্ নির্মলের বিস্মিত চোখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলে।

মিনিটখানেক নীরবে চেয়ে থেকে নির্মল হঠাৎ হেসে উঠল, "ও, এই ব্যাপার? খুলে বললেই হ'ত! ভাবলাম বুঝি পয়সার লোভে—"

"অবিশ্যি, সম্ভব হ'লে বেশি পয়সা রোজগার করতেও কে না চায়? কিন্তু ওর আসল ভয়টা—"

“এই যে, ওথেলোর জ্ঞাতিভাই ওর ছেলেকে যাদু ক’রে নিয়ে পালাবে, কিংবা অমন মোহন লাবণ্য দৃষ্টি দিয়ে শুষে শুকিয়ে ফেলবে। নিজের জন্যে ভয় নেই ওর ?”

মিসেস লাভ্‌লেস্‌ একটু হেসে বললে, “বোকা মেয়েটার উপর আপনি রাগ করবেন না মিঃ বোস। আমরা বুঝিয়ে-শুঝিয়ে বলাতে ওর ভয় ভেঙেছে ; আর একবার বললেই টমিকে দিয়ে যাবে। বিধবা ভারি গরীব।”

নির্মল বললে, “প্রতি সীটিং-এ যা দেব ভেবেছিলাম, না হয় আরো কিছু বেশিই দেওয়া যাবে। কিন্তু শ্রীমতীর আমার ঘরে ব’সে থাকার প্রস্তাব অচল।”

“নিশ্চয়। লোকেও দশকথা বলতে কতক্ষণ ? পাড়াগাঁ বই তো নয়, কিছুই কারো নজর এড়ায় না।”

সারা জোন্স্‌ মজুরের মেয়ে, মজুরের ঘরণী, আবাল্য খেটে খাওয়া অভ্যাস, কঠিন লম্বা-চওড়া গড়ন, তবু এক-ধরণের সুন্দরী। বিদেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে আর হয়ত বিয়েই হবে না, ভয় দেখাতেই জেদ ছেড়ে দিল।

দু’চারদিনের যাতায়াতে টম এই অপরূপ “ডার্কি জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান”-এর এমন অনুগত হ’য়ে পড়ল যে ছবির জন্যে বসার সময় উত্তীর্ণ হ’য়ে গেলেও নির্মলের ঘর থেকে নড়তে চায় না। অগত্যা বিকেলের দিকে নির্মলই ওকে নিজে সঙ্গে ক’রে বাড়ি রেখে আসে।

সেদিনও টমকে নিয়ে মটরশুঁটি ও বাঁধাকপির ক্ষেতের ভিতর দিয়ে, নানারকম ছেলেভুলানো গল্প বলতে বলতে সেক্‌স্‌পীয়রের বাড়ির দিকে চলেছিল। কথা ও গল্পের মাঝখানে প্রায়ই নির্মল ঝুঁকে প’ড়ে, একটি দু’টি মেঠো ফুল তুলে সুন্দর তোড়া বানিয়েছে। অনেকক্ষণ

থেকে টম সেটি হস্তগত করবার লোভে নানা ফন্দিফিকির ক'রে অকৃত-কার্য হ'য়ে শেষটা যখন লাল ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করবে ভাবছে এবং নির্মলও নিছক মজা দেখবার জন্যেই তোড়াটা দিচ্ছে না, তখন হঠাৎ ফুলের বায়না ছেড়ে নির্মলের কোলের কাছে স'রে এসে কোটের প্রান্ত চেপে ধ'রে সোল্লাসে টম বললে, "দার্কি!"

"কী, গাল দেওয়া হচ্ছে আবার?"

"না, ওই দার্কি!" আপেলশুদ্ধ নধর হাতখানি তুলে টম রাস্তার দিকে দেখালে। মুহূর্তের মধ্যে নির্মল যেন পাথর হ'য়ে গেল। ঠিক সামনে, মাত্র কয়েকহাত দূরে, রাস্তার উপর চারজন ভারতবাসী। পালাবার পথ নেই, নইলে নির্মল পালাত।

একটি মেয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে এলো। কলের পুতুলের মতো, অভ্যাসবশতই, ধীরে ধীরে নির্মল টুপি খুলে নমস্কার করলে। দেখা-দেখি টমও ছোট্ট ক্যাপ্‌টা খুলে চেয়ে রইল। কাছে এসে টুক্‌টুকে গালে হাত বুলিয়ে রেণু বললে, "তুমি কে গো খোকা?"

উত্তরের জন্যে খোকা ডাগর চোখ তুলে নির্মলের মুখের দিকে তাকাল। নিশ্বাস ফেলে রেণু বললে, "ভাবতে ইচ্ছা হয় যে ভগবান আছেন! কে জানত যাবার আগে চোখের দেখাটাও হবে।"

সে রাত্রেই রেণুরা বার্মিংহামে হোটেলে ফিরে গেল। যাবার সময় নির্মলকে বলল দিনদুই পরে এডিনবরায় রওনা হবার কথা, ইতিমধ্যে —যদি ওর আপত্তি না থাকে, আর একটিবার যেন দেখা হয়।

ওদের ট্রেণে উঠিয়ে দিয়ে ফিরবার পথে নির্মল আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ভালো ক'রে ভেবে দেখতে চাইল, কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত অতর্কিত সাক্ষাতে সকল ভাবনা-চিন্তা যেন স্তব্ধ অসাড় হ'য়ে গেছে। কেবল কী এক তীব্র অনুভূতি বারবার ওর নিঝুম

মনটাকে এই সত্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিতে চাইছিল যে, ঠিক এমনি ধরণের কিছু একটা নিগূঢ় প্রত্যাশায়ই যেন লণ্ডন থেকে বেশি দূরে সে যেতে পারেনি। আজ হোক বা কাল হোক, সুপ্রিয়াকে আর একটিবার দেখা, অনুপম ও রেণুদির কাছে ক্ষমা চাওয়া—তারপর চিরদিনের মতো ইংলণ্ডের বাস তুলে দিয়ে সুদূর ইটালীতে আত্ম-গোপন, অন্তত তত্‌দিন অটুট নিভৃতি যতদিন ডরোথী বা তার দাবী অনুসরণ ক'রে না বেড়ায়!···আবার সাক্ষাতের এই গোপন-আকাঙ্ক্ষাতেই কি লণ্ডন ছাড়বার সময় মন এমন ব্যথিত আকুল হ'য়ে উঠেছিল! বিশ্বাস করতে যেন সাহস হয় না! কী এমন পুণ্য করেছে নির্মল যে, সকল মান-অপমান তুচ্ছ ক'রে, কোনো প্রতিদান না পাওয়া সত্ত্বেও সুপ্রিয়াকে, এবং মানুষকে, ভালবাসতে পারবে এতখানি? আর—ভালোই যদি না বাসে, তবে এত দুর্ঘটনার পরেও, দেখা হ'তেই বা এত আনন্দ আসে কোথা থেকে? রেণুদির উপর এই স্নেহ, অনুপমের প্রতি সে শ্রদ্ধা—ঈর্ষাও যার দীপ্তি ম্লান করতে পারেনি, সমস্তই বজায় রইল কী ক'রে? অন্তরের অতলে এই যে জ্বলছে আলো, যতই ক্ষীণ হোক, সে কিসের?

সুপ্রিয়া, না-ই ভালোবাসলে তুমি, না-ই বুঝলে দুর্বল একলা হৃদয়ের ব্যথা! বরং এই যে কতদিন ধ'রে কঠোর অগ্নিপরীক্ষা হ'য়ে গেল, এ ভালোই হ'ল। ডরোথীপ্রমুখ রূপসীরা মন থেকে আজ বহু দূরে। সত্য বস্তুটিই কেবল শত আঘাতেও ভাঙেনি। তাই, আর তাকে অস্বীকার ক'রে মিথ্যার বোঝা বাড়াবে না, জড়িয়ে পড়বে না অসত্যের জালে। নিজেরই মধ্যে যে-ফাঁকি ছিল আজ তা ধরা পড়েছে। নির্মল যে ঊর্ধ্ব-অভীপ্সার সুন্দর আবেগে নবীন ঊষায় অরুণস্নাতা সুপ্রিয়াকে সুন্দরেরই দান ব'লে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল, সেই সুদূর-আরোহী প্রেম সে ভুলেছিল কী ক'রে? প্রিয়ের কল্যাণকামনা

পর্যন্ত ভুলে গিয়ে হীন লালসাজীবির মতো অদম্য আত্মপরায়ণতা—এই কি ওর আদর্শ, সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি যার প্রেরণায় ও ডায়েরীর এক জায়গায় সেরাত্রে লিখে রেখেছিল, "আজ প্রভাতে সূর্যমুখী ওই মেয়েটির মুখের দীপ্ত-বিভায় মুহূর্তে তাকে চিনে নিলাম।"

ঘরে ফিরে নির্মল ডায়েরী খুলে পাতার পর পাতা উল্টিয়ে যেতে লাগল। কিসে যে ওকে এসব লিখিয়েছিল কে জানে। এ কী শুধু সেন্টিমেণ্ট? কিন্তু যে-ভাবনা মানুষকে বড় করে—ছোট হ'তে দেয় না—হ'লই বা তা সেন্টিমেণ্ট!

তারপর অনেক রাত অবধি অনেক কথা ভেবে অবশেষে ওর মন স্থির হল: বার্মিংহামে দেখা করতে যাওয়া হ'তেই পারে না। হঠাৎ সাক্ষাতে চাপা-পড়া ভালোবাসা জেগে উঠেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরের জন্যে সেই চিরন্তন আগ্রহ। কিন্তু বারবার দেখা হ'লে সেই সর্বনেশে ক্ষুধাও যে আবার জাগবে না, তার নিশ্চয়তা কী? বরং এইই ভালো, এমনি মধুর শান্তির মাঝেই অতীত জীবনের উপর পড়ুক যবনিকা, নতুন হোক সুরু। পাততাড়ি গুটিয়ে এবার ছেলেখেলার পাঠশালা তুলে দিতে হবে। ভোগ তো অনেক হ'ল, দুঃখও কম জুটল না অদৃষ্টে। পঁচিশের কোঠায় পৌঁছবার আগেই পঞ্চাশবছরের বুড়োর মতো শুষ্ক নীরস মনে হচ্ছে জীবনটাকে ও জগতকে। প্রমোদের নেশাকে রসের সন্ধান, নারীর রূপভোগকে সুন্দরের পূজা নাম দিয়ে কতদিন আর লালন করবে এই দানবটাকে? এই গ্রামে মাসখানেকের সংযত জীবনযাত্রায় আপন অন্তরের যে শুচি-স্নিগ্ধ রূপটি ধীরে ধীরে প্রকাশ হ'তে চেয়েছে, উপরের যে-বুদ্ধি বহুবার এক বিস্তৃত, উদার ও উন্নত জীবনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে; সে-রূপ, সে-জীবন, সে-রস যে সম্পূর্ণ অন্য জগতের জিনিষ। সুপ্রিয়ার সঙ্গে আবার দেখা উপলক্ষ্য হ'য়ে এই অন্তর্জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওকে

আর একটু তাড়াতাড়ি সচেতন ক'রে দিয়ে গেল—এইমাত্র। অন্তরের সুপ্ত সত্যকে এবার ফুটিয়ে তোলাই হোক ওর সাধনা।…

পরদিন পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নির্মলের ঘুম ভাঙল। সুপ্রিয়ার শান্ত ভদ্র ব্যবহার স্মরণ ক'রে কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে ওঠে। সারাক্ষণই ও কী রকম নীরব আর বিষণ্ণ সংকোচের সঙ্গে চলাফেরা করছিল; অশান্ত নিশ্চয় সেদিনের শেষ কথাগুলো ওকে বলতে বাকি রাখেনি, তাই বুঝি সুপ্রিয়ার মুখ অত মলিন? মিছামিছি কতকগুলো রূঢ় কথা ওর মনে গেঁথে রইল চিরদিনের জন্যে। কিন্তু প্রতিকারের পথ কই? নিজের ব্যবহারের স্বপক্ষে কিছু বলতে যাওয়া এখন একেবারে অসম্ভব, কেবল সুপ্রিয়া অন্যের ব'লেই নয়, নির্মলের নিজেরও সেই স্বাধীনতা আর নাই। মানুষের চোখে আর এখন যে ওর কাউকেই ভালোবাসবার অধিকার নেই।

ভাবতেই প্রশান্ত আকাশে বিন্দু বিন্দু কালো মেঘের সঞ্চার। জোর ক'রে সকল দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে নির্মল বাইরের আলোয় বেরিয়ে যায়। দ্রুত পা চালিয়ে মাঠের দিকে যেতে যেতে ভাবে, আর সপ্তাহ-খানেক, এঞ্জেলের ছবিখানা শেষ হবে। লণ্ডনে সার্ রথেনস্টাইনকে দেখিয়ে তাঁর মতামত জানতে যেটুকু দেরি। তারপরেই ইটালির সুনীল আকাশ, সবুজ ক্ষেত, উজ্জ্বল রোদ। সুন্দরী প্রকৃতি!…মা কিন্তু কান্নাকাটি করবেন। আর ডরোথী! যত টাকা চায়, তা-ই দিয়ে শান্ত করা যাবে ওকে। ওর যেখানে যেভাবে খুসি থাকবে, কিন্তু নির্মলের সঙ্গে আর নয়। শুধু ডোরা নয়, কখনো কোনো মেয়েই নয় আর। ভাগ্যিস্ সুপ্রিয়াকে পায়নি, ওর অতি বড় সৌভাগ্য যে পাবার পথে প্রথম থেকেই ছিল অসংখ্য বাধা, আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে এখন তা একেবারেই অসম্ভব। বাধারূপে ডোরাই হয়েছে সহায়। কে

জানত কণ্টকই হ'য়ে দাঁড়াবে রক্ষক! তা নইলে, সুপ্রিয়াকে পাবার—ওর হৃদয় জয় করবার একটুখানি আশা বা সুযোগ থাকলে নিজের অন্তরতমের প্রতি আর কি সে ফিরেও দেখত?

দুপুরে মাস্টার টমাসের কাছে হেসে যাবার কথাটা পাড়তেই সে সোৎসাহে বলে উঠল, "আমিও দাবো কিন্তু।"

নির্মল ওর গাল টিপে গলার স্বর নকল ক'রে বললে, "দাবে বই কি! দু'পা এগিয়ে ওই খেলার মাঠে যাওয়া কিনা! লক্ষ্মী ছেলে—মায়ের কাছে থাকবে।"

টমের মুখে আষাঢ়ের মেঘ নেমে এলো। নির্মল সস্নেহে বললে, "ওরে বোকা, যেতে এখনো দেরি আছে। এ ছবি শেষ হোক, তবে তো যাবো।"

"আমায় সঙ্গে নেবে?"

শিশুদের ফাঁকি দিয়ে ভোলানো নির্মলের ভারি অপছন্দ। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর ধীরে ধীরে বললে, "সে দেশ অনেক দূর, টমি। ছোট্ট ছেলে তুমি, যখন বড় হবে—আচ্ছা, মন কেমন করবে আমার জন্যে?"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে টম বললে, "নাঃ।"

নির্মল ঈষৎ বিস্মিত হ'ল, "না? তবে যে ভারি আব্দার ধরেছ সঙ্গে যাবো ব'লে?"

মিনিটখানেক কোনো উত্তর নেই। তারপর অকস্মাৎ কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে টম ডেকে উঠল, "Mummy!"

নির্মল অবাক হ'য়ে গেল, "ওকি? আচ্ছা আচ্ছা, নেমে আয়, এই নে আপেল।"

টম ক্ষুদ্র মুঠি দিয়ে ওর হাতখানা সজোরে ঠেলে দিল, "মার কাছে দাবো, তুমি দুষ্টু ছেলে।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে নির্মলের চোখের কোণ সজল হ'য়ে এলো, কোলে তুলে নিয়ে বললে, "আচ্ছা, স্কুলে যাবি? চার্লি আর রুবির মতো লাল টুপি প'রে?"

লাল টুপির নামে টমাসের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। নির্মল বললে, "তাহ'লে কিন্তু আর রাস্তায় রাস্তায় ধুলোকাদা মেখে ভূত সেজে বেড়াতে পারবে না। খেলা শুধু স্কুলের মাঠে, রাস্তার দুষ্টুদের সঙ্গে নয়। আমার দেশের লোক দেখলে আঙুল উঁচিয়ে পিছনে হাততালি দিয়ে 'ডার্কি' ব'লে চেঁচানো নিষেধ। মোটের উপর, শান্ত শিষ্ট ভদ্দরলোকটি হ'য়ে থাকা চাই। রাজি?"

টম ভয়ে ভয়ে বললে, "চার্লিও দার্কি বলে।"

"তুই বলিস কেন?"

একটু ভেবে টম বললে, "তোমার নাম কী?"

নির্মল তুলিটা উঠিয়ে নিলে, হেসে বললে, "এই তো বেশ চালাক ছেলে। নাম আমার—নির্মল। বল্ দেখি?"

টম মুখে আঙুল পুরে চুপ ক'রে রইল।

"কী হ'ল? আচ্ছা, আর একটা নামও আছে আমার। সেইটে বল্—মিঃ বাসু।......কই, বললিনে?"

টম সতেজে ব'লে উঠল, "বিচ্ছিরি! বিচ্ছিরি!"

"ওঃ—ডার্কি ডাকতেই যত আমোদ, না? বেশ, তোকে যদি কেউ বলে—'হ্যালো হোয়াইট্ পিগ্!'—"

"দাঃ—"

ছেলেমানুষের সঙ্গে এমনি খেলা-ধুলোর ভিতর দিয়ে ছবি আঁকতে দুপুরটা কোনোমতে কেটে গেল, কিন্তু বিকালটা যেন আর কাটতে

চায় না। থেকে থেকে মনটা বার্মিংহামে দেয় ছুট; কল্পনায় রেণুদির উদ্‌গ্রীব মুখ, সুপ্রিয়ার বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টি, প্রফুল্ল আর অনুপমের বিস্মিত প্রশ্নোত্তর মনের মাঝে নিরন্তর আনাগোনা ক'রে বেড়ায়। আজকের রাত কাটলে শুধু কাল সকালটা, তারপরেই ওরা বার্মিংহাম ছেড়ে চ'লে যাবে। নির্মলকে আর কখনো ডাকবে না, রেণুদিও না! কেনই বা ডাকবে আর। ওরা জেনে গেল ওকে উচ্ছৃঙ্খল, খেয়ালী ব'লে! চিরজীবনের মতো গেল সব—

নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষায় নির্মলের প্রাণে যেন আগুন জ্ব'লে উঠল। এ চিত্তদাহ—এ-ই কি কালকের সেই স্নিগ্ধ শান্ত ভালোবাসা? ঠিক একেই যে ভয় ওর!

টমকে তার মায়ের কাছে রেখে ফিরৃতি পথে নিজের বিকল অবস্থা লক্ষ্য ক'রে ভীত নির্মল আবার সারা জোন্সের কুটীরের দিকে চলল। যত শীগ্‌গীর সম্ভব এদেশ ছেড়ে পালানো চাই। টমের লেখাপড়ার কথাটা আজই হ'য়ে যাক। মিসেস জোন্স ভয়ানক হৈ-চৈ করবে, সে এক মুস্কিল। টাকাটাও ওর হাতে দেওয়া চলবে না। অভাবে পড়লে শেষ ক'রে দেবে; ওর ভবিষ্যৎ স্বামীই যে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখবে টমকে, তারই বা নিশ্চয়তা কী? পাড়ার দু'চারজন সৎ, নির্ভরযোগ্য লোক ডেকে রীতিমত পাকা ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে ব্যাপারটা আরো জানাজানি হ'য়ে যাবে, নামডাক একটু হবেই, কিন্তু উপায় কী? টমের জন্যে সইতে হবে এটুকু। বেচারা পিতৃহীন শিশু! নির্মলের চ'লে যাওয়ায় কষ্ট যদি পায় কেউ, পাবে ও-ই। তবু, ইংরেজের বাচ্চা, বড় হ'লে এক ভারতবাসীর এ-স্নেহের দানটুকু স্বীকার করবে তো? নির্মলের স্বদেশকে প্রীতির চোখে দেখবে কি? না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেমন হয়—দাতার উপর গ্রহীতার অহেতুক বিদ্বেষ, কৃতজ্ঞতার বোঝা বইতে

হয় ব'লে অকারণ হীনতাবোধ, পরের দানে মানুষ হওয়ার লজ্জা ওকে —অকস্মাৎ নির্মল চমকে উঠে ভাবনা থামিয়ে দিলে। ছি, না দিতেই ফিরে পাবে কতটুকু, তারই অঙ্ক কষ্‌তে ব'সে গেল হিসাবী মন? নিষ্কাম কর্ম! সে কি চিরকাল শাস্ত্রের বুলিই রইল কেবল? নির্মলের জীবনে কোথায় তার ব্যবহার?

অন্ধকার হ'য়ে গেছে। 'সারা' কুটীরে আলো জ্বালিয়ে ছেলেকে খাওয়াবার উদ্যোগ করছিল। নির্মলের ফিরে আসবার কারণ শুনে অবাক হ'য়ে গেল। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটতেই ছেলেকে বুকে টেনে আদরে-চুমায় অস্থির ক'রে তুললে। কাণ্ড দেখে নির্মল লজ্জায় সংকোচে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে এই প্রথম ওর সন্দেহ হ'ল—সারারই মুখ থেকে শুনলে গ্রামবাসীরা এ-খবরটাকে ভালোভাবে নিতে পারবে কিনা? এমন কি, এর একটা কদর্থ বার হ'তে কতক্ষণ?

নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিয়ে নির্মল তখনই মিসেস লাভ্‌লেসের কাছে চলল। বুড়ো মিঃ লাভ্‌লেসও ছিলেন ঘরেই।

কথাবার্তায় রাত প্রায় ন'টা হ'ল। নির্মল বললে, "এবার উঠি।"

মিঃ লাভ্‌লেস পিছন পিছন রাস্তায় এসে বললেন, "টাকাটা যদিও বেশি কিছুই নয়, তবু ব্যাঙ্কে জমা রাখলে বছর কয়েক পরে সুদে-আসলে কম হবে না। গরীবের পক্ষে এ অমূল্য।"

নির্মল শেষের কথাগুলোর কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, "যতদিন সরকারী খরচে পড়তে পায়, ততদিন আর ওতে হাত দেওয়া না হয় যেন। উচ্চতর শিক্ষা বা কোনো ব্যবসা, বড় হ'লে যেদিকে ওর ঝোঁক হয়, তাতেই অল্প একটু সাহায্যের জন্যে—"

"ছেলেটি ভাগ্যবান। হোক না পঞ্চাশ পাউণ্ড, কিন্তু এ যে স্বপ্নের অতীত। কে ভেবেছিল—"

বাধা দিয়ে নির্মল বললে, "আমিও ভাবিনি। আর, নিছক ওর জন্যে করেছি তাও নয়। আমোদ-আহ্লাদে এদেশে কত টাকাই তো উড়িয়ে দিলাম, কিন্তু যাক্ ওকথা। সেই সব ভেবে যাবার আগে—"

"ও, তাহ'লে শীগ্‌গিরই এখান থেকে চ'লে যাচ্ছেন বলুন?"

"সেই রকমই তো স্থির করেছি। আচ্ছা, আপনি ঘরে যান, হিমে আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।" বৃদ্ধকে বিদায় দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে যেতে যেতে ভাবলে, "স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে এসে যে-আনন্দ পেয়েছি, যে সত্য খুঁজে পেয়েছি নিজের মধ্যে, তার পাশে ওই টাকার কী-ই বা দাম? জীবনে কখনো কারো জন্যে কিছুই করিনি। একটা মস্ত পরিবর্তনের স্মৃতি অক্ষয় হোক না। তাই তো একাজ।"

দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনে মিসেস হ্যারিস্ ছুটে এলো। বললে, "কোথায় ছিলেন মিঃ বোস? বিকেল থেকে জরুরী তার এসে প'ড়ে আছে!"

"সে কি! তার এলো কোথা থেকে? কই দেখি!"

রেণুই বটে—"বড্ড নিরাশ হলাম, যদিও জানতাম এরকমই ঘটবে। চিঠি যাচ্ছে।"······

রাতটা কাটল ছটফট ক'রে। সকালে প্রথম ডাকেই রেণুর চিঠি এলো।

সমস্ত চিঠিটা আগাগোড়া বার দুই প'ড়ে নির্মল স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইল। কতক্ষণ এমনিভাবে বসেছিল কে জানে, দুয়ারের বাইরে মিসেস হ্যারিসের করাঘাত শুনে হঠাৎ যেন ধ্যান ভেঙে উঠে পড়ল। একান্ত শুষ্ক উদ্বিগ্ন মুখখানি বার ক'রে ইঙ্গিতে বৃদ্ধাকে ঘরের ভিতর ডেকে এনে বললে, "আজই আমায় বার্মিংহামে যেতে হচ্ছে।"

ভীত হ'য়ে মিসেস হ্যারিস জিজ্ঞাসা করলে, "সে কি, এমন হঠাৎ?"

"না গেলেই নয়।"

"খারাপ খবর মিঃ বোস?"

বিদেশিনীর স্নিগ্ধসুরে নির্মলের চোখে জল এসে পড়ল। সাম্‌লে নিয়ে বললে, "ভারি অসুখ—বোনের।"

মিসেস হ্যারিস নিঃশব্দ সহানুভূতিভরা দৃষ্টিখানি একটিবার তুলে নীরবে ঘর থেকে রেরিয়ে গেল।

ট্রেণে উঠে চিঠিখানা নির্মল আবার খুলে ধরল। বারবার চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে, বারবার সে অস্পষ্ট অক্ষরগুলোর দিকে জোর ক'রে চেয়ে থাকে। বেশি নয়, সামান্য ক'টি কথা—"নির্মল, মনে আছে স্টীমারের সেদিনটা? বলেছিলাম, আমি তোমার পাতানো দিদিমাত্র নই। তখন কি তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলে পেছনে এর কত বড় সত্য আছে লুকিয়ে!

বড়দাদাকে ভুলে যাওনি একেবারে?···মিছেই জিজ্ঞেস করছি—সে কথা কি সারাজীবনেও ভোলা যায়!

নির্মল, আমিই তোমার সেই—দিদি, যাকে ভুল বুঝে তিনি—যাঁকে ভুল বুঝে আমি—আজীবন আত্মহত্যার, প্রিয়-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত বহন ক'রে এলাম, শান্তি পেলাম না আজও!

শান্তি না-ই পাই, সমাপ্তি পেতে চলেছি। কঠিন রোগ। কেউ জানে না, কিন্তু আমি তো জানি বাঁচব না। বাঁচতে যে আমি চাইই না। নইলে থাইসিসও সারে।"···

ভগবানের এ কেমন যে বিধান! অন্যায়ের মাত্রা যখন প্রতিকারের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়, শুধু কি তখনই অন্যায়সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিতে হয়? এ দু'টো খবরের একটাও কি অনেকদিন আগেই

নির্মলের পাওয়া উচিত ছিল না? পেলে হয়ত একদিকে আজ ও নিজের চোখে নিজে ছোট হ'য়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচত। কিন্তু নিষ্ঠুর দেবতার সেটা সইবে কেন? মানুষকে সব রকমে রিক্ত নিঃস্ব ক'রেই যে তাঁর আনন্দ।

হোটেলের লাউঞ্জের দুয়ার খোলাই ছিল। পোর্টার দেখিয়ে দিতে নির্মল বিনা দ্বিধায় ঢুকে পড়ল। একধারে সুপ্রিয়া ব'সে একখানা মাসিকপত্রের পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছে। পায়ের শব্দে চকিত হ'য়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, কাছে উঠে এসে বললে, "দিদি এইমাত্র একটু বাইরে গেলেন, ফিরতে দেরি হবে না। যাবার সময় ব'লে গেলেন যে আপনি আসবেন।"

নির্মলের পা দু'খানি ভেঙে পড়ছিল।

সুপ্রিয়া কুণ্ঠিতস্বরে বললে, "আপনার বোধ হয় খাওয়াও হয়নি; দিদি ব'লে গেছেন এলে—ব্রেক্‌ফাস্ট দিতে। দুপুরের খাওয়াটাও— এখানেই। আমি যাই, ব'লে আসি আর একবার।" দুয়ার পর্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "বসুন না ততক্ষণ, এখনই আসছি।"

বাইরে মুক্ত হাওয়ায় এসে ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কী প্রসন্ন হাসি-হাসি মুখ নির্মলের! ডরোথীকে পেয়ে সুখী হয়েছে—তাই! কোনো দুঃখ থাকলে কি মানুষের চোখের দৃষ্টি এমন আনন্দপূর্ণ উজ্জ্বল হ'তে পারে? মিছেই ভেবে মরেছে ও এতদিন!

"ওয়েটার, মিঃ বোসের খাবারটা—"

"তৈরি আছে মিস্‌।"

ঘরে ফিরতে গিয়ে পা যেন ওঠে না। পরের মুখের আনন্দের দীপ্তিতে তার নিশ্চিত সুখের প্রমাণ পেয়ে অবসাদে ওর নিজের মন

কেন ভ'রে গেল? ডোরাকে নিয়ে যে লোক সুখী হ'তে পারে তার কথা ভাবতেও যে সুপ্রিয়ার ঘৃণা হওয়া উচিত। কিন্তু পরিবর্তে এ কী? দুঃখ, না হিংসা?

অননুভূতপূর্ব ক্লেশে সুপ্রিয়ার এই হঠাৎ আচ্ছন্ন, মানসিক ক্লান্ত অবস্থা কতক্ষণে যে কাটত বলা যায় না। আজকাল প্রায়ই ওর অল্পে শ্রান্তি আসে, সামান্য কারণে মন হয় বিষণ্ণ। তখন লোকজনের সঙ্গ এতটুকু ভালো লাগে না।

কিন্তু ওয়েটার নির্মলের খাবার নিয়ে আসছে, উঠতে হ'ল। মনের ভিতর আসে নালিশ, রেণুদির ওকে কেন এসব পরীক্ষা?

সুপ্রিয়াকে সামনে বসতে দেখে নির্মল সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠল, "মিছে কষ্ট পাওয়া—কোনো অসুবিধা হবে না আমার।"

সুপ্রিয়া নিরুত্তরে নতমুখে ব'সে রইল।

এই অস্বচ্ছন্দ অবস্থা থেকে উদ্ধার করল ওদের প্রফুল্ল। সুপ্রিয়া নির্মলের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিল, কিন্তু সে যে প্রশান্তরও বন্ধু সেকথা উল্লেখও করল না। প্রফুল্ল থাকে গ্লাসগোতে, নির্মলের সঙ্গে মুখের আলাপ নেই, কিন্তু লণ্ডনে গিয়ে এবার অনেক কথাই শুনে এসেছে। তাই ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট অশ্রদ্ধার ভাব ছিল। কোনো-মতে কাজ-সারা-গোছের একটা নমস্কার ক'রে সামনে একখানা চেয়ার টেনে বসল। এই লোকটাকে রেণুর এত জোর-জবরদস্তি ক'রে টেলিগ্রামে ডেকে এখানে আনাবার প্রয়োজন কী ছিল, প্রফুল্ল অনেক ভেবেও কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। অনুপমও কাল সংযত দু'টি কথায় সম্মতি দিয়ে চুপ ক'রে বসেছিল, ওর চিরাভ্যস্ত-গম্ভীর মুখে ভাব-প্রকাশ সহজে হবার নয়। কিন্তু প্রফুল্ল বুদ্ধিমান লোক, বুঝেছিল এরা নির্মলকে আগে থেকে খুব ভালো ক'রেই জানে, হয়ত আত্মীয়তাও আছে। নইলে কি আর সুপ্রিয়া নিঃসংকোচে পাশে ব'সে

ঘরের লোকের মতন যত্ন ক'রে খাওয়ায়? কিন্তু সম্বন্ধ যদি থাকে, প্রকাশ করে না কেন?

নির্মল হঠাৎ মুখ তুলতে চোখোচোখি হ'ল দু'জনের। প্রফুল্ল থতমত খেয়ে কী বলবে ভেবে পায় না। একটু হেসে নির্মল হাতের ছুরি কাঁটা সরিয়ে রেখে সোজা হ'য়ে বসে। সুপ্রিয়া ব্যস্ত হ'য়ে বললে, "ওকি, খাওয়া হ'য়ে গেল এরই মধ্যে?"

"সকালে কি এত খাওয়া যায়?"

"দিদি কিন্তু ভারি দুঃখিত হবেন।"

প্রফুল্ল হেসে সুপ্রিয়াকে বললে, "বাঙালীর মেয়ে—স্বর্গে গেলেও—।"

অগত্যা সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়ায়, "চলুন তাহ'লে ওঘরে, প্রফুল্লবাবু, আপনিও আসুন না।"

মিনিট কয়েক পরে কী একটা কাজের অছিলায় সুপ্রিয়া বেরিয়ে যায়। মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়—এরকম বোকামি আর না। দিদির অতিথি, তিনিই অভ্যর্থনা করুন, আদর-আপ্যায়ন তাঁর খুসিমতো সমারোহেই চলুক, কিন্তু সে নিজে সংকটের মাঝে আর না।

এদিকে ঘরের ভিতর সব চুপচাপ। প্রফুল্ল একটু উসখুস ক'রে হাতের কাগজখানা বারদুই নেড়েচেড়ে যথাস্থানে রেখে দিল। চোখ তুললেই ওই লোকটির সঙ্গে বাধ্য হ'য়ে আলাপ করতে হবে। যতক্ষণ পড়ার ভাণ ক'রে চুপ থাকা যায়, যাক। পাশের সোফা থেকে অর্ধ-পঠিত উপন্যাসখানা তাই টেনে নিল। কিন্তু সাধ্য কি বইয়ে মন দেয়? আকণ্ঠ কৌতূহল। তাছাড়া অভদ্রতাও হচ্ছে হয়ত, হাজার হোক অতিথি। বইখানা মুড়ে রেখে ধীরে মাথা তুলে ওদিকে তাকিয়ে দেখে, যার জন্যে এত ভাবনা সে নিশ্চিন্তে চেয়ারে মাথা হেলিয়ে

জানালার বাইরে তন্ময় হ'য়ে কী দেখছে। ঘরে যে আর কেউ আছে, একজন যে এতক্ষণ অনেকটা ইচ্ছা ক'রেই অবহেলা দেখিয়েছে ওকে, সেসবে যেন নির্মল বস্থুর খেয়ালই নেই।

প্রতিদানটা নির্মলের ইচ্ছাকৃত নয়, তবু আঘাত লাগল প্রফুল্লর অভিমানে। সোজা হ'য়ে ব'সে ঈষৎ ব্যঙ্গের স্থুরে কী একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল। এ-মুখই কি বন্ধুদের বর্ণিত সেই উচ্ছৃঙ্খল দুর্বিনীত মদ্যপের? এমন করুণ, এত ক্লান্ত—উদাস! শ্রান্ত চোখ দু'টিতে এমন গভীরতা! কাছের সমস্ত বস্তুকে ভুলে মনই বা ওর কোন্ অজানা দূরের পানে অমন স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে আছে?...আশ্চর্য! প্রফুল্ল কী শুনেছিল, কী ভেবেছিল, আর দেখলেই বা কী! ক্ষণেকের জন্যেও, অন্তরের গভীর ভাব মুখে যার এমন স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠতে পারে, তাকে অশ্রদ্ধা করবার অধিকার আর যারই থাক, অন্তত প্রফুল্লর তো নেই!

কিছু না জেনে, না বুঝেও স্নেহে সমবেদনায় ওর বহু অভিজ্ঞতার আগুনে দগ্ধ, ভাবপ্রবণ কবিচিত্ত মথিত হ'য়ে উঠতে লাগল। কে জানে এ ছেলেটির দুঃখ কী। তবু ওর কেমন ক'রে যেন দৃঢ় প্রতীতি হ'ল—লোকে যা বলে তার সবটাই সত্য নয়। দুষ্কর্ম ক'রে শক্ত হ'য়ে যায় যারা, তাদের সঙ্গে এর মুখের যে প্রভেদ আছে কোথাও!

এমনি ক'রে একজন নিজের অন্তহীন ভাবনায়, আর একজন যখন অলক্ষ্যে তারই হাবভাব পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের কাজে একান্তমনে নিবিষ্ট, তখন নিঃশব্দে অন্য দুয়ার দিয়ে ঢুকে রেণু থমকে দাঁড়িয়ে রইল। পিছন পিছন অনুপম ওরই একপাশ থেকে উঁকি মেরে বললে, "ব্যাপার কী?"

নির্মল ও প্রফুল্ল দুজনেই চমকে ফিরে দেখল।

"যাঃ রসভঙ্গ হ'য়ে গেল!" রেণু হেসে উঠল, "কী করছিলে বলো

তো তোমরা দু'টিতে? অনু এমন বোকা, নইলে আরো খানিকক্ষণ মজা দেখতাম। ও প্রফুল্ল, নির্মলকে কি তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণার যন্ত্র-টন্ত্র কিছু একটা ভেবে নিয়েছিলে নাকি তুমি? কিংবা পোকা-মাকড়? যেরকম—"

প্রফুল্লর মুখ লাল হ'য়ে উঠল, তাড়াতাড়ি বললে, "আঃ কোটটা খুলুন না আপনি। নির্মলবাবু চুপচাপ বসেছিলেন, আমি—এই—বাজে কথা ব'লে রসভঙ্গ করিনি।"

অনুপম সান্ত্বনা দিল, "ঠিক বলেছে। একরাশ কথার ভিতর দিয়ে কতটুকুই বা চেনা যায় পরস্পরকে? তুমি বলবে এক, অপরে বুঝবে আর। নীরবতাই মনের সঙ্গে মনের বোঝাপড়ার খাঁটি দূতী।" শেষের দিকে ওর গলার স্বর অত্যন্ত গম্ভীর শোনায়।

রেণু হাসলে, "তা, বোঝাপড়া তোমাদের খানিকটাও এগিয়েছে তো? অনুকে তোমার কবিত্বের ছোঁয়াচ লেগেছে, প্রফুল্ল।" নির্মলের পাশে ব'সে প'ড়ে ওর হাতখানা হাতে টেনে নিয়ে বললে, "ওঁরা অমনিই নির্মল: একজন দিনরাত এঞ্জিনের ঘর্ঘরের মধ্যে থেকেও রাত্রে চুপিচুপি কবিতা লেখেন, অন্যটি সভা-সমিতিতে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে এখন নীরবতার এমন ভক্ত হ'য়ে উঠেছেন যে ভয় হয় বুঝি-বা দু'দিন পরে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে পাহাড়ে-পর্বতে না উধাও হন।" বলতে বলতে রেণুর চোখের দৃষ্টি সজল হ'য়ে আসে।

ঠাট্টা, অথচ ঠাট্টা নয়। নির্মল কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। ভেবেছিল সংসারে দুঃখের সীমা নেই শুধু ওরই, কিন্তু আভাসে-ইঙ্গিতে মনে হচ্ছে যেন এঁরাও ঠিক সুখের সমুদ্রে সঞ্চরমান নন। প্রথমেই মনে হ'ল রেণুর অসুখের কথা। উদ্বিগ্নমুখে বলতে গেল, "দিদি—"

রেণু হাতের উপর ঈষৎ চাপ দিয়ে চোখের ইসারায় নিষেধ ক'রে বললে, "সুপ্রিয়া গেল কোথায়? আমি জানতাম তুমি না খেয়েই

চ'লে আসবে, নির্মল। কী করব ভাই, অমন জরুরী টেলিগ্রাম না করলে কি তুমি একেবারেই আসতে? চিরদিনের মত চ'লে যাচ্ছি, পথের মাঝে আশাতিরিক্ত চোখের দেখাই যদি হ'ল, ভাবলাম—"

নির্মল গাঢ় কণ্ঠে বললে, "চিরদিনের মতো যাচ্ছেন চ'লে? কী বলছেন দিদি! অসুখ কি সারতে—"

আবার রেণু নিষেধের দৃষ্টি হেনে বারেক ওর দিকে তাকিয়ে বললে, "দেশে চ'লে যাচ্ছি যে।"

"সে কি, কবে?"

"যত শীগ্‌গির সম্ভব। তা না হ'লে এসময় এদিকে কেন এলাম?"

কথা শুনে নির্মল অবাক হ'য়ে বললে, "কিন্তু দেশের পথটা কবে থেকে এদিকে হ'ল দিদি? আজকাল কি লণ্ডনে না হ'য়ে বার্মিং-হামেই ভারতে ফিরবার সোজা রাস্তাটা খুলে গেছে? কই শুনিনি তো এত বড় খবরটা!"

রেণু হেসে বললে, "আরে, না। বলছিলাম কি, এই দেশে এলাম অথচ দেখবার মতন কিছুই না দেখে চ'লে যাবো, এ কেমন কথা? এখানে সেক্‌স্‌পীয়রের বাড়ি, এডিনবরা আর গ্লাসগো হ'য়ে স্কটল্যাণ্ডের লেক্‌গুলো, ফিরতি পথে ইংলণ্ডের হ্রদ অঞ্চলটা—যাবার আগে দেখবার জিনিষ কতই প'ড়ে আছে।"

ওধার থেকে অনুপম ব'লে উঠল, "তা আছে। কিন্তু সত্যি বলছি রেণু, স্কটিশ লেক্ দেখেও যদি এ-বোহেমিয়ান্ জেদ না ছাড়ো—"

রেণু হেসে উঠে পড়ল, "যাই ওপরে। নির্মল, তুমিও এসো না একটু মুখহাত ধোবে।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চাপা সুরে বললে, "অসুখের কথাটা

ওদের সামনে বেশি বোলো না। অনু কষ্ট পায়; সুপ্রিয়া তো জানেই না যে এত সিরিয়াস্। ব্যাপারটা খুলে না বললে তুমি আসতে না, তাই বাধ্য হ'য়ে তোমায় বলা।”

“কিন্তু দিদি, সত্যি কি—” নির্মলের স্বর রুদ্ধ হ'য়ে এলো।

“সত্যিই ভাই। দেশে থাকতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।”

“তবে কেন এমন অবিবেচনার কাজ করলেন দিদি? বিলেতে না এলে তো বাড়তে পেত না। এসব রোগের পক্ষে এই দেশ কত খারাপ তা জেনেও কেন—”

“আস্তে, সুপ্রিয়ার ঘর এই পাশেই। নানা অছিলায় ভুলিয়ে রেখেছি ওদের, শুধু দিনকতক ঘুরে সব দেখে যাবো ব'লে। আমি নিজেই ডাক্তার, এরকম অসুখ চেপে রাখার দায়িত্ব কত, জানি। যথাসাধ্য সাবধানেও চলি। অনুর বা তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই, আমি ঠিকই করেছি আর বেশিদিন থাকব না এদেশে। দেশে ফিরে স্বাস্থ্যকর কোথাও থাকব, চিকিৎসাও করাব। তাহ'লেই হ'ল তো? এখনই যদি ডাক্তার ডাকি, আর দু'টি দিনও আমায় সাধারণ মানুষের মতো চলাফেরা করতে দেবে না। না ভাই, মুখটি অমন ক'রে থেকো না, ওতে আমার ভারি কষ্ট হয়—নির্মল!”

নির্মল এতক্ষণ কষ্টে চোখের জল চেপে রেখেছিল। রেণু হাত ধ'রে কাছে টানতেই পায়ের কাছে মেজের উপর ব'সে পড়ল, রুদ্ধ স্রোত আর বাধা মানল না।

খাওয়া-দাওয়ার পরে অনুপমকে নিভৃতে একলা পেয়ে রেণু কাছে গিয়ে বসল। ও একটিবার মুখ তুলে চেয়ে দেখে শুধু বললে, “শরীরটায় সত্যি ভালো বোধ করছ তো রেণু?”

“হাঁ গো হাঁ, কতবার বলব বলো তো?”

তারপর অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ।

ঘড়িতে আড়াইটা বেজে গেছে। রেণু মনে মনে ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। না বললেই নয়। ধীরে ওর বাহু স্পর্শ ক'রে ডাকলে, "অনু!"

অনুপম হাসলে, "কেন?"

রেণুও হাসল, "ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। যখন বিশেষ কিছু চাইতে আসতাম—"

"শুধু তখনই তোমার গলার স্বর এত মধুমাখা শোনাত, অন্যথা কেবল হুকুম—এটা দাও, সেটা করো। যাক্, আজ আবার বিশেষ কী চাই?—চট্‌পট্।"

"বুঝতে পারানি?"

"কবে আমি মেয়েদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে এমন মাথা ঘামিয়েছি যে আজই রাতারাতি ওতে পাকা ওস্তাদ ব'নে গেলাম? দেবা ন জানন্তি, কুতঃ—"

"দোহাই, কুতঃ ফুতঃ রাখো। কিন্তু সাহস যখন দিলে, বলি একটা কথা—জীবনে দেশের কাজ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে সত্যিই তো কখনো মাথা ঘামাতে দেখিনি তোমায়। ও-ই তোমার স্বধর্ম।"

"নাঃ, আজ বিশেষ কোনো মতলবই আছে বটে রেণুর!"

সাদরে ওর হাতের উপর হাত রেখে রেণু বললে, "নির্মলকে আমাদের সঙ্গে যেতে ডেকেছি।"

"কী বলে সে?"

"বললে তো যাবে। কিন্তু তাহ'লে আজই আমাদের যাওয়া হয় না। দু'টো দিন অপেক্ষা করতেই হবে ওর জন্যে।"

"বেশ তো।"

রেণু ওর হাতে একটু চাপ দিয়ে বললে, "শুধু বেশ তো বললেই

চলবে না। এই দু'দিন স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে গিয়ে থাকলে কেমন হয়? আর—"

"মিছিমিছি হাঙ্গাম। তবু রাজি হওয়া গেল। তারপর? এই দ্বিতীয় 'আর'-টা কী?"

"এমন কিছু যা মানুষের হাতের বাইরে।" একটু ইতস্তত ক'রে বললে, "ধরো, ঘটনাচক্র যদি এমন গতিই নেয়—"

উত্তর না দিয়ে অনুপম অনেকক্ষণ স্তব্ধ ব'সে রইল। নিশ্চয়ই গুরুতর কোনো কারণ আছে, রেণু তো বাজে কথা বলবার মেয়ে নয়! একটা লম্পট উচ্ছৃঙ্খলকে এখনও এতখানি ভালবাসে—সেই সুপ্রিয়া, যে 'পিউরিটান' ব'লে নাম কিনেছে বন্ধুদের কাছে! যার তুষারকঠিন শুভ্র পবিত্রতায় অশান্তর মতন বুদ্ধিমান ছেলের সহস্র যুক্তিপূর্ণ মডার্নিজ্‌ম্‌ও এতটুকু কালো রেখাপাত করতে পারেনি! একি অধঃপতন, না সত্যই প্রেম? কী নাম যে দেবে একে তা অনুপমের বুদ্ধিতে আসে না। প্রেমই যদি হয়, তবে সে প্রেমের কোনো অভিজ্ঞতাই ওর নেই। হয়ত কোনো প্রেমেরই নেই, নইলে একথা ভাবামাত্রই সুপ্রিয়ার উপর বিতৃষ্ণায় মন ওর এমন তিক্ত হ'য়ে ওঠে কেন? সে কি অবশেষে ভালবাসার নামকেও ঘৃণা করতে সুরু করল?

রেণুও ভাবছিল, অনুপমের হয়ত দোষ নেই। মানব-মন থেকে যতদিন না অন্নবিত্তের উপরে উঠতে, মানুষের আসক্তি অনাসক্তি থেকে একটুখানিও স'রে দাঁড়াতে পারা যায়, ততদিন বোঝাই মুস্কিল যে অপরের প্রতি মন-প্রাণের অনেক বিতৃষ্ণা আর তিক্ততার গোপন হেতুটাই হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কোনো-না-কোনো রকমে নিজেরই দাবি বা আশাভঙ্গ। যা চেয়েছি তা পাইনি, এই অতৃপ্তি আর নৈরাশ্যই আনে অন্যের উপর বিরক্ত দোষারোপ। মানুষের অহমিকাও তার সাথে

যোগ দেয়। নিজেকে কতভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে, অমুক মন্দলোক কিংবা মন্দের সঙ্গেই তার প্রীতির কারবার! অথচ এমনি ক'রে পরনিন্দায় সান্ত্বনালাভের চেষ্টা আর স্বভাবটা ছেড়ে, আত্মবিশ্লেষণ করবার ক্ষমতাটিই বাড়ালে হয়ত দেখতে পাওয়া যায়—নিজেরই কত প্রত্যাশা কখন্ কোথায় আহত হয়েছে, সকল প্রীতি থেকে আত্মপ্রীতিই কত প্রবল, কী ভয়ানক তার দাবী, যেখানে আঘাত পড়লে মানুষের বহুসাধের 'ভালোবাসা' জিনিষটা কত সত্বর হাত পা গুটিয়ে শুচি-বাইগ্রস্ত হ'য়ে বসে। নইলে ভালোবাসার আবার ভালো-মন্দ কী? মানুষের মতো তারও জাত বিচার আছে নাকি!—এই সহজ কথাটা আর কেউ না বুঝুক্, রেণুও যদি না বোঝে তবে বৃথাই সে এতদিন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হ'য়ে—

"রেণু!"

রেণু চমকে ফিরে তাকাল। অনুপম বললে, "তোমার কি মনে হয় জ্যাঠামশাই খুসি হবেন এতে? তাঁর কথাটা একবারও ভেবে দেখেছ কি? যদি সুপ্রিয়া সত্যই—"

'ভালোবাসে', এ-কথাটা কিছুতেই পারলে না উচ্চারণ করতে। তাই ঘুরিয়ে বললে, "ও যদি একটা অন্যায় অসঙ্গত জেদ ক'রেই বসে সেটাই মেনে চলতে হবে, না তার সুযোগ ক'রে দিতে হবে?"

এই উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে রেণু আশ্চর্য হ'য়ে গেল। আর এ কী অভিযোগ! ত্রস্ত হ'য়ে তাই ব'লে উঠল, "তুমি যে যা-তা বলছ অনু? সুপ্রিয়া কিছুই বলে নি, ওরা কেউ এখনো জানেও না যে নির্মল সঙ্গে যাবে। তাই তো আগে তোমাকেই বলতে এসেছি। তোমার অমতে কি—"

"ঠাট্টার মতো শোনাচ্ছে যে রেণু! মতামত দেবার আমি কে? কোন্ অধিকারে—"

"তা একটু আছে বই কি। স্ত্রীর উপর স্বামীর যে অধিকার, যে জোর, সুপ্রিয়া জানে তার উপর তোমার ঠিক সেই জোর, সেই—"

অনুপম বিদ্রূপের হাসি হাসল।

রেণু অনেকক্ষণ অধোমুখে থেকে তারপরে ধীরে ধীরে, ওর চোখের দিকে না তাকিয়েই বললে, "কী বলব? বেশ জানো, সে যত দুঃখই পাক্‌, তোমাকে দুঃখ দিয়ে কখ্‌খনো অন্যপথে যাবে না। কিন্তু তাই ব'লে তুমি কি—"

"সে সুযোগ নিয়ে ওকে করব বঞ্চিত? কেমন এই তো? কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আমিই বা কী করতে পারি? ওর কোনো ইচ্ছায় বা কাজে বাধাও দিচ্ছি না, বারণও করি না। তবে এত কথাই বা ওঠে কেন?"

ক্ষণেকের জন্যে নিজের লজ্জা ভুলে রেণু পূর্ণদৃষ্টি ওর মুখের 'পরে তুলে ধরলে। সে চাহনির সামনে অনুপমের মাথা আপনি নত হ'য়ে এলো। পর মুহূর্তে সে দ্বিগুণ বিরক্তি ভরে ব'লে বসল, "এটুকু করবার আছে—এখান থেকে চ'লে যাওয়া। তাই যাবো, আমার উপস্থিতি যেন কারো স্বার্থে এতই সাংঘাতিক বাধা হ'য়ে না দাঁড়ায়!" ব'লে আর উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কি করতে এসে কী হ'ল! এই সেই অনুপম! মানুষের আদর্শের বুলিতে আর কাজের বেলায় এতখানি তফাত!

ক্রমে বেলা প'ড়ে এলো, তবু রেণু একইভাবে সেখানে ব'সে ব'সে শূন্যদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। এ জগতে জন্মাবধি ভাবনার কি ওর কূল-কিনারা আছে! এত ভুগে, এত ভেবেও কিন্তু আজো সে মনের মাঝে ধরতে ছুঁতে পেল না কাউকে, কিছুকেই। মাঝে কী একটা যেন মনের কিনারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। ভাবে সে—এই বুঝি আঁধার কাটল, যার কিছু নেই তার জন্যে দীপ জ্বালাতে

এই বুঝি কেউ এলো—কী নাম তার ?—আদর্শের আলো ? ভগবান ? বিশ্বের প্রভু ? হায়রে, দু'দণ্ড না যেতে আবার সব ফাঁকা—সেই অন্ধকার ।

দেখল তো সে আজ ! কী আছে ওই অনুপমের, কোন্ সত্য কী মহত্ত্ব ? তবু যা নেই তার জন্যে এতটুকু অভাববোধও নেই। আপনার সংস্কার, আপন বিশ্বাস, মন-গড়া কর্ম-নীতি ও খণ্ড আদর্শবাদের পাষাণ প্রাচীরের উপর একনিষ্ঠায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এক চুল হেলবে না, নড়বে না। নিজে যা ঠিক করেছে, যতটুকু জেনেছে তারও বেশি, তারও বড় আরো কিছু জানবার ও পাবার আছে কিনা, সে বিষয়ে ওর একটুও কৌতূহল নেই। অনুপম নীতিমান, চরিত্রবান, অনুপম স্বধর্মনিষ্ঠ, দেশ সেবক, কিন্তু অনুপম সত্যদ্রষ্টা নয়। বাঁধা-ধরা মনের পাকা সড়কে ওর বিচরণ, অকূলের খোলা হাওয়াকে ভয় করে সে, পাছে ওর নিজস্ব যা কিছু একদণ্ডে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এমন ক'রে যারা নিজেকে বা নিজেরই ভাব-বিচারকে একান্ত বিশ্বাসে আঁকড়ে থাকতে চায়, নিজের থেকে বৃহত্তর কিছুর বা কারোর দেখা তারা পাবে কি কোনোদিনই ?

হঠাৎ পিছন থেকে সুপ্রিয়া ব'লে উঠল, "মাগো মা, খুঁজে খুঁজে হায়রাণ ! একলা ব'সে এত কী মাথামুণ্ডু ভাবছ বলো তো ?"

রেণু চমকে ওর হাত দু'খানা চেপে ধরল, "ভাবছি—নিজেকেই যে একমাত্র সত্য ব'লে জানে, আসল সত্যের পরিচয় জীবন থাকতে সে পাবে কি ?"

"জীবনে না পেলে মরণে পাবে।"

"ঠাট্টা নয় ! তোর কি মনে হয় না সুপ্রিয়া, বড়কে পেতে হ'লে ছোটর লোভটাই ছাড়তে হয় আগে ? তবে কেন লোকে সেটা বোঝে না, কেন নিজেকে কেবলই ছোট ছোট খুঁটিতে বেঁধে ছোট্ট হ'য়ে

থাকতে চায়? স্নান করবে সমুদ্রে, পাকা ঘাট খুঁজে হয়রাণ—এ কী রকম কথা!"

লজ্জায় স্নুপ্রিয়ার হাত-পা যেন অসাড় হ'য়ে আসে, রেণু কি ওকে লক্ষ্য ক'রেই বলছে এসব? চেয়েছে ও সত্যকে, অথচ অন্য বস্তুর লোভও ছাড়তে পারে না—এই কি? কিন্তু রেণু বুঝল না কেন যে 'সত্য কী' তাও সুপ্রিয়া এখনো ঠিক জানে না। দ্বিধায় সন্দেহে মন যার অকূল পাথারে—

"উত্তর কই সু?"

অস্পষ্ট জড়িত স্বরে সুপ্রিয়া বললে, "কী বলব?"

"তোর কী মনে হয়? অহমিকা ছেড়ে নিজেকে নিঃশেষে না দিলে—"

কথার মাঝখানে সুপ্রিয়া সতেজে ব'লে উঠল, "কিন্তু—দেবে কাকে? শুধু দেব বললেই তো হ'ল না! যদি বোঝো যে এ-সংসারে যেদিকে তাকাও, সব মিথ্যা সব ভঙ্গুর!"

রেণু হতাশভাবে নিশ্বাস ফেললে, "তবে আর তোর মতামত শুনে কী হবে? ক্রমে যে আমার দলেই এসে পড়ছিস দেখতে পাই।"

এতক্ষণে সুপ্রিয়া আশ্চর্য হ'ল—রেণুর মনের গতি কোন্ দিকে? এসব তাহ'লে ওর নিজেরই সমস্যা?—উত্তরে কিন্তু কিছুই বলল না, ঘরের অস্পষ্ট অন্ধকারে ওর মুখও ভালো দেখা গেল না।

রাগের মাথায় অনুপম যাই বলুক না কেন, রেণুর সেই বিবর্ণ ব্যথাহত মুখের ছবি ভুলবার নয়। সে জানে রেণু ওর কাছে কী চায়। ছোট থেকে সুপ্রিয়া আর সে মনে মনে ওকে 'হিরো'-র আসনে বসিয়েছে। কথাটা শুনতে বেশ, নিরালায় ভাবতেও মন্দ নয়। কিন্তু হিরো হওয়ার দুঃখ যে কত তা ওরা বোঝে কি? যখন থেকে নির্মল

এলো ওদের মাঝখানে স্থপ্রিয়ার প্রতি তার দুর্দম আকর্ষণ নিয়ে এবং বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, স্থপ্রিয়াও হ'য়ে উঠল তাতে চঞ্চল—হাঁ, শুধু চাঞ্চল্য ছাড়া আর কি, ভালোবাসা যে অত সহজে জন্মায় অনুপম তা বিশ্বাস করে না—তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহুবার ওর মনের কোণে যে সব ভাব আনাগোনা ক'রে গেছে তাদের, আর যা-ই হোক, 'হিরোইজ্‌ম্‌' বলা চলে না এ নিশ্চয়। কতবার অনুপমের এমনও মনে হয়েছে দেশের কাজটাই ওর ফাঁকি, স্থপ্রিয়াই সত্য। দেশকে নয়, তাকে কেন্দ্র ক'রেই ওর কৈশোর এবং যৌবনের সব স্বপ্ন গ'ড়ে উঠেছে—কিন্তু সে তা জানতে পারে নি, পুরুষের গর্ব-বশে ওরকম সন্দেহের আভাসমাত্রকেও স্বীকার করতে চায় নি। অথচ জীবনের চিরন্তন আদর্শ থেকে নারীই যদি ওর কাছে প্রিয়তর হয়, তবে তার সুখ-দুঃখকেও সে একান্তভাবে নিজের ক'রে নিতে পারে না কেন? স্থপ্রিয়া যখন অনুপমের লক্ষ্য ও মতামতে সন্দেহ প্রকাশ করে, যখন বারবার বলে—"ঘটনাক্রমে কোনো এক দেশে জন্মেছি ব'লে তা-ই কখনো চরম উপাস্য হ'তে পারে? তবে কেন তাকেই আমার জীবনের ইষ্ট দেবতা ব'লে মেনে নেব?"—একবার তর্কে নামলে ও আরো কত কী যে বলে—তখন সত্যিকার বিরক্তিতে অনুপমের গা জ্বালা করে। ভাবে—হয় স্থপ্রিয়া এই স্বাতন্ত্র্য ছাড়ুক, নয় নিজের পথেই যাক! বাগ্‌দানটা তখন নিতান্তই বন্ধন হ'য়ে দাঁড়ায়। নারী পুরুষের সহধর্মিণী, এই তো ভারতের চিরানুসৃত আদর্শ। পুরুষ আবিষ্কার করবে, নারী হবে সহায়—শক্তি। ভারতের ঋষিদত্ত এই অপূর্ব সত্যকে ভুলে স্থপ্রিয়া অহরহ ওর শক্তি বৃদ্ধি না ক'রে হ্রাসই করেছে। অথচ একথা ওকে বলবার যো নেই। তখনই যেন মনে মনে সর্বস্বদানের সংকল্প ক'রে মুখ বুজে অনুপমের আদেশ পালন করতে নেমে যায়। কিন্তু ওরকম 'অনুগামিনী' নারীতে আত্মমর্যাদাশালী

পুরুষের চিত্ত আনন্দ পাবে কেন? কেউ কাউকে বোঝেনা, কেউ কারো কাছে নত হবে না, এরকম অহি-নকুল সম্বন্ধও তো ওদের নয়। খুব ভালো ক'রেই দেখে সে, প্রতিপদে সুপ্রিয়া নত হয়, কিন্তু সুখী হয় না। ক্ষোভে অনুপম নিজের ভিতর পুড়ে মরে, কিন্তু উপায় দেখে না।

এক একবার ওর মনে হয়েছে—নারী পুরুষের শক্তিরূপিণী বটে কিন্তু একইপথে একভাবে চ'লে নয়। হয়ত স্বভাবতই উভয়ের কর্মক্ষেত্র আলাদা। সেই প্রকৃতিগত আলাদা ধর্ম ও কর্মে ব্যাপৃত থেকেই একজন দিতে পারে অপরকে শক্তি, রস ও উৎসাহ। তাই তার চিরাচরিত সংযম ভেঙে অবশেষে সুপ্রিয়াকে বিয়ে ক'রে গৃহলক্ষ্মী ও সন্তানের জননীপদে বরণ ক'রে নেবে কিনা, এমন চিন্তাও কত নিরালা রাত্রে ওকে বিনিদ্র ক'রে রেখেছে। কিছুতেই মন স্থির করতে পারেনি। আজীবন—অর্জুনের রথে সুভদ্রার মতো, জীবানন্দের পাশে শান্তির মতো কল্পনা ক'রে এসেছে সুপ্রিয়াকে। তখন অত্যন্ত উদারভাবে এও ভেবেছে, যদি সুপ্রিয়া গৃহহীন সন্তানহীন পথচারী দেশসেবকের প্রিয়ার পদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে না চায়, তবে ওকে দেবে মুক্ত ক'রে ওর নিজের বাগ্‌দান-বন্ধন থেকে। যেখানে হৃদয় নাই, সেখানে শুধু কথার মূল্য কী? এই যে আজ চোখের সামনে সুপ্রিয়া নিরন্তর শুকিয়ে উঠছে, এর কারণ কী—যদি সে ঠিক বুঝত! রেণু ভাবে, দিনকতক সেও ভেবেছিল—নির্মলের জন্যেই সুপ্রিয়ার এই দশা। কিন্তু ওদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ যত বড়ই হোক, সুপ্রিয়া যে অবশেষে নির্মলের সঙ্গে মিলনকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য ও সার্থকতা ব'লে ভেবে বসেছে, একথা অনুপমের বিশ্বাস হয় না। নর-নারীর এধরণের আকর্ষণ দু'দিনের, সেটা বোঝবার বয়স হয়েছে ওর। না, এমন মতিভ্রম হ'তেই পারে না সুপ্রিয়ার! সে চায়—সত্যকে, যা

চিরদিনের। শুধু সেই জন্যেই না ও অনুপমের আদর্শকে নিজের ক'রে নিতে পারছে না? অন্তত এইখানে রেণুর চেয়ে সে-ই সুপ্রিয়াকে ভালো বোঝে। আর সত্যি বলতে কি, ভালো বোঝবার অধিকারও ওরই আছে। কারণ ও-ই তো প্রথমে সুপ্রিয়াকে গীতা পড়তে বলে। তখন থেকেই ওর আশ্চর্য পরিবর্তন। সুপ্রিয়া কী ভাবে, অনুপম বোঝে না এমন তো নয়। এক যাত্রায় এমন পৃথক ফল হবে কে জানত? গীতা প'ড়ে অনুপম হ'ল স্বদেশী আর তারই আপন হাতে-গড়া শিষ্যা—ছাত্রী হ'তে চায় যোগী! আমোল দেয় না বটে, কিন্তু অনুপম জানে আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই, অখণ্ড বিশ্বদেবকে প্রত্যক্ষ অনুভব—এই মহান পাওয়ার তুলনায় আর সকলই তুচ্ছ মনে করা ওর মতো মেয়ের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সে-যুগে যেমন শ্রীকৃষ্ণ সখা-শিষ্য অর্জুনকে দিয়ে বহুবিভক্ত ভারতকে এক সাম্রাজ্যে গেঁথেছিলেন, এ-যুগেও যে পতিত ভারতের উদ্ধারের জন্যে গীতার সত্যকে তেমনি-ভাবে গ্রহণ করা যায় এবং গ্রহণ করা অত্যন্ত দরকার, একথা ওকে উপলব্ধি করাতেই হবে। অমন আগ্রহ ও আন্তরিকতাপূর্ণ অকপট মেয়ে ভগবানের আসল ইচ্ছাটি ভুলে তাঁকে দর্শনের জন্যে সারা জীবন ছুটোছুটি করাকেই সত্য ব'লে মেনে নেবে, তারপর মথুরা কি বৃন্দাবনে আশ্রমে বা মঠে নিষ্কর্মা স্বার্থপর সন্ন্যাসীর দল বৃদ্ধি করতে বেরিয়ে যাবে? মীরাবাই নাকি সব ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কার কী উপকার হ'ল? বিবেকানন্দও বলেন, ভারতের গুহায় গুহায়, হিমালয়ে কত উচ্চস্তরের সাধু সন্ন্যাসী যোগমগ্ন হ'য়ে রয়েছেন। এই ধ্যান-স্তিমিত ভাব তাঁদের নিজেদের পক্ষে হয়ত অপার আনন্দময়। কিন্তু দেশ ও কোটি কোটি দেশবাসী যে এদিকে রসাতলে গেল! অজ্ঞান ও পাপের বাড়াবাড়িতে ভগবানের সৃষ্টি টল্‌মল্‌ করছে, অথচ সেই তাঁকেই কিনা পেতে হবে আঁধার গুহার মধ্যে চোখ বুজে! কেন

এমন সহজ কথাটা সুপ্রিয়া বোঝে না? মানুষের অন্তরে ব'সে বিশ্বনাথ বিশ্বেরই দুঃখে কাঁদেন, আর মানুষ সে-কান্না উপেক্ষা ক'রে তাঁকে খুঁজতে যায় বনে-জঙ্গলে, আশ্রমের কর্মবিহীন নিরালা শান্তির মাঝে! হায় প্রভু গীতাকার, হায় তোমার কর্মযোগ। তোমার কথা বোঝাবার মতো মন সৃষ্টি করবার সময় এখনো কি এলো না পৃথিবীতে?

অথচ কী ক'রে যে বোঝানো যায় ওদের! যারা ইচ্ছা ক'রেই বুঝতে চায় না, এই যেমন সুপ্রিয়া আর—রেণু; ওকেও আজকাল এ-রোগে পেয়ে বসেছে। বহুরূপে ভগবান যাদের সামনেই রয়েছেন তারা 'কোথায় তিনি, কোথায় গেলে সত্য পাবো' ব'লে এ-কোন্ ঢঙের কান্না কাঁদে?···কিন্তু ওর নিজের এসব পাগ্‌লামি নেই, ও বলে—যতদিন ভারতের মাটিতে একটিও দীন দুঃখী অবশিষ্ট থাকবে, যতদিন মায়ের চরণে বাজবে ব্যথার শৃঙ্খল, ততদিন দিয়ো না আমায় নিজের মুক্তির কথা ভাববার অবসর, অঙ্কুরে বিনষ্ট কোরো সে-প্রবৃত্তি। জন্ম-জন্ম একই ব্রত নিয়ে আসব, তবু নিজের জন্যে কাঁদব না। না-ই বা পেলাম জ্ঞান-মুক্তি!

উঠে সে ধীরে ধীরে রেণুর খোঁজে চলল। দেখলে, সুপ্রিয়া সে-ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। কিছুই না ব'লে অনুপম পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল—সুপ্রিয়ার ছায়াও যেন অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। রাত্রিদিন একই বিষণ্ণ চেহারা! এ-ই কি ভগবানের জন্যে ব্যাকুলতার লক্ষণ? তাঁর নাম আনন্দময়ই বটে!

কিন্তু ঘরের ভিতর রেণু একা নয়, নির্মল ব'সে আছে। ওঃ, তাই সুপ্রিয়া অমন—

রেণু ওকে দেখে হাসিমুখে উঠে এলো। বললে, "সব ঠিক হ'য়ে গেছে অনু, চলো কালই আমরা রওনা হই দুপুরের গাড়িতে। নির্মল বলছে গুছিয়ে নিতে ওর একদিনের বেশি লাগবে না।"

অনুপম রেণুর চালাকি দেখে মনে মনে হাসলে। নির্মলকে জিজ্ঞাসা করলে, "আবার কি ওখানেই ফিরে আসবে?"

"না। এদেশে আর বেশিদিন থাকব না, আগেই ঠিক ক'রে ছিলাম।"

"কোথায় যাবে?"

"ফ্রান্সের বা ইটালির কোনো নির্জন সমুদ্রতীরে।"

"সমুদ্র-তীর, অথচ নির্জন! সেরকম জায়গা আজকের ইউরোপে মিলবে কি আর? তোমায় তাহ'লে নেহাত কর্সিকা-টর্সিকায় যেতে হয় নির্মল।"

নির্মল হাসলে। কী সরল স্নিগ্ধ হাসি! অনুপমের মনে হঠাৎ একটা ব্যথা জাগে। সুপ্রিয়া মাঝখানে না থাকলে এই ছেলেটিকে সে অতি সহজে আপন ক'রে নিতে পারত। বাস্তবিক সাধু-সন্ন্যাসীরা কি শুধু-শুধুই নারীসঙ্গ বর্জন ক'রে চলেন? এমন যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—তাঁরাও শিষ্যদের কামিনী থেকে শতহাত দূরে থাকতে ব'লে গেছেন। আদর্শ আর রমণী—পুরুষের পক্ষে একসঙ্গে এ-দু'টিই বজায় রাখা চলে কি? আর যারই চলুক, অনুপমের চলবে কি?

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপচাপ ব'সে আছে দেখে রেণু অবাক হ'য়ে গেল। হেসে বললে, "কর্সিকার ভাবনা না হয় পরে হবে, এদিকে ট্রেণ ফেল না হয়।"

"নির্মল কি এই ট্রেণেই যাবে?" ব'লেই হঠাৎ অনুপমের মনে প'ড়ে গেল নির্মল তো স্ট্র্যাটফোর্ডে একা থাকে না। রেণুকে বললে, "কাল গেলে যে ওর ওপর বড় জুলুম হয়, পরশুই রওনা হওয়া যাবে।"

নির্মল ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়াল, "না, না, দেরি ক'রে লাভ নেই। যত শীগ্‌গির এখান থেকে যাওয়া যায় ততই ভালো।"

রেণু ঈষৎ হাসলে, নির্মলের ভয়ের কারণ ও-ই। বার্মিংহামের

হাওয়া ভালো নয়, এতক্ষণ ধ'রে এই কথাই ওকে বোঝাচ্ছিল। কিন্তু অনুপম ভুল বুঝল। নির্মল চ'লে যাবার পরেও ওর বিস্ময় আর ঘৃণা ঘুচতে চায় না। ফুলের ভিতর যেমন কীট, সরল মুখ ও সুন্দর ব্যবহারের আড়ালে এ কী সয়তান লুকিয়ে আছে! নির্মল যে সেই নার্স্‌টিকে বিয়ে করবে, সে আশা অবশ্য কেউ করে না, যদিও করলেই ভালো হ'ত—'অনার্‌' ব'লে একটা কথা আছে, এ-যুগের ভারতবাসী ছেলেরা সেটা যেন ভুলতে বসেছে।

কিন্তু বিয়ে না করলেও, এতখানি নির্দয় যে কেউ হ'তে পারে, এ অনুপমের ধারণার অতীত। তিন মাসও হয়নি, এরই মধ্যে মেয়েটিকে পথে বসিয়ে সে কি যে-কোনো অজুহাতে ভাগ্‌তে চায়! আর এমন হৃদয়হীনের কাজে অনিচ্ছায় বা অলক্ষ্যেও সহায় হ'তে হবে কিনা ওকেও!

রাগ ক'রে সে সেইদিন ও তার পরের দিন রেণুর সঙ্গে কথাই বলল না। মেয়েরাও কম নয়। বিদেশিনী ব'লে এতটুকু দরদ নেই! হ'ত যদি নিজের দেশের মেয়ে! কিন্তু না, তাহ'লেও রেণু তাকে এতটুকু দয়া দেখাত না। নির্মলের মঙ্গলের পাশে আর সবারই সুখদুঃখ তুচ্ছ হ'য়ে গেছে ওর কাছে। সুবিমলের কথা মনে ক'রেই এই বাড়াবাড়ি।

ট্রসাক্‌সের পথে এ কী আনন্দ! উঁচু-নীচু পাহাড়ের পাশ দিয়ে অসমতল রাস্তায় অতি কষ্টে ঘোড়া দু'টি গাড়ি টেনে চলেছে, মাঝে মাঝে ধাক্কা লেগে যাত্রীরা এ ওর ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, তবু হাসির বিরাম নেই। দু'একজন আমেরিকান টুরিস্‌ট আর রেণুদের দল ছাড়া অন্য সকলে স্কটলণ্ডেরই লোক। কিন্তু নগরবাসী থেকে এদের ব্যবহারে তফাত কত! এমন সহজ অসংকুচিত দৃষ্টি, অনাবৃত

কৌতূহল নাগরিক জীবনের ছলাকলা দেখতে অভ্যস্ত ও উত্যক্ত ভাবুক ভারতীয়-মনের কাছে এতই আরামের যে দেখতে দেখতে নির্মল ও সুপ্রিয়া পর্যন্ত লজ্জা সংকোচের ব্যবধান ভুলে অনেকদিন পরে শিশুর মতো কৌতুক-চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

হাসি, গান, গল্পের ভিতর দিয়ে কখন্ যে গাড়ি Loch Katrine-এর অনতিদূরে পার্বত্য অঞ্চলের এক ছোট্ট নামহীন হ্রদের পাশে সুন্দর কুটীরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা ওরা টেরও পায়নি। নামতে বলায় সুপ্রিয়া আশ্চর্য হ'য়ে বললে, "এখানে কেন? অনেক দূর যাবার কথা ছিল যে।"

ওধার থেকে নির্মলও হেসে উঠল, সযত্নে সাবধানে রেণুকে নামিয়ে দিয়ে বললে, "আপনি ঘরে গিয়ে বসুন দিদি, সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।"

"আর তোমরা! অনু, তুমি?"

অনুপম বললে, "আমি? খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, ঘরদোর দেখে-শুনে নেওয়া, খানসামাকে ডেকে—উঃ সত্যিই তো, কাজ কি এক—"

"থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না, যেখানেই যাও কাজ তোমার ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসবেই। প্রফুল্ল!"

"স্নানটা সেরেই আপনার কাছে এসে বসছি। ভয় কি, এই এলুম ব'লে।"

রেণু হেসে ফেললে, "শোনো কথা, আমি যেন একলা থাকার ভয়েই মরছি। যাক, দেখা গেল কার টান কোন্ দিকে। কিন্তু সুপ্রিয়া যে অমন একা একা হ্রদের দিকে চলেছে?"

প্রফুল্ল ব্যস্ত হ'য়ে বললে, "তাই তো, অচেনা জায়গা—এই সন্ধ্যেবেলা! নির্মলবাবু—"

নির্মল সঙ্কটে প'ড়ে বললে, "অনেক দূর এগিয়ে গেছেন যে।"

প্রফুল্ল নবাগত, আসল ব্যাপার কিছুই এখনো জানে না, ঠাট্টা ক'রে বললে, "ওই গজেন্দ্রগমনের সঙ্গেও পাল্লা রেখে চলতে না পারলে পেছন পেছন যান না মশাই, নতুন রীত সৃষ্টি হোক—নারী আগে, পুরুষ পিছনে ; এতদিন তো—"

নির্মল লজ্জিত হ'ল, "তা যাচ্ছি, কিন্তু বুনো জায়গা হ'লেও ভয়ের কোনো কারণ নেই।"

"সুপ্রিয়াও তা জানে", ব'লে পলকমাত্র গমনোন্মুখ নির্মলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনুপম হোটেলের ম্যানেজারের উদ্দেশে প্রস্থান করল।

হাওয়ার দরুণ নির্মলের কানে অনুপমের মন্তব্য পৌঁছাল না, সেই দৃষ্টিও সে দেখতে পেল না, কিন্তু প্রফুল্লর চোখের সামনে লজ্জায় অভিমানে রেণুর মাথা হেঁট হ'য়ে গেল।

রাত্রে সুপ্রিয়া চুপি-চুপি রেণুর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলে, "দিদি!"

রেণুর সাড়া পাওয়া গেল না! সারাদিনের ক্লান্তির পর ও এমন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে যে, বাইরে হ্রদের জলে চাঁদের আলো আর পাহাড়ের ছায়ায় যে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে, ডাকাডাকি ক'রে জাগালেও তা চেয়ে দেখবার মতো মনের অবস্থা এরাত্রে আর হবে না ওর, বুঝে সুপ্রিয়া নিরাশ হ'য়ে আবার শুয়ে পড়ল। কিন্তু চাঁদের আলোয় ঘর যে ভ'রে গেছে! খানিকক্ষণ উস্‌খুস্ ক'রে সুপ্রিয়া আর থাকতে পারল না। নিঃশব্দে উঠে ড্রেসিংগাউনের উপর একটা গরম কাপড় জড়িয়ে জানালার বাইরে রেলিংঘেরা ছোট

বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বাতাসে বিপর্যস্ত চুলের গুচ্ছ ঈষৎ সরিয়ে মুখ তুলতেই দেখে—নিস্তব্ধ রাত্রির কোলে, পার্বত্যপ্রদেশের অটল শান্তির মাঝখানে, হোটেলের বাইরে ওই হ্রদের ঘাটে হেলান দিয়ে ব'সে—একাকী নির্মল। দীর্ঘ দেহ হ্রদের রূপালি জলে দীর্ঘতর ছায়া ফেলেছে, হাওয়ায় কুঞ্চিত কেশের কম্পন যেন এখান থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু মানুষটি কি ধ্যানমগ্ন? ওই চির-অনিদ্র জাগ্রত শৈলমালা, চন্দ্রকরফুল্ল স্তব্ধ অম্বর, বিসারিত মৌন জলরাশি!—এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে নীরবে নিশা জাগছে এ-কোন্ উদাসী মানব হৃদয়? একি লণ্ডনের পথে দেখা সেই নির্মল? সুন্দর তাকেও নিমেষের ইঙ্গিতে এমন ক'রে ঘুম ভুলিয়ে ঘরের বাইরে টেনে আনতে পারে?

আনন্দে আর সেই সঙ্গে অননুভূতপূর্ব বেদনায় সুপ্রিয়ার চোখে জল এলো। ওই স্তব্ধ ছবি—ও যে দুর্লভ ভাবুক-চিত্তের, সুপ্রিয়ার মানসপ্রিয় ধ্যান-শান্ত সত্য-শিব-সন্ধানীর! নির্মলের মাঝে সে দেখা দিল কী ক'রে? আর, এই কি সুপ্রিয়া চেয়েছিল? বরং অন্তর্দ্বন্দ্বে দিবারাত্রি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তবু নিজের মনের কাছেও স্বীকার করতে চায়নি যে, একমাত্র বাসনার টানে ছাড়া প্রবলতর আর কোনো শক্তিতে নির্মল ওকে নিজের দিকে টানতে পারে! যে ভালোবাসাকে ও মিথ্যা, কামনা-পঙ্কিল ব'লে কল্পনায় বারবার পায়ের নীচে দলিত করতে এতটুক দ্বিধা করেনি, যার অস্বাভাবিক উদ্দাম বেগ দেখে যৌবনের মত্ততা ছাড়া সে-আকর্ষণের মধ্যে এতটুকু সত্য আছে ব'লে ভাবতে পারেনি, তারই অন্তরালে সুন্দর একি মূর্তিতে দেখা দিল আজ!

অনেকক্ষণ অশ্রু-আকুল দুই চোখের একাগ্র দৃষ্টি জোর ক'রে মেলে ধ'রে দূর থেকেই যেন সে নির্মলের অন্তর অবধি তলিয়ে দেখবার জন্যে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখতে দেখতে ক্রমে এই চন্দ্রপ্লাবিত

যামিনীর অনবদ্য শান্ত-রূপের আবেষ্টনে সুপ্রিয়ার অগুণ্ঠ চেতনা অকস্মাৎ ওর আজীবনের শিক্ষাদীক্ষা সংস্কারকে অতিক্রম ক'রে আপন অন্তরের মাঝখানে এসে কিসের নীরব ধ্যানে গেল মগ্ন হ'য়ে। দেখল— সেখানে সংসার নেই, সমাজ নেই, নেই অনুপম, বা আপন-রচা শত-সহস্র জিজ্ঞাসা-রূপে বাধা-নিষেধের শৃঙ্খল। অনাঘ্রাত সৌরভের মতো ওর হৃদয়পুটে যেন চিরন্তন হ'য়ে রয়েছে শুধু ভালোবাসা, আর তারই ব্যাকুল প্রেরণায় সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে উন্মুখ সত্তাখানি।

সকালে রেণুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে সুপ্রিয়া অবাক হ'য়ে গেল। এত বেলা হয়েছে! ভোরে বেড়ানো আর হ'ল না। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিয়ে খাবার ঘরে ঢুকে দেখল সেখানে সবাই হাজির, খাওয়াও ওদের অর্ধেক সারা হ'য়ে গেছে। লজ্জিত হ'য়ে সে কী একটা বলতে যাবে এমন সময় প্রফুল্ল ব্যঙ্গ ক'রে হেসে বললে, "আপনাকেও কি ঐ ভাবুকের ছোঁয়াচ লেগেছিল কাল? একসঙ্গে রাত জেগেছিলেন ব'লে মনে হচ্ছে যে।" রেণুর দিকে ফিরে বললে, "সকালে কম ঠেলাঠেলি ক'রে তুলেছি নির্মলকে? এমন গাঢ় ঘুম জন্মে দেখিনি। ওকে ওঠাতে গিয়ে আমার আধ-ঘণ্টা সময় মাটি!"

রেণু অপরের অলক্ষ্যে সুপ্রিয়ার প্রসন্ন হাসিভরা সলজ্জ মুখের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল। প্রফুল্লকে হঠাৎ তাড়না ক'রে বললে, "যাওঃ, তোমার সবই বাড়িয়ে বলা অভ্যাস। আমি নিজের চোখে দেখলাম নির্মল ভোরে বেড়িয়ে ফিরে এলো।"

"ভোরে? সকাল সাতটা হ'ল—ভোর? আর আমি যে উঠেছি সাড়ে চারটেয়, তার কী?"

ওধার থেকে অনুপম ব'লে উঠল, "যা বলতে চাইছ তা-ই ব'লে

ফেলো না হে। দেখলাম ভালো ক'রে আলো না ফুটতেই জলের ধারে ব'সে লিখছে। বুঝলে, রেণু? ব্যাপার এই।"

"সত্যি? কই বের করো ত কবিতা। না, চলো হ্রদের ধারে যাওয়া যাক, এখানে নয়। অনু, এসো।"

"তোমরা যাও ভাই, আমার এখন দু'চারখানা দরকারী চিঠি না লিখলেই নয়।"

প্রফুল্ল রাগ ক'রে বললে, "আজও চিঠি? নাঃ, অনুকে নিয়ে আর পারা গেল না। যত রাজ্যের অ-কবির পাল্লায় প'ড়ে—"

"না গো না, যাবেন না কবিতালক্ষ্মী মাঠে মারা। আমি আছি কী করতে?" রেণু উঠে দাঁড়াল, "সু, চট্ ক'রে তৈরি হ'য়ে আয়।"

"তোমরা এগোও, আমি এই এলাম ব'লে।"

উপরে গিয়ে কিন্তু সুপ্রিয়া সেই জানালায় দাঁড়িয়ে গত রাত্রির কথা ভাবতে লাগল। রাত জেগেছে একসঙ্গে! তা বটে।............সেই চন্দ্রকরধৌত নীরব নিশার স্মৃতি!

মানুষের সন্দিগ্ধ চাহনির সামনে কিন্তু ও হৃদয়ের এই পরম আবিষ্কারকে কখনই প্রকাশ করবে না। করবার দরকারও বোধ করি হবে না। অনুপমের মন ক্রমশই ওর থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে, নিজেই একদিন সে সুপ্রিয়াকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেবে। আর নির্মল! সে তো অনেক আগেই সকল ভাবনা থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছে ওকে! বাইরের মিলন ওদের বিধিলিপি নয়। কিন্তু অন্তরের সংশয়ের ভয়ও আর নেই সুপ্রিয়ার। সেখানে যে ও দেবতার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল! সেই পরম শুভদৃষ্টির স্নিগ্ধতায় এখনও ওর দেহ-মন পুলকিত রসাপ্লুত। কে জানত যে, যে-ভগবানকে সংসারের মরুপথে অহরহ খুঁজে বেড়িয়েছে, অন্তরতম হ'য়ে তিনিই ওর বুকে প্রেমের আসনে লুকিয়ে বসেছিলেন! নইলে এ অঘটন ঘটল কী করে? শত

দোষ ত্রুটি উপেক্ষা ক'রে কাউকে এমন ক'রে ভালোবাসতে পারা—এ তো সুপ্রিয়ার নিজের স্বভাব নয়। কোনোদিন সে তা চায়ওনি। বরং ভালোর সঙ্গে মিশে চিরদিন ভালো হ'য়ে থাকবে, এ-ই ছিল ওর আকাঙ্ক্ষা। মন্দর প্রতি ঘৃণা আর ভয়—এত কালের সঞ্চিত সংস্কার—কার প্রসাদে এক রাত্রির মধ্যে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেল ?…এবার তবে সকল বন্ধন কাটিয়ে—

"মিস্—"

ধ্যান ভেঙে সুপ্রিয়া দোর খুলে দিল, "কী চাই ?"

"ওঁরা নাকি Loch Katrineএ যাবেন, আপনার জন্যে—"

সুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমেই দেখে নির্মল দাঁড়িয়ে। অত্যন্ত সহজভাবে সুপ্রিয়াকে সম্বোধন ক'রে বললে, "সবাই অনেকক্ষণ ব'সে আছে!" সামনের পাহাড়টা দেখিয়ে বললে, "রেণুদি ওরই ওপরে হেদারের বনে ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে পড়েছেন।"

ভিতরের অকারণ চাঞ্চল্য দমন ক'রে ধীরভাবে সুপ্রিয়া বললে, "তাহ'লে শীগ্‌গির পৌঁছানো যায় এমন কোনো সোজা পথে যাই চলুন। পাকা রাস্তা দিয়ে যেতে হ'লে অনেকটা হাঁটতে হবে তো ?"

"হাঁ। এক মিনিট সবুর করুন। ওয়েটার!"

ওয়েটার কী কতকগুলো এনে দিল। নির্মল একটু হেসে বললে, "স্যাণ্ডউইচ্ আর কেক; ফ্লাস্কে কফিও আছে। এবার যাওয়া যাক। সোজা যেতে হ'লে হ্রদের ধার দিয়ে বন-বাদাড় ভেঙে যেতে হয়। পারবেন তো জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে ?"

সুপ্রিয়া সংক্ষেপে বললে, "চলুন।" হঠাৎ ওর মন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। নির্মলের ব্যবহার অনিন্দনীয়, একটু জড়তা নেই সংকোচ নেই। সুপ্রিয়া যে সে-ই সুপ্রিয়া, তাও যেন মনে নেই। তবে কি নির্মল আর ভালোবাসে না ওকে ? যদি মনে ওর কোনো পরিবর্তন

না-ই হ'য়ে থাকবে, তবে কথাবার্তা এত স্বচ্ছ সহজ হ'ল কী ক'রে ? এ তো লুক্‌সেম্বর্গ গার্ডেনের সেই সদাকুণ্ঠিত প্রেমভিখারী নয় !......

হায় রে মানুষের মন ! এ যে কখন্ কী চায়, তা কি সে নিজেই জানে। একটু আগে সুপ্রিয়ার সন্দেহ ছিল না যে নির্মল এখনও ওকে আগেরই মতো ভালোবাসে। এমন কি গত রাত্রির সেই স্তব্ধ বহিঃ-প্রকৃতির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ওর মৌন ধ্যানমূর্তি—তাতেও বন-আত্মার পূজার সঙ্গে আপন প্রিয়ার স্মৃতি জড়িয়ে-মিশিয়ে এক হ'য়ে ছিল, এই ছিল সুপ্রিয়ার স্থির বিশ্বাস। কল্পনা ওর আরও এক ধাপ উপরে উঠে মনে মনে এমনও ভেবে নিয়েছিল যে হয়ত না-পাওয়ার বেদনাতেই নির্মল এত সত্বর এমন আশ্চর্যরকম বদ্‌লে গেছে, হয়ত সে-বেদনাই ওকে জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে ঘরের ভিতর স্থির হ'য়ে থাকতে দেয়নি।—

তাই সুপ্রিয়া সারা রাত নিজের সমস্ত অন্তরকে স্নেহের রসে স্নিগ্ধ ক'রে নির্মলের অন্তরের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। মনশ্চক্ষে বারবার ওই করুণ ক্লান্ত মুখখানি তুলে ধ'রে প্রেমফুল্ল আঁখির সহানুভূতি ঢেলে ওর নিস্তেজ প্রাণকে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছে। কিন্তু একবারও মনে হয়নি যে দূরের প্রেমকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে। একে তো সুপ্রিয়ার মন চিরকালই দেহ-বিষয়ে অতি অদ্ভুত কুণ্ঠায় ভরা, তার উপর—হ্যাঁ, নিজের কাছে অন্তত স্বীকার করতে হবে—নির্মলের গভীর অন্তরকে সে বুঝতে পারে, ভালোবাসে; কারণ সেখানে ও নিজের আশা-অভীপ্সার দোসর খুঁজে পায়। কিন্তু বাইরের ব্যাপারে ?—নির্মল ওর কাছে এক প্রহেলিকা। দেহের শুচিতা, পুরুষের হোক বা নারীরই হোক, সুপ্রিয়ার কাছে বহুমূল্য। সে-হিসাবে নির্মল ওর আদর্শ নয়। তবু বিচিত্র মন সমস্ত জেনেও এই অনাদর্শকেই যখন ভালোবেসেছে, তখন

আর বৃথা নিজের সঙ্গে লড়াইতে শক্তিক্ষয় ক'রে লাভ কী! শান্তভাবে অন্তরের উপলব্ধির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে সে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। কিন্তু এই সমর্পণ অন্তরের কাছে অন্তরের, দেহের কোনো প্রশ্নই আসে না তাতে। তাই সুপ্রিয়া সুখী ছিল। অথচ ঘণ্টাকয়েক না যেতে এ কী! কোথায় গেল সেই পাওয়ার প্রত্যাশাহীন সুস্নিগ্ধ আবেগ! নির্মল এমন উদাসীন ওর সম্বন্ধে—ভাবতেও একি দুঃসহ ব্যথা!

ওর মনের কথা জানবার জন্যে এমন প্রচণ্ড বাসনাও তো সুপ্রিয়া এর আগে অনুভব করেনি। তাছাড়া—লজ্জার উপর লজ্জা!—এই যে নির্জন পথে দু'জনে পাশাপাশি চলেছে, পথের সঙ্কীর্ণতার জন্যে এক একবার গায়ে গা-ঠেকে যাচ্ছে, কণ্টক-বহুল জায়গায় নির্মল অসংকোচে ওর হাত ধ'রে সাবধানে পার করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, প্রতিবারেই ওর স্পর্শে সুপ্রিয়ার সমগ্র দেহে পুলকের এ কি উচ্ছল শিহরণ! এমন যে হ'তে পারে, সে কি তা স্বপ্নেও ভেবেছিল? একদিকে ওর মন চাইছে—যত শীগ্‌গির সম্ভব এ-পথের অবসান হোক; এ-উচ্ছ্বাস এ-আবেগ ওর দীর্ঘ একুশ বছরের সংযমকে কি শেষে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে? আর, তাও তেমন লোকের জন্যে যার অনেকখানিই এখনো ওর কাছে আধ-আলো আধ-আঁধারের মতো আবছা রহস্যময়?…অথচ ঠিক সেই সঙ্গে প্রাণ অমনি বিদ্রোহ ক'রে বলছে এ পথ যেন আর না ফুরায়!

হঠাৎ নির্মল ফিরে দাঁড়াল। সুপ্রিয়ার পায়ের দিকে চোখ রেখে বললে, "কষ্ট হচ্ছে?"

"না।"

"হাঁটতে পারছেন না যে? এদিকে আমিও কি পথ ভুল ক'রে বসলাম? ওঁরা তো সামনেই ঐ টিলাটার উপর গাছের নীচে বসে-ছিলেন। না—পাহাড়ের পিঠ ছেয়ে ওই তো সেই হেদারের বন।"

"আর, ওরা ?"

"তাই তো ভাবছি।"

"Loch Katrine কতদূর এখান থেকে ?"

"পাহাড় বেয়ে যেতে পারলে বেশি দূর না। আমার মনে হচ্ছে দেরি দেখে ওঁরা সেদিকেই গেছেন।"

"চলুন আমরাও যাই।"

"তবে এই ডানদিকে ফেরা যাক।" নির্মল আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল।

কয়েক পা গিয়ে অপেক্ষাকৃত ঘন বনের মধ্যে ঢুকে সুপ্রিয়া একটু হেসে বললে, "সাপখোপ নেই তো ?"

"না, না। আঃ—ওই দেখুন !"

তিন চারটা বড় বড় গাছের নীচে, সবুজ ঘাসের আস্তরণের উপর অপূর্ব দৃশ্য। রাশি রাশি ব্লু-বেল ফুটে জায়গাটি যেন নীল-আলোময় ক'রে রেখেছে। সুপ্রিয়ার পা আর চলতে চায় না। নির্মল ওর মনের ভাব বুঝে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু ইতস্তত ক'রে মাথা নেড়ে সুপ্রিয়া বললে, "থাক্, ছিঁড়লে কি আর এত সুন্দর দেখাবে ?"

"নিন না দু'এক গোছা, খোলা জানলার কাছে জল দিয়ে রেখে দেবেন, অনেকক্ষণ তাজা থাকবে। আচ্ছা, আমিই এনে দিচ্ছি।"

সুপ্রিয়া অত্যন্ত নিরুৎসুকভাবে বাধা দিল ওকে। নির্মল আশ্চর্য হ'য়ে ফিরে দাঁড়াতে ওর চোখ এড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে কঠিনমুখে শুধু বললে, "না।"

নির্মল যেন মুহূর্তে ম্লান হ'য়ে গেল।

সুপ্রিয়া অধোমুখে পথ চলতে থাকে। হঠাৎ একি হ'য়ে গেল ! ছেলেরা সঙ্গে থাকলে মেয়েদের নানাভাবে সাহায্য করে, এদেশে

তাতে কেউ কিছু মনে করে না। ফুল তুলে দেওয়া এমন একটা ভয়ানক ব্যাপার নয়, এ-ড্রামাটুকু না করলেও চলত—ধিক্কারে মন কালো হ'য়ে ওঠে। রেণু তো অসংকোচে বন্ধুদের প্রীতির দান গ্রহণ করে, প্রফুল্ল বা অশান্ত কিংবা অনুপম—যে কেউ হ'লে সুপ্রিয়াও আপত্তি করত না। তবে নির্মলের বেলায়ই হঠাৎ এরকম করবার মানে?······সুপ্রিয়া বুঝল সবই।

মিনিট দশেক নীরবে চলবার পরে নির্মল হাত দিয়ে সামনে দেখিয়ে বললে, "লক্ কেট্রীন্।"

দুপুরের রোদে, ঘননীল বৃক্ষ পত্রের ভিতর দিয়ে হ্রদের জল চিক্ চিক্ করছে। চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম। কেবল মাঝে মাঝে দু'একটি বনচারী পাখার মিষ্টি করুণ সুর, আর ইতস্তত ঝোপ থেকে ঝোপান্তরে ত্রস্ত খরগোসের চম্‌কে ছোটা। সুপ্রিয়া মুহূর্তের মধ্যে সকল অভিমান, দ্বিধা সন্দেহ ভুলে সাগ্রহে ব'লে উঠল, "জলের ধার দিয়ে যাই?"

"বেশি কষ্ট হ'তে পারে।"

"তা হোক।"

গাছের আড়াল থেকে বার হ'য়ে দু'জনে জলের কাছে পরিষ্কার জায়গায় নেমে এলো। তখন দেখা গেল অদূরে শিলার উপর পা ঝুলিয়ে ব'সে রেণু আর প্রফুল্ল। ওদের দেখে প্রফুল্ল চেঁচিয়ে বললে, "কই, শীগ্‌গির খাবার নিয়ে এসো।"

খাবারগুলো নামিয়ে দিয়ে নির্মল বললে, "দিদি, এবার আমি একটু ওদিকটায় ঘুরে আসি।"

"বাঃ সে কি হয়? লাঞ্চের সময় হ'য়ে এলো, এখনি ফিরতে হবে।"

"ঠিক সময়েই হোটেলে ফিরব। আপনারা এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না।" আর বাদ-প্রতিবাদের অবসরমাত্র না দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নির্মল দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে গেল। রেণুর ইচ্ছা হ'ল

সুপ্রিয়ার চোখ দু'টি একবার ভালো ক'রে দেখে নেয়, কিন্তু সে হ্রদে নেমে হাত ধোবার ছলে বিবর্ণ মুখখানি রেণুর দৃষ্টি থেকে আড়াল ক'রে বলল।

সন্ধ্যার একটু পরে রেণু বললে, "বড় ক্লান্ত লাগছে। কাল সকালেই যখন ফিরতে হবে, এখন যতটা পারি বিশ্রাম ক'রে নিই। খাবারটা ওপরে পাঠিয়ে দিস সু। প্রফুল্ল, ওকে একটু বেড়িয়ে এনো।"

প্রফুল্ল রাজি হ'ল না। নানা আপত্তি দেখিয়ে শেষে বললে, "আমার সে লেখাটা তাহ'লে আজও হবে না। চাঁদিনী রাতের এমন প্রেরণা কি গ্লাসগো ফিরে পাবো আর? কিন্তু সুপ্রিয়া দেবী, আপনার কিছুমাত্র ভয় নেই—"

"জানি। আপনিও নির্ভয়ে কাব্য-চর্চা করুন। কবির সঙ্গে বে-ঘোরে বেড়ানোর চাইতে একলা বেড়ানো ঢের বেশি নিরাপদ। তুমি আর বোলো না দিদি।"

রেণু আর অনুপম হেসে উঠল।

হাসি থামলে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করলে, "ওই বেকার মানুষ নির্মল থাকতে কবি বা কর্মীকে নিয়ে টানাটানি কেন? অনু যেখানে যায়, সাথে যায় একতাড়া কাগজপত্র। ওর কি নিশ্বাস ফেলবার সময় আছে? আর আমি বেচারী—"

রেণু বাধা দিয়ে বললে, "থাক্, নিজের উপর অতখানি দরদে কাজ নেই। তাহ'লেও কবিতার প্রেরণা ছুটে যেতে পারে। আমি কিন্তু চললাম ওপরে, তোমাদের যার যা খুসি করো।"

নির্মল এক মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবলে! নিজে থেকে ডাকা যেমন মুস্কিল, সঙ্গে যেতে চাইলে 'এসো না' বলাও তেমনি

অশোভন। অথচ ঠিক কোন্‌টি করলে যে এঁরা সত্যি খুসি হবেন তাও জানা নেই। এই উভয় সঙ্কটের মাঝে প'ড়ে চুপ ক'রে থাকা ছাড়া ওর আর উপায় কী। সাতপাঁচ ভেবে আগে থেকে নিঃশব্দে স'রে পড়ছিল, সুপ্রিয়া হঠাৎ বললে, "একটু দাঁড়ান, কোটটা নিয়ে আসি।"

রেণু মনে মনে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। এতদিন পরে কি সুপ্রিয়া নিজেকে চিনেছে!

যাবার সময় অনুপম গম্ভীরমুখে বললে, "বেশি দেরি কোরো না নির্মল, ঠাণ্ডা লাগতে পারে। মিনু, কোটের কলারটা ভালো ক'রে তুলে দাও।" পরক্ষণে টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গেল।

উপরে উঠতে উঠতে সিঁড়ির মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে রেণু ওর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলে। ধীর প্রশান্ত সে মুখ, অন্তরের জ্বালার কোনো চিহ্নই নেই বাইরে।

রাস্তায় নেমে নির্মল জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্‌দিকে যাবেন?"

"আর একটু পরেই চাঁদ উঠবে, না? তবে ঐ গাছ্‌তলায় বসি চলুন। একেবারে জলের ধারে।" খানিক চুপ ক'রে থেকে মৃদুকণ্ঠে সুপ্রিয়া বললে, "আমি কিন্তু বেড়াতে আসিনি, তার কোনো দরকার ছিল না।"

এই কথা ও গলার সুরে নির্মলের বুকের রক্ত অকস্মাৎ আগেকার দিনের মতোই উদ্বেল হ'য়ে উঠল। চুপ ক'রে সে ভিতরে ভিতরে নিজেকে সামলাতে লাগল।

সুপ্রিয়া আবার বললে, "সকালে ফুল নিতে আমার সত্যিই অনিচ্ছা ছিল না।"

নির্মল নত নেত্র তুলে জিজ্ঞাসুভাবে একবার তাকাতেই তাড়াতাড়ি সুপ্রিয়া চোখ ফিরিয়ে নিলে। পলকমাত্র সেই মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে উত্তরে নির্মল একটি কথাও বলতে সাহস করলে না।...

ধীরে ধীরে পাহাড়ের পিছন থেকে চাঁদ উঠতে লাগল। গাছের ছায়ায় ওদের দুজনকে আর প্রায় দেখা যায় না। চারিদিক কী ভয়ানক নির্জন! যেন এক ঘুমন্ত মায়াপুরী। দূরে একমাত্র হোটেলখানি ছাড়া আশে-পাশে মাইলখানেকের ভিতর কোনো বাড়ি নেই।...

হঠাৎ সুপ্রিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "কালই তো আমরা চ'লে যাচ্ছি। আর কোনোদিন হয়ত দেখাও হবে না।"

এর পরে নির্মলের আত্মসংবরণ করা দায় হ'য়ে উঠল। দাঁতে ঠোঁট চেপে পাথরের মতন স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল।

বহুক্ষণ পরে সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল। কী যে আশা করেছিল, কীই বা চেয়েও পেল না, এ-চিন্তাকে একটা পরম বেদনার মতো কেবল—কেবলই নিজের বুকের ভিতর থেকে দূরে ঠেলে দিতে দিতে কোনো মতে হোটেলের দুয়ারে পৌঁছে সোজা উপরে উঠে গেল। পিছনে আচ্ছন্ন আবিষ্টবৎ যে দাঁড়িয়ে রইল, তার দিকে একবার ফিরেও দেখল না আর।

* * *

ভোরে হঠাৎ কী একটা শব্দে পীড়িত চিত্তের অশান্ত নিদ্রা ভেঙে সুপ্রিয়া ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। চোখ মুছতে মুছতে এদিক ওদিক চেয়ে বললে, "দিদি কি ডাকছিলে?"

ক্ষীণ কণ্ঠে রেণু উত্তর করলে, "হাঁ ভাই, ওই জানালাটা বন্ধ ক'রে দেবার জন্যে, শীত করছে।"

তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ ক'রে সুপ্রিয়া উদ্বিগ্নভাবে খাটের কাছে

এসে বললে, "অমন করছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে? উঃ, গা যে গরম! জ্বর—"

"খুব বেশি ব'লে মনে হচ্ছে নাকি রে?···তবে তো মুস্কিল করলে। আজ না আমাদের ফেরবার কথা? অনুকে ডাক্ তো।"

চাকর এসে খবর দিয়ে গেল—ওরা তিনজনেই বেরিয়ে গেছে।

একটু পরে হোটেলে ফিরে এসে অনুপম যখন ব্যাপার কী দেখতে এলো, রেণু তখন প্রবল জ্বরের ঘোরে ছট্‌ফট্ করছে। অবস্থা দেখে অনুপম ভয় পেয়ে বললে, "রাত্রেই ডাকোনি কেন?"

সুপ্রিয়া শুষ্কমুখে বললে, "জানতাম না। জ্বরটা বোধ হয় সকালেই এসেছিল। উঠে দেখি জানলা খোলা, বললে শীত করছে।"

"কোন্ জানলা? এইটে? তবে আর কি, সারা রাত ঠাণ্ডা লাগিয়েছে।"

রেণু একটুখানি নিঝুম হ'য়ে পড়েছিল। এবার মাথাটা তুলে কষ্টে চোখ চেয়ে বললে, "না, রাত্রে নয়, বিকেল থেকেই শরীরটা ভালো ছিল না। মিছিমিছি কষ্ট দিলাম সবাইকে। কোনোমতে গ্লাসগো পর্যন্ত যাওয়া যায় না আজ?"

"আচ্ছা, সে আমরা দেখব এখন। তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাকো তো।"

খাবার ঘরে এসে অনুপম নির্মল আর প্রফুল্লকে সমস্ত খুলে ব'লে জিজ্ঞাসা করলে, "এখন উপায়?"

নির্মলের মুখ শুকিয়ে গেল, তিনজনের মধ্যে একমাত্র ও-ই নিশ্চিত ক'রে জানত রেণুর আসল অসুখটা কী। তার উপর আবার এই উপসর্গ! ও ভেবেই পেল না কী বলবে।

প্রফুল্ল উঠে এসে বললে, "এখনই ডাক্তার ডাকো। আর এক মিনিটও দেরি নয়।"

"পাগল! এখানে ডাক্তার কোথায়?"

"আছেই কোথাও। কাছে না থাকলেও দূরে। আমি চললাম, যত দূরেই থাক সঙ্গে নিয়ে তবে ফিরব।"

নির্মলও উঠে বললে, "সে-ই ভালো, চলুন আমিও যাই। আপনারা ততক্ষণ ওঁকে একটু আরাম দিতে চেষ্টা করুন—যতটুকু শুশ্রূষায় দেওয়া যায়।"

অনুপম সস্নেহে প্রফুল্লর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনার স্বরে বললে, "এত ব্যস্ত হ'য়ো না, রেণুর মাঝে-মাঝেই জ্বর হয় এরকম। কোথায় শুধু শুধু ঘুরে বেড়াবে? বরং চলো ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করা যাক্।···ওয়েটার, ম্যানেজার সাহেব কি নীচে নেমেছেন? বিশেষ দরকার আছে, এখনই একবার দেখা করতে চাই—বোলো। চলো হে প্রফুল্ল—Cheer up old boy."

নির্মল বুঝল প্রফুল্লর মনের কথা অনুপমেরও অজানা নেই। ভাবলে, "বেচারী! কেন যে মানুষ ভালোবাসে!"

* * *

খুঁজে-পেতে ডাক্তার পাওয়া গেছে, কিন্তু রায় শুনে সকলের মুখ যে শুকিয়ে গেল! আজ তো নয়ই, মাসখানেকের মধ্যেও নাকি রেণুর নড়াচড়া করবার উপায় নেই। শক্ত অসুখ। সারবে কিনা?—সারা-না-সারা কি এক মিনিটের কথা? ভিতরে ভিতরে হার্ট বা ফুস্‌ফুস্ কোনোটার অবস্থাই ভালো নয়। হ'ত যদি গ্লাসগো—ডাক্তার গ্লাসগো থেকেই এসেছেন—জোর ক'রে আশ্বাস দেওয়া যেত। কিন্তু এই রোগীকে, এ্যাম্বুলেন্সে ক'রেও, এখনই অত দূরে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন না। টিউবারকিউলসিস্ প্রথম স্টেজ্ ছাড়িয়ে যায়নি যদিও—চিকিৎসা করালে সারতেও পারে, কিন্তু তার উপর এ-টাইপের নিউমোনিয়া—এ অতি সাংঘাতিক।

সমস্ত শুনে অনুপম অসাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

ফিরবার মুখে ডাক্তার হঠাৎ বললেন, "ভিতরে ভিতরে ইনি টি-বি-তে ভুগছিলেন আর আপনারা কেউ কিছুই জানতেন না?"

অনুপম শুষ্কস্বরে বললে, "মাসখানেক আগে একবার সন্দেহ হয়েছিল আমার, কিন্তু ও কিছুতেই স্বীকার করলে না।"

"রোগীর কথা শুনতে আছে? ডাক্তার ডেকে পরীক্ষা করাতে কি হয়েছিল তখন?"

"তাও বলেছিলাম, কিন্তু ও নিজেই ডাক্তার, অসুখ-বিসুখ হ'লে আমরাই বরং ওর কথা মেনে চলি। তাই, যখন এত বড় রোগের কথা শুনেও হেসে উড়িয়ে দিলে—"

এমন শক্ত মানুষটার চোখ দু'টো ছলছল্ ক'রে উঠল। ডাক্তার অপেক্ষাকৃত সদয়কণ্ঠে বললেন, "যাক্, দুঃখ ক'রে আর লাভ কী? কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন এখন।"

প্রফুল্ল উত্তেজিতভাবে বললে, "ডাক্তার, যেমন ক'রে হোক, বাঁচাতেই হবে ওঁকে। কথা দিন!"

সংক্ষেপে ঘাড় নেড়ে চোখের কোণে প্রফুল্লকে একবার দেখে নিয়ে ডাক্তার পথে নেমে এলেন।

হোটেলের ম্যানেজার বিরসমুখে কাছে এসে বললে, "এরকম ভয়ানক রোগ—হোটেলে তো—"

"এখন অন্যত্র নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বাঁচানো যাবে না।"

"কিন্তু—"

"উপায় কী? একটা মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি—এসময় ক্ষতিটুকু আপনাকে সহ্য করতেই হবে। তবে, যতটা সম্ভব secluded রাখতে পারেন, তাহ'লে আর কারো কিছু হবে না।"

ডাক্তার চ'লে গেলেন।

সত্যি বটে দিনের পর রাত্রি আসে, রাত্রির পর দিন। কিন্তু কে বলেছিল, মেঘের পরে রৌদ্র যেমন, দুঃখের পরে তেমনই সুখের আলো ফোটে মানুষের জীবনে? যে প্রথম বলেছিল একথা, তার খবর জানা থাকলে সুপ্রিয়া তার ভুল ভেঙে দিত।

সেদিন হোটেলের কোন্ এক কর্মচারী—বুড়ো মানুষ, মনটা ভালো—সান্ত্বনার সুরে বলতে গিয়েছিল, "কেন এত ভাবছেন মিস্, মনে নেই—মেঘ যত কালোই হোক, সোনালি পাড়টুকু ততই—"

সুপ্রিয়া অসহিষ্ণুর মতন বাধা দিয়ে বললে, "সব মেঘেই সোণালি পাড় দেখিনি মিঃ ম্যাকাল্‌পাইন!"

"দেখেননি? বাঃ, সবাই জানে—"

"না।"

এত 'ছোট মেয়ের' এমন 'নাস্তিকতা' দেখে বুড়ো অবাক হ'য়ে বললে, "এ যে জ্ঞানী লোকের কথা, প্রমাণিত সত্য: দুঃখের পরে সুখ—অবশ্যম্ভাবী। আচ্ছা, আপনি কখনো দেখেননি বলছেন? প্রমাণ—"

সুপ্রিয়া আর তর্ক না ক'রে ধীরে উঠে গেল ওখান থেকে। বুড়ো মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই, কিন্তু প্রমাণ?—সে নিজে তবে রয়েছে কেন? একটানা চির-দুঃখের প্রমাণ হাতে-নাতে দিতে যদি না-ই পারবে, তবে রেণু-নামে এক দুর্ভাগিনীর জীবনের ইতিহাস প্রথম থেকে শেষ অবধি বেদনার আরক্ত-লিখনে ওরই বুকের মাঝে এমন বিঁধে রইল কেন? না পারে সে এ-বোঝা নামাতে, না খুঁজে পায় এর কোনো অর্থ। বিশ্ব-শিল্পী এক বিরাট ব্যর্থতার ছবি এঁকে আপন হাতের শিল্প-চাতুরীর পরিচয় দেবার জন্যেই কি রেণুকে সৃষ্টি করে-ছিলেন? কিন্তু বড় জোর জন-পাঁচেক লোক ছাড়া কে-ই বা জানল, কে-ই বা দেখল কত বড় একটা অভিনয় হ'ল নিঃশব্দে জগতের এক

কোণে, তারপর অসার্থক শূন্যতায় গেল মিলিয়ে? সাক্ষী যারা রইল তারা এ-নির্দয় নাটকের রস বা রহস্যটুকু বুঝতে যদি না পারে? জীবনের গরলে আকণ্ঠ পূর্ণ ক'রে—

ভাবতে ভাবতে সুপ্রিয়া যেন ভেঙে পড়ল। হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল—যেখানে প্রাণে মেরে একেবারে অব্যাহতি দিতে পারতে, ভগবান! সেখানে প্রাণটুকুই শুধু রেখে এমন ভয়ানক শাস্তি কেন—কোন্ পাপে?—আজীবন মুখ বুজে দুঃখ সহ্য ক'রে আসার?

অনেকক্ষণ কেঁদে শ্রান্ত হ'য়েও সেখানেই একভাবে ব'সে রইল। বাড়ি ফিরে কী হবে? রেণুর সামনে হাসির মুখোস্ প'রে দাঁড়াবে সে কিসের জোরে? আর, হাসতে না পারলে ঐ ব্যথিতার ব্যথা দ্বিগুণ বাড়াবার জন্যে এ-কালোমুখ নিয়ে তার কাছে যাওয়াই বা কেন? হায় বুদ্ধ, বিবেকানন্দ, নির্জন ঘরে তোমাদের কাছ থেকে পাওয়া শান্তির সে-সঞ্চয়ও এমন দু'দিনেই গেল ফুরিয়ে?……

ক্রমে হোটেলের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল, হ্রদের জল নক্ষত্র-বিহীন আকাশ ও চারিদিকের পাহাড়ের ঘনীভূত ছায়ায় তরল কালির মতো টল্‌টল্ করতে লাগল। জানালায় দাঁড়িয়ে অনুপম এদিকে তাকিয়েছিল। অন্ধকার হ'য়ে গেল, এখনও সুপ্রিয়া বাড়ি ফিরল না দেখে টর্চ্‌টি হাতে নিয়ে কোট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মাত্র আজই ডাক্তার সঠিক খবর জানতে দিয়েছে—এ-জীবনে আর রেণুর নষ্ট চোখ, নষ্ট হাত ও পা ফিরে পাবার আশা নেই। একজন সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষের সর্বোত্তম ধন—তার অর্ধ অঙ্গ! তবু রেণু নিজে এই ভয়ানক দুর্ভাগ্যকে আশ্চর্য শান্তভাবে নিয়েছে। ওর মনে কী আছে কে জানে, কিন্তু বাইরে একটা দীর্ঘশ্বাস, একটু চোখের জল না।

কিন্তু সুপ্রিয়া সেই যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে—পাগলের মতো,

অবরুদ্ধ কান্নায় ক্ষোভে নিরুপায় আক্রোশে মুখচোখ লাল ক'রে—তারপর বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা রাত্তিরে মিশাতে চলল।

. উতলা শুধু ও নয়, প্রফুল্ল পুরুষমানুষ—তবু সাহস ক'রে এখন পর্যন্ত একবারও রেণুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে না। নির্মলই সেই থেকে ঠায় ব'সে আছে রেণুর কাছে। এই বিপদে আশ্চর্য হৃদয়বত্তার পরিচয় দিল ছেলেটি। মাসখানেক আগেও ওর সম্বন্ধে অনুপমের ধারণা কী ছিল ভাবলে এখন লজ্জা হয়। সেই যে কথায় বলে, চাঁদেরও কলঙ্ক আছে—তাই বুঝি এমন লোকও নিজের স্বভাব-বিরোধী অন্যায় কাজ ক'রে ফেলতে পারে এক এক সময়। কিন্তু এ কথা মানতেই হবে অনুপমকে—নির্মল আগে যা-ই ক'রে থাকুক না কেন, এখন সুপ্রিয়ার সঙ্গে ওর ব্যবহারে একটা অকাট্য দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ে। এখন কে যে কা'কে চায়, আর কে-ই বা কা'কে এড়িয়ে চলেছে, রুগ্না আত্মীয়ার শয্যাপাশে প্রায় চার সপ্তাহব্যাপী মরণ-বাঁচন সেবা-মগ্নতার মধ্যে তা স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে না উঠলেও এই শেষের কয়দিন সুপ্রিয়ার অনেক অসাবধান অন্যমনস্ক মুহূর্তের ফাঁকে ফাঁকে ওর হৃদয়ের ব্যথা চোখের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। সুপ্রিয়ার প্রত্যেকটি ভাব-ভঙ্গি অনুপমের জানা। ছেলেবেলা থেকে ওর একধরণের ভালোবাসা সেও তো পেয়েছে; বন্ধুরা ঠাট্টা ক'রে বলত—সুপ্রিয়া ওকে প্রায় পূজা করে, হেঁটে গেলে বুক পেতে দিতে চায়!···কিন্তু আজকের সুপ্রিয়ার গভীর চোখের ওই কালো রেখা, সমস্ত মুখের ব্যাকুল আপনহারা ভাব, নির্মলের সান্নিধ্যে দেহের প্রতি রক্তকণার উন্মুখ চমকন—যা দূরে দাঁড়িয়েও অনুপম নিয়ত নিজের মধ্যে অনুভব করে—সেদিনের সে কিশোরী বালায় ছিল কি?

সমস্ত মিলে অনুপমকে যেন দিশাহারা করবার যোগাড় হয়েছে। রেণু থেকেও নেই, সুপ্রিয়াও যাবে—এ অবস্থা কল্পনার অতীত

ওর। কর্তব্যের কঠোর পথেও চলবে সে আর কোন্ উৎসাহে ? এরা দুজন ওর আশা আকাঙ্ক্ষার কতখানি জুড়ে বসেছিল, জানলে আগে হয়ত—কিন্তু জানলেই বা কী করত ? যাক, সবাই ওকে ছেড়ে যাবে, তবু সে-ই ছাড়বে না ওর আদর্শ। ওর জন্মভূমির স্বাধীনতার সাধনা-শপথের পাশে তুচ্ছ ওর দয়িতা, তুচ্ছ প্রিয়তম বন্ধুরও ভিন্ন পথে যাত্রা। তবে অন্তরের মাঝে নিঃশব্দে যে বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হ'য়ে উঠছে, তা হঠাৎ আগ্নেয়গিরির গৈরিক-স্রাবের মতো আপনা হ'তে ফেটে গিয়ে প্রলয় না ঘটায়, ওরা আপন আপন শপথ ভেঙে ও কর্তব্য ভুলে যে অন্ধ-পথে পা বাড়াতে উদ্যত হয়েছে সে পথে জোর ক'রে আরো ঠেলে না দেয় ওদের—এইটে দেখতে হবে। এ সঙ্কটের সময় পাকা সেনাপতি, পাকা মাঝির মতো সহিষ্ণু হ'তে হবে ওকে। হয়ত ত্রুটি বিচ্যুতি ভুলে আবার একদিন একই জায়গায় মিলবে সবাই। নাও যদি মেলে, তবু সেটা যেন অনুপমের দোষে না হয়। দেশের মহৎ মঙ্গলের কাছে নিজের স্বার্থ ভুলে যাবে সে, মান অপমান গায়ে মাখবে না। তবু যদি ওদের হুঁস্ হয় !

ভাবতে ভাবতে অন্ধকারে পথচারী কার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। অস্ফুট শব্দে চকিত হ'য়ে বললে, "কে ? মিনু ?"

"ওমা, তুমি ? আর একটু হ'লে দিয়েছিলে আমায় লেক্কে ফেলে ! এই অন্ধকারে যাচ্ছ কোথায় ?"

"তোমারই খোঁজে। এই যে টর্চ জ্বালছি—এসো। এত দেরি করতে আছে ? বাঘ-ভালুক না থাকুক, বিষাক্ত সাপখোপও কি নেই ? খেয়েছও তো সেই কোন্ সকালে।"

সুপ্রিয়া চুপ ক'রে পাশে পাশে চলল। অনেক দিন পরে অনুর মুখে এই মিষ্ট শাসনের সুর। এতে সুপ্রিয়া আনন্দ যেমন পায়, ভয় পায়

তার চতুর্গুণ। দোটানায় প'ড়ে ওর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হ'তে থাকে। না পারে একে কিছু দিতে, না পারে ওকে চাইতে। নারীর জীবনে এমন লজ্জাকর সমস্যা আর আছে কি? অনু হ'ত যদি ওর বন্ধু, ওর ভাই, তবে দুঃখের দিনে ওর চেয়ে বড় আশ্রয় সুপ্রিয়া কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু অনুর অনড় আদর্শ আর সুপ্রিয়ার প্রতি ওর মনের ভাব, ওদের পূর্ব সম্বন্ধ, সমস্তই এখন সহজ সম্পর্কের, স্বার্থগন্ধহীন স্নেহের আদান-প্রদানের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। তাই মনের ব্যথা ওর কাছে উজাড় ক'রে দেবার উপায়ও নেই। অপরাধী মনে হ'তে থাকে নিজেকে, কিন্তু সুপ্রিয়া করবে কি? মাঝে মাঝে মনে হয়, কারো প্রতি কোনো অন্যায় না ক'রে নিজেই কোথাও চ'লে যাওয়া ছাড়া ওর আর অন্য পথ নেই এবং হয়ত তাই করতে হবে শেষ পর্যন্ত।

নিরালা পথে ওরা পাশাপাশি চলেছে, কিন্তু মুখে কারো কথাটি নেই। যে কখনও এমন সঙ্কটে পড়েনি, তার সাধ্যও নেই এদের লজ্জা, বেদনা ও অস্বস্তির কণামাত্র উপলব্ধি করে। অন্ধকারে সুপ্রিয়ার চোখের জল ঝরতে লাগল অবাধে। অনুপম সে ব্যথার কিছুই জানল না, বুঝল না। যে তাকে চায় না, তার পিছনে এমন বিনা আহ্বানে উপযাচক হ'য়ে ছুটে আসার গ্লানি এত বিঁধতে থাকে যে ওর ইচ্ছা হ'ল চেঁচিয়ে বলে, "সুপ্রিয়া, তোমার যখন যেখানে ইচ্ছা যেয়ো, যাকে খুসী বরণ কোরো—আমায় কেবল রেহাই দাও, রেহাই দাও তোমার এ নীরব ঔদাসীন্য, তোমার ওই গূঢ় ভৎর্সনার দায় থেকে।" হৃদয় বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতে চায়। বাস্তবিক, কেন সে আর একজনের বাসনার পথে বাধা হ'য়ে থাকবে? কেন অনিচ্ছুককে ওর আপন আদর্শের সঙ্গে জোর ক'রে জড়াতে যাবে? দেশ কি এতই বড় যে অপমান স'য়ে, আত্মমর্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়েও এমন লোকের মাঝে তার সেবক খুঁজতে হবে ওকে? দেশসেবাই যার সত্যিকার আদর্শ,

সে নিজেই ছুটে আসবে না? একটি অবুঝ মেয়ের কাছে বারবার ছোট হ'তে হচ্ছে, নীরব প্রত্যাখ্যানের বেদনা সয়েও নিষ্ঠার ব্রত রাখতে হবে—এমন কী বড় তার দেশ!

অন্তরে আলোড়ন দেখা দিতে না দিতে চিরদিনের সংস্কার মতো মন কিন্তু কথা ক'য়ে উঠল "হাঁ, দেশ এতই বড় এমনই সত্য সে যে, তার প্রতি নিষ্ঠার পাশে আমার নিজের আশা নিরাশা, ভাবনা বা বেদনা, মান-অপমান সব মিথ্যা সব তুচ্ছ। সুপ্রিয়া যদি স্বেচ্ছায় চ'লেও যায়, আর আমি বাধা দেব না কিন্তু নিজের কথা ভেবে মান রাখতে গিয়ে ওকে অন্য পথে ঠেলে দিয়ে আমার দেশের ক্ষতি করতে পারব না। কিছুতেই না। 'জিতং জগৎ কেন?—মনো হি যেন।' ভারত স্বাধীন হবে কি অ-জিতেন্দ্রিয়ের দ্বারা!···কিন্তু বুঝেছি, এ জীবন আমায় এমনি একলাই কাটাতে হবে, ব্যথার ব্যথী পথের দোসর বোধ হয় কোথাও মিলবে না। না-ই মিলুক, জীবন তো দুদিনের। এত কাঙাল-পনা কেনই বা আর।"

হোটেলের গেট খুলে দিয়ে টর্চের আলো দেখিয়ে সুপ্রিয়াকে বললে, "ভেতরে যাও।"

"তুমি?"

"আমি? একটু পরে আসছি। রেণু অনেকক্ষণ একলা রয়েছে, আর দেরী কোরো না।"

"কোথায় যাবে তুমি? মন খারাপ করেছ! একলা ছাড়ব না তোমায়—আমি সঙ্গে যাবো।"

সুপ্রিয়ার ঘন নিশ্বাস অনুপমের হাতের উপর। মুহূর্তের মধ্যে কী যে হ'ল, সমস্ত ভুলে গিয়ে প্রচণ্ড আবেগে অনুপম ওকে বুকের একান্ত সন্নিকটে টেনে নিল। সুপ্রিয়ার সারা দেহ বিস্ময়াতিশয্যে বারেক কেঁপে উঠে পরক্ষণে অবসাদে এলিয়ে পড়ল। মুগ্ধ অনভিজ্ঞ পুরুষচিত্ত

তাকেই প্রিয়া রমণীর অনুকূল আত্মসমর্পণ ভেবে উদ্বেল আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠল। বারবার সেই নির্জীব পুতুলের মতো ভাব-লেশহীন নারীর কেশে, ললাটে, কপোলে চুম্বনের পর চুম্বন ক'রে দু'হাতে একখানা হাত চেপে ধ'রে অনুপম ওকে বাগানের একান্তে ঘাসের উপর টেনে বসালো। আনত মুখখানি সযত্নে তুলে ধ'রে অধরে অধর স্পর্শ ক'রে ছেড়ে দিতে আশ্রয়হীনা লতার মতো সুপ্রিয়ার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। স্বপ্ন ভেঙে অনুপম চমকে উঠে দাঁড়াল, "সুপ্রিয়া!"

সুপ্রিয়া নীরব, নিস্পন্দ।

একবার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠল, তারপরের কয়েক মুহূর্ত অপমানের অন্ধকারে লুপ্ত হ'য়ে গেল—অনুপম যেন ভূতগ্রস্ত, এমনি আচ্ছন্নের মতো চেয়ে আছে!

তারপর ধীরে ধীরে চিন্তার শক্তি ফিরে এলো, ফিরে এলো চিত্তদাহ তীব্রতর হ'য়ে। যে পুরুষের স্পর্শে কোনো নারী ভয়ে ক্ষণেকের জন্যেও সংজ্ঞা হারাতে পারে, তার প্রতি ওর দৈহিক বিতৃষ্ণা যে কত অকপট, এই চেতনা সুতীব্র বেদনার আঘাতে অনুপমের প্রতি রোমে রোমে সঞ্চালিত হ'য়ে গেছে।

নিজেকে সাম্‌লাতে যে এত কষ্ট, মানুষের দেহমন যে এক নিমেষে এমন পাথরের মতো কঠিন নিষ্করুণ হ'য়ে যেতে পারে, প্রত্যক্ষ অনুভব না করলে বিশ্বাস করা সম্ভব হ'ত না।

সুপ্রিয়া যে কখন্ উঠে ঘরে চ'লে গেল, কতক্ষণ সে নিজে অন্ধকারে হ্রদের ধারে নিশাচরের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াল!...

আরো সপ্তাহখানেক কী ক'রে কাট্‌ল কে জানে।

রেণু সেরে উঠেছে। ওকে বিকৃত বিকলাঙ্গ দেখার দুঃখও ওর বন্ধুদের চোখে খানিকটা স'য়ে এসেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রফুল্ল পড়তে পড়তে হঠাৎ কী ভেবে হাতের বই মুড়ে রেখে রেণুর চোখের পানে তাকিয়ে আলোটা আড়াল ক'রে দিল। ঈষৎ হেসে চোখে হাত দিয়ে রেণু বললে, "কি ?"

"হঠাৎ আবিষ্কার করলাম মুক্তো ছড়ানো হচ্ছে বেণাবনে। শুনছ না কিছুই, মিছে শোনার ভান ক'রে চুপচাপ প'ড়ে আছ।"

"বেণাবনে মুক্তো—তা বটে! একখানা কান যার থেকেও নেই—"

"রেণু!"

স্তব্ধ ঘরে প্রফুল্লর সে ডাক ঠিক কান্নার মতো শোনাল। অনুতপ্তা রেণু ডান হাতখানি প্রসারিত ক'রে ওর হাত খুঁজে ফিরতে থাকে। মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে, প্রফুল্ল উঠে এসে এলায়িত শীর্ণ সে হাতের উপর মুখ গুঁজে রইল প'ড়ে। রেণুর চোখ দুটি আপনি নিমীলিত হ'য়ে যায়। এত আবেগের আঘাতে ওর দুর্বল বুকের ক্ষীণ নিশ্বাস-চলাচলটুকু বুঝি বা রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। ভাবে, অসময়ের এই দান নিয়ে সে করবে কি, রাখবে কোথায় একে ? এ কার পরিহাস ওর সঙ্গে, কী দোষ করেছে এই নিরপরাধ যুবক ?

বলবার কিছু নেই, কেবল দু'জনের অনুভূতির তীব্রতায় নির্জন ঘরখানি বিষণ্ণ ভারাতুর হ'য়ে ওঠে।

ওষুধ আর পথ্য নিয়ে একসঙ্গে নির্মল আর অনুপম ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দাঁড়ায়। রেণুই প্রথমে দেখতে পেয়ে শান্তস্বরে ডেকে বললে, "এসো"। তারপর কম্পিত হাতে প্রফুল্লর আরক্ত মুখখানি জোর ক'রে তুলে ধ'রে ললাটে অধর স্পর্শ ক'রে নীরবে চোখের দিকে চেয়ে রইল।

প্রফুল্লর হৃদয় ওর সমধর্মী হৃদয়ের সে মৌন ভাষা মুহূর্তে বুঝে নিল। ঘরে আর যারা উপস্থিত আছে, তাদের কান ও দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে প্রগাঢ় স্নেহে সে বললে, "ভয় নেই, ভুলব না এর মর্যাদা"।

হ্রদের দিকের বারান্দায় বেরিয়ে এসে বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ দুটি সন্তর্পণে মুছে ফেলে অনুপম একলা দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের ভিতর নির্মলের প্রসন্ন হাসিমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে রেণু জিজ্ঞাসা করলে, "আজ কোন তিথি নির্মল? পূর্ণিমা?"

"না দিদি, আকাশে ওটি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। আজ বোধ হয় দ্বিতীয়া।"

"একটা গান করবে ভাই?"

"করছি। অনুদা, ঘরে আসুন। আলোটা নিভিয়ে দিই দিদি?"

"দিয়ো। কিন্তু সুপ্রিয়া কই?"

একটু ইতস্তত ক'রে নির্মল নিজেই নীচে নেমে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরে এসে বললে, "নেই। বয়কে ব'লে এলাম খবর দিতে। কী গান হবে?"

"যা তোমার ভালো লাগে।"

মৃদু, অতি মৃদুকণ্ঠে নির্মল গান আরম্ভ করলে। গাইতে গাইতে ওর সকল অস্তিত্ব যেন গানের ভিতর দিয়ে কোথায় ডুবে গেল। এমন ক'রে নির্মল জীবনে গায়নি। বাইরে মুক্ত জ্যোৎস্নায় ট্রসাক্‌সের বন্য প্রকৃতি, ঘরের ভিতর শ্রোতা তিনজন চুপ ক'রে শুনতে লাগল। চৌকাঠের বাইরে ছোট পরদা-ঘেরা জায়গাটুকুতে একা দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়া। কান পেতে শুনছে—

"প্রিয়তম হে……
লহ জীবন তব পানে!"

কার পানে? কে সেই প্রিয়তম? যে গাইছে সেও জানে কি কা'কে ডাকছে অমন ক'রে? কোথায় যেতে হবে তার উদ্দেশে—কোন্ সাগর বন তটিনী পার হ'য়ে সে অভিযান? ওগো কে বলবে সুপ্রিয়াকে, কে বলবে?

কেঁদে কেঁদে কেঁপে কেঁপে থেমে গেল গায়কের কণ্ঠ। সুরের রেশ

তবু থামে না। সুপ্রিয়ার বুকে সুপ্রিয়ার মনে এই গান এই সুর আপনার বিরুদ্ধে যেন শত বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। এই জড়তা—এ ভীরুতা, অন্তর যা চায় না প্রহরে প্রহরে তাকেই মেনে চলা! গিরি-তটিনীর মতো যে অনন্ত-অভিসার সৃষ্টির আদিতে লেখা হ'য়ে গেছে ওর স্বভাবে, তার উদার উন্মুক্ত প্রবাহ বালির বাঁধ দিয়ে জোর ক'রে ঠেকাতে গিয়ে সংযমের শক্তি যে ওর দিনে দিনে ধ্বসে পড়ল! এখন হয় চলতে দিতে হবে স্রোতকে তার নিজের পথে নিজেরই বেগে, নয় তো সুপ্রিয়া বাঁচে না—বাঁচবে না!··

ঘরের ভিতর মৃদু কণ্ঠের আলাপ শোনা গেল।

"প্রফুল্ল, আরো কাছে এসো। নির্মল একটা কথা জিজ্ঞেস করব, উত্তর দেবে বলো?"

সুপ্রিয়া উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে। কোনো জবাব নেই। হয়ত শোনা যাচ্ছে না ভেবে সরে এলো। আলো-আঁধারে রেণুর বিছানার কাছাকাছি তিনজনেই স্তব্ধ বসে। নির্মল কী এত ভাবছে? উত্তর দেয় না কেন? অমন মুখ নীচু ক'রে করছে কী?···সুপ্রিয়ার ব্যগ্রতাই যেন ওকে নিজের অজ্ঞাতেও জোর ক'রে ঠেলে দিল। হঠাৎ মুখ তুলে দৃঢ়স্বরে বললে, "আপনি কী জানতে চান বুঝেছি। কিন্তু দিদি, ও নিয়ে তর্ক করতে পারব না আমি।"

"তর্ক? না না, এ সে রেণু নয় যে স্টীমারে তোমায়—"

প্রফুল্ল ওর মাথায় হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধস্বরে বললে, "আস্তে রেণু, আস্তে।"

একটুখানি সাম্‌লে নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে রেণু আবার বললে, "না, এ সে রেণু নয়।···শুনেছি বিনা সাধনায় তাঁর অস্তিত্বও নাকি অনুভব করা যায় না, সে অনুভূতিও লাখে দুচারজনের। আমি কোন্ সাধনা করলাম তা তো জানি নে, তবু আজকাল কেন"—স্তব্ধ হ'য়ে

থেমে গেল, "না, এসব কথা কাউকে বলবার নয়। হয়ত এ কৃপা, যা সাধনার অপেক্ষা রাখে না। প্রফুল্ল, কত কী বলবে তোমরা, তা বলো। একটা ইন্দ্রিয় গেলে ভিতরে আর একটা জেগে ওঠে, ক্ষতিপূরণ করে, জানো? যিনি ধরা ছোঁয়ার অতীত তাঁকে অনুভব করতে হ'লে দেহাতীত কোনো একটা ইন্দ্রিয়ই বোধ হয় চাই, না?" একসঙ্গে এতগুলো কথা ব'লে রেণু হাঁপাতে লাগল।

প্রফুল্ল বললে, "অতীন্দ্রিয় বা অমনি কী সব যেন বলে। কিন্তু সত্যি, এবিষয়ে কথা বলতে আমার বাধে। কিছুই যে জানিনে। থাক্ না রেণু আজ। এ আলোচনা আর একদিন হবে তুমি সেরে উঠলে, বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়।"

রেণু চুপ ক'রে শ্বাস টানতে থাকে।

একটুখানি চাঁদের আলো জানালা গ'লে এসে পড়েছে ওর বিছানায়, আর নির্মলের মুখে। সে স্নিগ্ধ আলোতে ওই সুকুমার আনত মুখখানির দিকে বারেক তাকিয়ে সুপ্রিয়া নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘুমে রেণুর চোখ বুজে আসছে। চাঁদের আলো আরো আরো সরে এসে শীর্ণ, শিশুর মতো শান্ত ললাটের, রুক্ষ বিস্রস্ত কেশের মোহন লাবণ্য দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে প্রফুল্লর ভবিষ্যতের কল্পনা শত স্রোতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। এই ক্ষীণপ্রাণ বল্লরীমূলে শক্ত সতেজ পুরুষের প্রাণের রস সিঞ্চন ক'রে তার ঊর্ধ্বমুখী হবার প্রয়াসকে নিরন্তর জাগিয়ে রাখা—এখন থেকে এই ওর কাজ। ভাবতে ভাবতে বিগলিত স্নেহে মনের ভিতুর যেন মধুস্রোত ব'য়ে যায়।

ঠিক সে মুহূর্তে তন্দ্রা ভেঙে রেণু চেয়ে দেখে, "কি?"

"কিছু না, ঘুমোও।"

রেণু হাসলে, "কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।" ফিরে দেখে বললে,

"অনু, তোমরা এখনও ব'সে আছ ভাই ?···জানো প্রফুল্ল, এই ভীষণ অসুখের সময়ই—"

"বেশি কথা বলা যে ডাক্তারের নিষেধ রেণু !"

"আচ্ছা থাক্।" একটু পরে আবার বললে, "তোমরা যাও এখন। খাবার নিয়ে ব'সে আছে না ওরা ? আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে।"

অনুপম কাছে উঠে এলো, বললে, "দুধটা তাহ'লে এখনই নিয়ে আসি, কেমন ? একেবারে খেয়েই ঘুমিয়ো।"

"না, এখন নয়। রোজ যেমন দাও তেমনি দিও, মাঝ-রাত্তিরে ক্ষিদে পায় যে।" ব'লে পাশ ফিরে চোখ বুজল।

অনুপম বললে, "নির্মল, তোমরা যাও, আমি রইলাম এখানে।"

ওরা চ'লে গেলে রেণু পূর্ণ দৃষ্টি মেলে অনুপমকে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখতে লাগল।

অনুপম জিজ্ঞাসা করলে, "কী দেখছ রেণু ?"

"একটা কথার উত্তর দাও। দেবে ?"

"কী কথা ?"

"আমি কখনো তোমার সঙ্গে অসরল ব্যবহার করেছি ?"

অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে অনুপম বললে, "কখনোই না। কেন—"

"তোমার চেয়ে আপন আমার আর কেউ আছে ? অনু, আমি কি তোমার শত্রু ?"

"না, কিন্তু—"

"তবে আমার এই শাস্তি কেন ? বলো, বলো অনু ! চুপ ক'রে রইলে কেন ?"

"উত্তেজিত হয়ো না রেণু, শোনো !"

"আমায় তুমি ভোলাবে কি দিয়ে ? তোমার মনে সুখ নেই, হাসিতে নেই আনন্দ, লোকের সঙ্গ তোমার সহ্য হয় না, তোমার সমস্ত অন্তর

নিভৃত দরদী খুঁজে বেড়াচ্ছে, তবু কেন আমার চোখে নিজেকে লুকোতে চাও ?”

অনুপমের ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠল, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “সত্যিই আমার মনে সুখ নেই, লোকের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে বেড়াই নিজেকে। কিন্তু আমার নিষেধ শোনো, এ আলোচনা থাক্।”

“শুনব না নিষেধ, আমায় সব বলতেই হবে।”

“না।”

“কেন ?”

“কেন ?” মুহূর্তের মধ্যে কী যে হ'য়ে গেল, আত্মবিস্মৃত অনুপম তীব্র স্বরে বললে, “কারণ, আমার এই অশান্তির জন্যে দায়ী তুমিই !”

“আমি !” বিস্ফারিত চোখে রেণু উঠে বসল।

“হাঁ, তুমিই। নির্মলকে কে টেনে এনেছে সুপ্রিয়া আর আমার মাঝখানে ? তুমি মধ্যবর্তী না থাকলে ওরা এত ঘনিষ্ঠতা করতে পারত না স্টীমারে।”

থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল রেণু, কষ্টে বললে, “অনু—ভাই !”

“আজ আর দুঃখ ক'রে কী হবে ? আমার সব গেছে ! এখন মনুষ্যত্বটুকুও বুঝি যায় !”

“না—না !”

“ভেবেছিলাম থাকব দু'ভাইবোন। কিন্তু তুমিও রইলে না ! প্রফুল্ল সার্থক, সার্থক নির্মল। এখন আমার হতভাগ্য নিয়ে আর কেন—ওকি, রেণু—রেণু !”

অশক্ত দুর্বল রেণু কখন উঠে দাঁড়িয়েছে—অনুপম ছুটে যাবার আগেই, ওর অবশ বিকল অঙ্গ মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করলে !

নিমেষের জন্যে বুঝি অনুপম চোখ বুজেছিল, অন্তত ওর তাই বিশ্বাস। যখন চোখ খুলল, সামনে সুপ্রিয়া আর নির্মল স্তম্ভিতের

মতো দাঁড়িয়ে। একটু দূরে, রেণুর লুণ্ঠিত দেহ কোলে নিয়ে, প্রফুল্ল নির্বাক শোকে যেন পাষাণ হ'য়ে গেছে।

ধীরে ধীরে অনুপম এগিয়ে এলো—ম্লান জ্যোৎস্নার লতা···রেণু··· জ্যোৎস্নারই মতো হৃদয়ের অপরিসীম সৌন্দর্য—মুখে। তবু···একি নিদ্রা রেণু, একি নিদ্রা!

তারপর—

যথাসময়ে ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হ'ল।

হার্ট-ফেইলিওর ···অনুপমের অন্তরতম আদর্শের মূর্তিমতী ভাষা চির-রাত্রির শান্তিতে বিভোর।

* * *

মোমবাতির মৃদু আলোয় ঘরের কোণে অভুক্ত অস্নাত প্রফুল্ল একই-ভাবে ঠায় ব'সে আছে।

নির্মল কাছে স'রে এলো। আর একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখল, "প্রফুল্ল!"

প্রফুল্ল নড়ল না।

"সবই বুঝি ভাই, ভেবে দেখ—তবু—"

"নির্মল, শুধু দণ্ড-দুই রেহাই দাও আমায়!"

বিষণ্ণভাবে নির্মল উঠে গেল! কে কা'কে সান্ত্বনা দেয়! বৃথা চেষ্টা।

হঠাৎ মনে হ'ল সুপ্রিয়া করছে কী? কাল রাতে ডাকাডাকি চেঁচামেচিতে জেগে উঠে সেই যে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ক্ষণেক সকলের মুখ, পরে শয্যার দিকে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে অস্ফুটে একবার "উঃ" ক'রে নিজের ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকেছে, তারপর সারাদিন আর সাড়াশব্দ নেই। সদ্য ঘুম ভেঙে উঠে চোখের সামনে ওই দৃশ্য!

নির্মলের মনটা কেমন ক'রে উঠল। সমস্তদিন নানা গোলমালে

আর ভাবনা-চিন্তায় সুপ্রিয়ার কথা কারো তেমন মনেই পড়েনি। উদ্বিগ্ন নির্মল আর থাকতে পারলে না, অনুপমকে বললে, "ওঘরে গিয়ে দেখে আসুন না একবার।"

"সুপ্রিয়াকে? কেন, কী হয়েছে?"

"হয়নি কিছুই। অনেকক্ষণ একলা রয়েছেন, তাই।"

অনুপম উঠে গেল। মিনিট দুইতিন পরে ফিরে এসে বললে, "পারো যদি, ওকে কিছু খাইয়ে দাও। আমি বলি কী ক'রে? ওর মুখের দিকে যে তাকানো যায় না!"

সসঙ্কোচে সুপ্রিয়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নির্মল ভাবতে লাগল—না ব'লে কি ক'রে ভেতরে ঢোকা যায়! আস্তে আস্তে দরজা নাড়লে। কোনো উত্তর নেই। হয়ত শুয়ে আছে, না কি—ভেবে ফিরবার উপক্রম করছে, অনুপম বারান্দায় মুখ বাড়িয়ে দেখে ইঙ্গিতে বললে, "ভেতরে যাও।"

দুয়ার ভেজানো রয়েছে। ভিতরে এলো নির্মল। কম্পিতপদে কিছু দূর এসে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়াল। সামনে ও কে! এ কী মূর্তি সুপ্রিয়ার! তাই অনুপম সহ্য করতে পারেনি!

ভেবে-চিন্তে কিছু স্থির করবার পূর্বেই হঠাৎ একটা দুঃসহ আবেগ ঠেলে ওকে সেই পাষাণপ্রতিমার কাছে এনে ফেললে। সুপ্রিয়া তবু মুখ তুলল না, চেয়েও দেখল না।

নির্মলের মন থেকে এক নিমেষে ওর অতীত ওর বর্তমান সমস্ত লেপে মুছে একাকার হ'য়ে গেল, রইল কেবল একটা শ্রীহীন সম্ভাবনার অত্যুগ্র ভীতি—সুপ্রিয়া পাগল হ'য়ে যায়নি তো? কম্পিত অবাধ্য হাত জোর ক'রে উঠিয়ে মুখখানা ওর আলোর দিকে টেনে তুলে ধরলে, অস্ফুটে ডাকলে, "সুপ্রিয়া, চাও—চাও এদিকে!"

অস্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে সুপ্রিয়া উত্তর করলে, "কি ?"

"অমন করছ কেন ?"

কেমন একটু হেসে বার দুই মাথা দুলিয়ে সুপ্রিয়া বললে, "ডাকছি, ডাকতে চেষ্টা করছি, দিদি যে ব'লে গেল তিনি আছেন !"

"আছেনই তো ! কে বললে তিনি নেই ? কিন্তু অমন ক'রে কি ডাকে ? উঠে এসো, বাইরে। চলো হ্রদের ধারে গিয়ে তাঁকে ডাকি আমরা—একসঙ্গে। এসো !"

"না !"

নির্মল অনুনয়ের সুরে বললে, "এসো, লক্ষ্মীটি !"

"না, না, না ! কতবার বলব তোমাদের ! দেখছ না কোথায় ডুবে গেছি আমি ? উঠতে পারব কেন—পারব কেন ?" মাথাটা আবার নু'য়ে পড়ল বুকের উপর।

নিমেষের জন্যে অন্তরের দিকে তাকিয়ে নির্মল মনে মনে বললে, "কখনো এক মুহূর্তও যদি তোমায় সত্যিই বিশ্বাস ক'রে থাকি, তবে এবিপদে আজ বুদ্ধি দাও প্রভু, বল দাও !"

পরে ধীরে ধীরে উঠে সুপ্রিয়ার হিমে অবশ আড়ষ্ট পাদুখানি সোফায় তুলে গরম কম্বলে ঢেকে, বিছানা থেকে বালিস এনে পিঠের নীচে গুঁজে দিয়ে জোর ক'রে শুইয়ে দিলে ওকে। তারপর আলো নিভিয়ে পাশে ব'সে ওর ঠাণ্ডা হাত দু'খানি একত্র ক'রে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে, অপর হাত ধীরে মাথায় বুলিয়ে একান্ত কোমল মৃদুস্বরে বললে, "ঘুমোও !"

কলের পুতুলের মতো সুপ্রিয়া চোখ বুজল। গভীর শোক ও অবসাদের মূর্ছাতুল্য সে নিদ্রার প্রহরী হ'য়ে প্রিয়তমার পাশে সারা রাত জেগে কাটিয়ে দিল নির্মল।

ভোর না হ'তে ডাক্তার এসে পড়লেন। মিনিট কয়েক সুপ্রিয়াকে নীরবে চেয়ে দেখে বললেন, "ঘুমই ওর একমাত্র ওষুধ। ভয়ানক শক্ পেয়েছে। বোধ হয় আগে থেকেই নার্ভগুলো ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। তাই আরো সহজে কাবু হ'ল। খুব প্রিয় বন্ধু ছিলেন, না?"

নির্মল ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"এই ক্ষেত্রে যেন আর কোনো ভুল না হয়। মিস রায় যে—"

"ডাক্তার!" নির্মল আর বলতে পারল না।

অনুপমের ভাবলেশহীন অটল মুখের দিকে বারেক তাকিয়ে ডাক্তার বললেন, "যাক গতস্য শোচনা, এখন একেই দেখ। লণ্ডনে ফিরবার ত্বরা নেই তো? তাহ'লে ভালো, একটু শক্ত হ'য়ে নিক।"

যাবার আগে আর একবার বেশ ক'রে দেখে বললেন, "শান্তভাবেই ঘুমোচ্ছে। ভালো লক্ষণ। পাগল হবে কেন? ওসব কিছু নয়। অমনি থাকতে দাও যতক্ষণ ঘুম আপনি না ভাঙে।"

অনুপম বললে, "দুশ্চিন্তা ক'রে খুব, হয়ত তাই—"

"একটা কোনো কারণ ছিলই আগে থেকে, নইলে এতদূর হবে কেন? কিন্তু ভয় নেই, শান্ত থাকতে দাও, ঠিক হ'য়ে যাবে দু'দিনে।"

প্রফুল্ল লুকিয়ে বসেছিল। বুঝেও ডাক্তার ছাড়লেন না। খুঁজে বের ক'রে পিঠে হাত রেখে সহানুভূতির স্বরে বললেন, "ওঁর জন্যে ভয় ছিল বরাবরই, সে তো তুমি জানো। নিমোনিয়া সারলে কি হয়, হৃদযন্ত্র ফুস্‌ফুস্—কোনোটাই মজবুত ছিল না। যাক্, ভারতবাসী তুমি,

সান্ত্বনা পাবে নিজেদের ধর্মে সংস্কারে, নিজের মনের ভিতরেই। কেন বলছি জানো? থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে যাই মাঝে মাঝে, দর্শন ইতিহাস বুঝিনে বিশেষ কিছুই, সে লাইনই আমার নয়। তবু বলতে হবে, সান্ত্বনা পেয়েছে ব'লে জানি অনেককে—অনেক সময়। শোক দুঃখ জীবনে নেই কার বলো? এই সে দিন গ্লাসগোতে—" স্বল্পভাষী ডাক্তার হঠাৎ এত কথা ব'লে ফেলে অপ্রতিভ হ'য়ে থেমে গেলেন। টুপিটা তুলে নিয়ে হাতে একটু চাপ দিয়ে বললেন, "বয়সে বড়, সেই অধিকারে এতখানি বাচালতা ক'রে ফেললাম। গ্লাসগোয় ফিরলে আমার ওখানে এসো মাঝে মাঝে. ভারি খুসি হব। বোস্, মেয়েটি কেমন থাকে, খবর পাই যেন।" অনুপমকে দেখিয়ে—"আর—ভালো কথা, নজর রেখো তোমাদের এ বন্ধুটির ওপরেও একটু আধটু। এমন স্তব্ধ শোক! কেন? এর চেয়ে মেয়েলি কান্নাকাটিও যে ভালো!" অল্প একটু হেসে বললেন, "ওতে সব সাফ হ'য়ে যায়। মেঘের পরে বৃষ্টির মতো।···আচ্ছা, গুডবাই, সাবধানে থেকো।"

ডাক্তার চ'লে যাবার অনেকক্ষণ পরেও কথাগুলো অনুপমের কানে বাজে। ভাবে মনে মনে, কান্নাকাটি বরং ভালো? হায়, মানুষ কতটুকু সন্ধান রাখে মানুষের মনের সব অলি-গলির? সব কথা কা'কেই বা বলবে সে? অথচ অনুপমের জানাশোনা অপরাধ নয়। চিরকালের আশা আনন্দ অভীপ্সায় জড়ানো রেণু—সে নেই, সে রইল না! মনে হ'ল অনুপমের হৃৎপিণ্ডটাই মুঠোয় ক'রে ছিঁড়ে নিলে কে। জীবনের ভিত্ টল্‌মল্ ক'রে উঠল, বুঝতে পারল না এ কী ব্যাপার। ওর নিষ্ঠাপ্রিয় মনে, চিরদিনের সহজ সরল পথে সহসা এ কোন্ জটিলতার জন্ম? ভালো ক'রে বোঝবার বা ভেবে দেখবার আগেই

যেন ফুৎকারে রেণুর জীবনদীপ গেল নিভে ! মিটে গেল সব। কিন্তু অনুপমকে চিরতরে রিক্ত ক'রেই মিটল। এখন ওর আশা নেই, আনন্দ নেই—নেই উৎসাহ, এবং সবচেয়ে যা ভয়ানক—আদর্শও বুঝি নেই আর! অন্তরের অনুভূতিতে যার এতই কুটিলতা, সে দাঁড়াবে আজ কোন্ আদর্শের দুর্গ-প্রাকারে? পাবে কোথায় মনের সে-জোর যে জোরে আপন পরিবেশকে অতিক্রম ক'রে বড় হ'তে মহৎ হ'তে চায় মানুষ? নিজেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে রেণু ওর আশৈশব সাথীর আজীবনের নিষ্ঠা সংস্কার বুদ্ধিবিবেক সকলই দু'হাতে এলোমেলো ক'রে পথের ধূলায় ছড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ এ কী পরিহাস ক'রে গেল? এখন এই চরম 'নাস্তি'র শ্মশানে শবাসনে ব'সে কোন্ শিবের সাধনা করবে অনুপম? প্রলয়ের এ ভাঙনের মাঝে আঁকড়ে ধ'রে থাকবে কোন্ উপাস্যকে?…

ভাবতে ভাবতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো অনুপম হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রমে বেলা যায় বেড়ে। হোটেলের লোকজন রাস্তা-ঘাটে পাহাড়ে দু'তিনবার খুঁজে হায়রাণ হ'য়ে ফিরে এসেছে। অনুপম এলো না, কোথাও ওকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নির্মলের উদ্বেগের সীমা নেই, প্রফুল্ল ভীতমুখে বারবার খবর নিচ্ছে। ডাক্তারের সতর্কবাণী পড়ে মনে। ওঘরে সুপ্রিয়া অবসন্ন শোকাহত, এ ব্যাপারের কিছুই জানে না এখনো। আর জানতে চাইলেই বা কী উপায় হবে? রেণু নেই, এখন অনুপমও অন্তর্হিত! এমন অবস্থায় নির্মল জীবনে পড়েনি। যে-কোনো মিনিটে হয়ত সুপ্রিয়া জাগবে, তখন কে যাবে ওর সামনে?

"প্রফুল্ল, ভেবে ভেবে আর তো পারিনে!"

"ভেবো না! অনুপমের দায়িত্বজ্ঞান আছে, নিশ্চয় ফিরে আসবে।"

"কিন্তু ইতিমধ্যে সুপ্রিয়া যদি শোনে!"

"শোনাবে কে? কিছুই বোলো না। ঝি চাকরদেরও বারণ ক'রে দিচ্ছি।"

"তা না হয় হ'ল। কিন্তু অনু'দার সম্বন্ধেও ডাক্তার কী বলেছেন মনে আছে?"

"অত ভাবো কেন নির্মল? বিশেষত যেখানে ভেবে কোনো ফল নেই! মানুষ মিছেই ছটফট ক'রে মরে ভাই। কিছুই তার নিজের হাতে নয়—ভালোও না, মন্দও না। কোন্ অদৃশ্য শক্তির হাতের পুতুলটি মাত্র, যেমন চালায় তেমনি চলে। নিজের বলতে আছে কী?"

"না প্রফুল্ল, স্বেচ্ছাধীনতা ব'লেও কথা আছে একটা।"

"কে বললে তোমায়? ভগবান? বড্ড যাঁকে মানো?" ব'লে মলিনমুখে প্রফুল্ল হঠাৎ উঠে গেল।

সন্দিগ্ধচিত্তে নির্মল ভাবতে বসে। কি জানি, হয়ত আমি দুর্বল—তাই নিজের চেয়ে বড় কাউকে, চিন্তার অতীত কোনো সমগ্র সত্যকে না মেনে পারি না। বাঁচার মতো বাঁচতে হ'লে চাইই আমার এ বিশ্বাস। চির-অতৃপ্ত আমি, আমার কল্পনায়—ধ্যানে আমার চির-সুন্দরকে যে চাইই!··তবু চারদিকের ঘাত-প্রতিঘাতে দৃষ্টি কেন অন্ধ হ'য়ে আসে, কেন অস্বীকার করি তোমায় মুহূর্তের জন্যেও? বিদ্রোহই বা কেন?

ভাবনার শেষ নেই বিরাম নেই, নিজের মনের গঠন নির্মলের নিজের কাছেই এক প্রহেলিকা। কখনো বিশ্বাস কখনো সন্দেহ, আত্মগ্লানি আর আত্মমাহাত্ম্য—একই নদীতে ক্ষণে ক্ষণে কত স্রোত, কত বুদ্বুদ!

চোখ দু'টি কখন্ ঘুমে মুদে আসে।

ঘুম, না স্বপ্ন! এ কোথায় চলেছে নির্মল? কোন্ আলোর দেশে? কী অপার শান্তি! হাত পা ক্রমেই যেন পালকের মতো লঘু হ'য়ে এলো, যেন নিজের নয়……

ঘুম যখন ভাঙল, হঠাৎ বুঝতে পারল না কোথায় আছে। একটু একটু ক'রে মনে পড়ল। ঘর অন্ধকার, নিশ্চয় খুব রাত হয়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, হোটেলের সবাই বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে! এতক্ষণ জেগে থাকবে কে!

আস্তে আস্তে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, হলের আলোও নিভে গেছে—নির্মল তো অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে তাহ'লে! হবে না? এতদিনের একটানা রাতজাগা আর পরিশ্রম! আজ কিন্তু সমস্ত দেহে মনে এ কী শান্তি! অদ্ভুত স্থিরতা—এতটুকু অবসাদ নেই, নেই মনে গ্লানি। জানলা খুলে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল নির্মল। চাঁদ ওঠেনি এখনো, দূর দিগন্তে কেবল একটি নক্ষত্র—ওকি সীমাহীন আঁধারের বুক চিরে ওপারের অনুদিত জ্যোতির বাণীই আনছে বহন ক'রে? অন্তর-বাহিরের অটল প্রশান্তির মাঝে নির্মলের হৃদয় যেন সহসা বাঙ্ময় হ'য়ে উঠল, কে যেন ডেকে বললে, "ভয় নেই ওরে ভয় নেই। আড়ালেই থমকে রয়েছে আলোর সাগর। বিশ্বাসে ভর ক'রে সঁপে দে তার কাছে নিজেকে। তবে মিলবে তার দেখা—মিলবেই।"

চোখ দু'টি জলে ভ'রে উঠল। ওই নক্ষত্র, ওযে আলোর অগ্রদূত! ঐ আঁধার গগন-অঙ্গন বুঝি নির্মলের মনের আকাশেরই প্রতীক, আর ওই তারা অদৃষ্টের করুণার আলো? আর কেন দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব? সকল সংশয় এবার যাক্ না মুছে! অসীমের বাণী অসীম থেকেই ভেসে এসে ওর বুকে বেঁধেছে প্রত্যয়ের নীড়। এখন—

"জীবন সঁপিয়া, জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয় !"

হে বন্ধু, হে সখা, নাও তবে কোথা নিয়ে যাবে, আঁধার পথে জীবন-রথের রাশ নিজের হাতে নাও তুলে !

তন্ময় একাগ্র হ'য়ে ভাবছে নির্মল। কানে এসে বাজল দোরগোড়ায় প্রফুল্লর কণ্ঠ, "না, এখনো জাগেনি দেখছি।"

ত্রস্ত হ'য়ে নির্মল সাড়া দিল, "জেগেই আছি, কেন—কী চাই ?"

"বাঃ বেশ লোক", প্রফুল্ল আলো জ্বালিয়ে দিয়ে এলো ঘরে, "কী কাণ্ড বলো তো !"

"কী হয়েছে ?"

"স্বপ্ন দেখছ নাকি ? রাত কত সে খেয়াল আছে ? খেতে হবে না ?"

"চলো, যাচ্ছি। সুপ্রিয়া জেগেছে ?"

"অনেকক্ষণ। কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছিলে, তাই আর ডাকিনি। ন'টা বেজে গেছে জানো ?"

"মোটে। আমি ভাবলাম বুঝি বা দুপুর রাত।"

বাস্তবের সংস্পর্শে এসে আবার সেই চিন্তা ! অনুপম এখনো ফিরল না। এই হোটেলে একটি অনাত্মীয়া তরুণী মেয়ের সঙ্গী—একা সে আর প্রফুল্ল !

অনুপম যদি আর একেবারেই না আসে ? যদি—যদি সুপ্রিয়া—

শিউরে উঠল নির্মল। প্রলোভন ? ঠিক যে মুহূর্তে ইঙ্গিত এলো বাঁধন কাটবার ?

না, সে অসম্ভব। ফিরে আসুক অনুপম। তারপর, যার ধন তার হাতে গছিয়ে দিয়ে নির্মল নেবে বিদায়। হাঁ বিদায় বই কি, চির-বিদায় ! গিরি-নির্ঝর হ'তে যে নদীর জন্ম, সাগর-মিলনে তার জীবন-প্রশ্নের সমাধান !

"ওকি, দাঁড়িয়ে রইলে যে? সুপ্রিয়াকে দেখে আসবে না একবার?"

"তুমিও এসো প্রফুল্ল!"

"নির্মল, কিছুই কি বোঝ না তুমি? আমি কি পাষাণ, না দেবতা? না, তুমি একাই যাও!"

সুপ্রিয়া শোকার্ত। প্রফুল্ল এসেছে সহ্যের সীমান্তে। কিন্তু হায়, নির্মলই কি দেবতা?

বিছানায় উঠে ব'সে আছে সুপ্রিয়া—যেন ঝড়ের অবসানে শান্ত দিগন্ত। কিন্তু মৃদু আলোতেও মুখখানা কী শীর্ণ দেখায়! ক্ষীণস্বরে বললে, "আপনি? আমি ভাবলাম বুঝি অনুদা। উনি এলেন না কেন একবারও?"

"আসবেন পরে", নির্মল সাবধানে সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছেন এখন?"

সুপ্রিয়া বিস্মিতভাবে বললে, "ভালোই তো। কী হয়েছে আমার?"

নির্মল ভাবলে, পূর্বরাত্রির কথা কিছুই কি মনে নেই ওর?

"খাওয়া হয়েছে? এক গ্লাস জল রেখে যাবো হাতের কাছে?... কিছুই চাইনে?"

সুপ্রিয়া বললে, "না, কিছুই দরকার নেই। এতক্ষণ শুয়েই পড়তাম, অনুদা আসবেন ভেবে ব'সে আছি।"

"উনি—বোধ হয় আজ রাত্তিরে আর—"

"ঘুমিয়ে পড়েছেন? থাক্ তাহ'লে।"

"এই পাশের ঘরেই রইলাম আমরা, যদি দরকার হয়—"

"আচ্ছা।"

সুপ্রিয়ার স্বাভাবিক অবস্থায় নির্মল ওর কতই পর! ধীরে সতর্ক

নিশ্বাস ফেলে ভাবলে—যাক্ গ্রন্থিমোচন হ'ল, আর আমার ভাবনা করার কথা নয়।

কিন্তু—ভাবনা ফুরোবার লক্ষণ কি এই ? ফল তার এমন অবসন্ন শূন্য প্রাণ ? যেন সংসারে বা আপন মনে কোথাও কেউ নেই, কিছুই রইল না করবার ! এতখানি শূন্যতা নিয়ে মানুষ বাঁচে কি ক'রে ?

"নির্মল !"—ওঘরে প্রফুল্ল ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে।

"এই যে !"

"আর দেরি ক'রে লাভ কী ? খাবে, এসো।"

"যাই।"

প্রভাতে শুষ্ক শ্রীহীন চেহারা নিয়ে মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো ফিরে এলো অনুপম।

প্রফুল্ল ঝোঁকের মাথায় না ভেবে-চিন্তে ব'লে ফেলল, "আচ্ছা তামাসাটা করলে যাহোক !"

অনুপম হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, "ঘুরতে ঘুরতে একেবারে আর এক রাজ্যে ! লক্ লোমণ্ডের কিনারায় থাকে সেই পুরাকালের ডাইনি বুড়ি। ফিরতে কি দেয় সহজে ?"

নির্মল প্রফুল্লকে চোখের ইঙ্গিতে ডেকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে বললে, "ব্রেক্‌ফাস্টের দেরি নেই, ঘুরে আসি একটু। আপনি ততক্ষণ তৈরি হ'য়ে নিন অনুদা।"

উত্তরে অনুপম কোটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল নির্মলেরই বিছানায়। বোঝা গেল, কোনো কথা বলবার বা শোনবার মতো অবস্থা ওর নয়।

আবার প্রফুল্লকে নিষেধের কটাক্ষ হেনে নিঃশব্দে নির্মল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আশ্চর্য এই পৃথিবী, আশ্চর্য তার কাণ্ডকারখানা !

দু'দিন না যেতে কত কী ঘটে গেল। এই অনুপম, দুঃখে-বিপদে নির্মল যাকে হিমাচলের মতো অটল দেখবে ভেবেছিল, সেও অবশেষে আকস্মিকের স্রোতমুখে বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়ল? এই তো মানুষ, এই তার শক্তি সামর্থ! এত ভঙ্গুর, এমন ক্ষণস্থায়ী! আনাড়ির সমুদ্র-স্নানের মতো জীবন-তরঙ্গের প্রতি দোলায় ক্ষণে ক্ষণে হাবুডুবু খেয়ে নৈরাশ্যের অতলে যায় তলিয়ে! পর্বত-প্রমাণ ঢেউয়ের মাথার ওপরেই অনায়াসে ভেসে থাকার কৌশলটি তবু কি শিখতে চায় কে?

হঠাৎ মনে হ'ল—জীবন-সমুদ্রের নাগরদোলায় স্থিরচিত্তে যিনি তরঙ্গের উৎক্ষেপের ও বিক্ষোভের বহু উর্ধ্বে উঠে থাকতে জানেন, তিনি কে? তেমন কেউ সত্যিই আছে কি এ বাস্তব পৃথিবীতে? আশ্চর্য! এতদিন একথা নির্মল ভুলে ছিল কি ক'রে? ওই পাহাড়ের আড়াল থেকে অকস্মাৎ সূর্য যেমন উঠল, নির্মলের মনের মাঝেও কোন্ অদৃশ্য বাধার আগল ভেঙে অতর্কিতে নেমে এসেছে নূতন আলোর রেখা। এখন দিশারী কই? ওর অন্তরের এলো-মেলো, ক্ষণে-জ্বলে-ওঠা ক্ষণে-নিভে-যাওয়া চঞ্চল দীপরশ্মিকে সংযত সংহত ক'রে, আত্মচেতনা ও শক্তির প্রেরণায় উদ্বোধিত প্রোজ্জ্বল প্রভাকরকে সৃষ্টি করতে পারবেন যিনি, উপনিষদের সেই ঋষি, সেই ভাস্কর পুরুষপ্রবর কোথায়? সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়া! কেন তুমি ভুলে রয়েছ নিজেকে? আত্ম-বিস্মরণের নিশি কি কাটেনি এখনো? একদিন নির্মল তোমায় বোঝেনি, সহায় হয়নি তোমার আদিত্য-সন্ধানে। আজ যদি পাশে এসে দাঁড়াতে একবার! যদি দু'জনে এক সাথে—

কিন্তু একি, কেন বৃথা এ চিন্তা? যা গেছে তা চিরকালের জন্যেই গেছে। বৃথা আক্ষেপ! আর কখনো ফিরবে না, ফেরাবার অধিকারও নেই নির্মলের। নেই—নেই, কেউ না জানলেও সে জানে—নেই! এখন কেবল একলা চলা—সামনে, সুদূর পথে এবং সত্বর!

হোটেলে ফিরে আবার ভাবতে বসে—আর কি এঁদের দরকার আছে ওকে? এবার গেলে হয় না? মনটা হঠাৎ কেমন নির্মম হ'য়ে ওঠে। পরের দরকার থাকলই বা, ওর নিজেরই গরজ কেন এত? কেন ও সেই ডাকে সাড়া দিতে বারবার এত ইতস্তত করে—অন্তর্গূঢ় যে ডাকের প্রেরণায় ওর আঁধার জীবনেও ফুটেছে তারার আলো! সুপ্রিয়ার স্বামী আছে—স্বামীই তো, এখন না হ'লেও হবেই দু'দিন পরে—আছে স্বজন, স্বগৃহ। আজই নির্মল বিদায় নিলে কোথাও একতিল ক্ষতি, একটুখানি অসুবিধাও হবে না ওর। সে রাত্রির কথা? যে রাত্রে সুপ্রিয়া অনুপমের মতামত পছন্দ অপছন্দকে একরকম উপেক্ষা ক'রে বিনা আহ্বানে বিজন পথে একা বেরিয়ে এসেছিল ওর সঙ্গে? আবেগে অস্ফুট সেই মৃদু কোমল কথাগুলো? এইটুকুর জন্যে এত দ্বিধা নির্মলের? ধ'রে নিয়েছে সুপ্রিয়া ভালোবাসে ওকে। কিন্তু গভীর দুঃখের সময় অন্তর যাকে চায় সেই যে আমাদের সত্য চাওয়া, এতদিন পরে একথাও কি বোঝাতে হবে মনকে? কাল কেমন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে বসেছিল সুপ্রিয়া, প্রতীক্ষায় ব্যাকুল সেই করুণ মুখ সে দৃষ্টি—সে তো ওর জন্যে নয়! যার জন্যে, সে ফিরে এসেছে।

কিন্তু তবু কেন আশা যায় না? কেন বিশ্বাস করতে চায় না মন—সেদিনের ব্যাপার, হয়ত সুপ্রিয়ার মুহূর্তের ভ্রান্তি, নয়ত দরদী প্রাণের করুণা, তার বেশি নয়! বিশ্বাস করবে একথা? এটা সম্ভব ভাবতেও ক্ষোভে যে মন কালো হ'য়ে ওঠে! হায় রেণুদি! মরণের পরেও যদি কিছু জানবার বা বোঝবার ক্ষমতা থাকে, নির্মলের সমস্যা বুঝবে শুধু তুমিই।

সারা সকালটা কাটল—কেমন ক'রে যাবার কথা তুলবে সেই চিন্তায়। দুপুরে অনুপমের সঙ্গে দেখা হ'ল, মুখের দিকে তাকিয়ে

নির্মল চমকিত হ'য়ে ওঠে। ও লোকটির দেহে-মনে কি ভূমিকম্প হ'য়ে গেছে? মানুষ চ'লে যায়, প'ড়ে থাকে স্মৃতি। তারই দুর্বহ ভারে জীবিতও যে জীবন্মৃত হ'য়ে উঠল!

ইতস্তত ক'রে সে দিন গেল; পরদিন—তার পরের দিনও। শিথিল হ'য়ে আসে নির্মলের সংকল্প। সুপ্রিয়া এখন সুস্থ, এবার লণ্ডনে ফিরবে ওরা—আর ক'টা দিন মাত্র বাকি। কোন্ অজুহাতে নির্মল একলা ফিরবার কথা তুলবে এখন?

একবার ভাবলে, কাজ কী এই প্রাণান্ত যুদ্ধে? সঙ্গেই যাই না কেন লণ্ডন পর্যন্ত?

আরো দু'চারদিন সুপ্রিয়ার সান্নিধ্যে থাকতে পাবার কল্পনায় মনটা বিভোর হ'য়ে ওঠে। হায়রে দূরের ডাক, হায় অসীম! মানুষ তোমায় সত্যিই চায় কি? নিজেকে নিয়ে, কাছের পাওনা-গণ্ডা লাভ ক্ষতির হিসাব খতিয়েই দিন রাত মশ্‌গুল যে! সময় কোথা সুদূর-পিপাসার? তবু তর্কেরও তো সীমা নেই মনের পাণ্ডিত্যে! কত না কূটপ্রশ্ন সাগর-তরঙ্গ গণনার বিফল চেষ্টায়! সমুদ্র রয়েছে!—ঝাঁপ দেয় কে?

শেষ পর্যন্ত কী হ'ত বলা যায় না, প্রফুল্লর মধ্যস্থতায় ঘটনার মন্থর গতি দ্রুত এগিয়ে এলো।

সেদিন খাবার টেবিলে ও হঠাৎ জানান্ দিল, "আমি আরো কিছুদিন থাকতে চাই এদিকে। নির্মল সঙ্গে যাবে, তোমাদের খুব বেশি অসুবিধা হবার কথা নয়। কী বলো অনু?"

অনুপমের কণ্ঠে অনেকখানি বিস্ময় প্রকাশ পেল, "নির্মল যাবে নাকি লণ্ডনে?"

"হাঁ যাবেই তো, না নির্মল ?"

নির্মলের হঠাৎ এমন লজ্জা ক'রে ওঠে, কী বলবে ভেবে পায় না। বাস্তবিক, ওদের সঙ্গে লণ্ডনে যাবার সঙ্গত কারণ কী আছে ওর ? স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে অধিকাংশ জিনিষপত্রও যে রয়েছে প'ড়ে।

অনুপমের দৃষ্টি যেন অন্তর ভেদ ক'রে সেখানকার সব কথা প'ড়ে নিতে চায় একমুহূর্তে।

চোখ নামিয়ে বিমনা নির্মল অনেকটা নিজেরও অজ্ঞাতে ব'লে ফেলল, "না।"

"যাবে না ? সে কি, তোমার প্রোগ্রাম কী তাহ'লে ?" প্রফুল্ল ব্যস্ত হ'য়ে উঠল।

নির্মল চুপ।

"অন্তত গ্লাসগো পর্যন্ত সঙ্গে যাবে তো ?"

"আমায় আগেই যেতে হবে।"

"আগেই ? কোথায়, কবে ?"

নির্মল সংক্ষেপে উত্তর দিল, "কাল।"

এতদিনের এত সমস্যার অবসান হ'ল এক কথায় !

কেউ চেয়ে দেখল না সুপ্রিয়ার মুখের ভাব। প্রফুল্ল অন্যমনস্ক।

অনুপমের চোখ নির্মলের উপর, মনে মনে অনেকক্ষণ কী ভেবে বললে, "বার্মিংহামে যাচ্ছ নির্মল ?"

"সম্প্রতি ওখানেই বটে।" নির্মল বিব্রত হ'য়ে উঠল, অনুপমের চোখ দু'টি বলতে চায় কী ? ঈষৎ বিরক্তি বোধ করলে।

খাওয়া শেষ হ'য়ে গেল।

বাইরে যাবার জন্যে নির্মল ওভারকোট প'রে তৈরি—অনুপম নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়াল। ও কিছু বলবার আগেই—হঠাৎ হাত চেপে ধরল, রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "মাপ কোরো আমায় !"

অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল নির্মল।

দ্রুত চাপাস্বরে অনুপম বললে, "পেয়েও যে ছেড়ে যেতে পারে, তাকে বলবার মতো কথা পাইনে খুঁজে। বুকের ভিতরটায় যখন বিপ্লব হ'য়ে গেল, তখনই কেবল বুঝলাম"—মুখের কথা অসমাপ্ত রেখে আচম্‌কা অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

রুদ্ধবাক নির্মলের মনের বিস্ময় ঘুচতে না ঘুচতে কেবলই কানে বাজে, "পেয়েও যে ছেড়ে যেতে পারে—"

কে সে?

নির্মল? কেন—কেন বললে অনুপম একথা? কী পেয়েও—সহসা অন্ধকারের বুক চিরে তীব্র বিদ্যুল্লেখা : সুপ্রিয়া!

এ কি সম্ভব!⋯ ⋯

কোথায় যাবে নির্মল এ মাতাল মনকে নিয়ে? ফিরে এলো নিরালা খাবার ঘরে। এদিক ওদিকে চেয়ে দেখলে, কোথাও কেউ নেই। সাবধানে দুয়ার ভেজিয়ে দিয়ে কোণের ইজিচেয়ারটায় ব'সে পড়ল। ভাবতে হবে—ভাবতে হবে! কপালের শিরাগুলো কি ফুলে উঠেছে, এখনি বুঝি ফেটে রক্ত ঝরবে!

মানুষের প্রাণে কি অন্তও নেই লোভের? যাতে লাভ নেই কোনো, যা প্রশ্রয় পেলে জীবনের পানপাত্রে সুধার পরিবর্তে পলকে অবিমিশ্র গরল তুলবে ফেনিয়ে, তাকেই নিয়ে বারবার কল্পনা-কুসুমের মালা গাঁথা? ঘুরে ফিরে কেবলই সেদিকপানে চাওয়া যেদিক থেকে ফিরাতেই হবে মুখ শেষ পর্যন্ত? নির্মলের চেয়ে পর, ভালোবাসলে নির্মলের চেয়ে বড় শত্রু এ-বিশ্বে সুপ্রিয়া আর একটিও খুঁজে পাবে কি? অপরের সর্বনাশ করবার এ-প্রবৃত্তি ঘুচবে কবে নির্মলের, কবে লোভের শিকল কেটে বেরিয়ে পড়বে মুক্ত পথে!

দরজায় মৃদু করাঘাত। চম্‌কে উঠল, "কে?"

উত্তর নেই।

ভাবলে, ওয়েটারদেরই কেউ হবে বোধ হয়। উঠে দাঁড়াল, দোর খুলে দিতেই বুকের ভিতরে ধক্ ক'রে উঠল। তিলমাত্র ইতস্তত না ক'রে আশ্চর্য পরিষ্কার কণ্ঠে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "চ'লে যাবেন বলছিলেন। কোথায় যাবেন ?"

নির্মল চুপ ক'রে ভাবতে লাগল। হঠাৎ এর কী উত্তর দেওয়া যায় ?

"ও ঘরে আসুন না একবার। কথা আছে।"

যন্ত্রচালিতের মতো পিছন পিছন এলো নির্মল। বসবার ঘরে, প্রফুল্ল অনুপম দু'জনেই আছে।

সুপ্রিয়া বললে, "নির্মলদা এসেছেন।"

অনুপম মুখ না তুলেই বললে, "আচ্ছা।"

"শোনো আমার যা বলবার আছে। বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না।"

"বিরক্তির কথা হচ্ছে না, একাজটা আজ শেষ না করলেই নয় তাই—আচ্ছা থাক্, বলো কী বলবে।"

সুপ্রিয়ার চোখ আপনি নত হ'য়ে পড়ল ; কিন্তু না বললেই নয়, তাই সংকোচ কাটিয়ে ধীরে ধীরে বললে, "দিদির ইচ্ছা ছিল—"

"কী ?"

"এদেশে নির্মলদা যেন তোমার কাছে-কাছেই থাকেন। অনেকবার একথা বলেছেন, স্টীমারেও, এখানেও। সে তুমি জানো। এখন ওঁকে যেতে দিচ্ছ কেন ?" গলাটা যেন ওর ধ'রে এলো, কল্পনা কিনা অনুপম ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু অবাক হ'য়ে গেল। হঠাৎ এ কেমন অভিযোগ !

জিজ্ঞাসা করলে, "আমি কি নির্মলের অভিভাবক ?"

"না। আমি শুধু দিদির ইচ্ছাটাই মনে করিয়ে দিলাম।"

প্রফুল্ল ম্লানমুখে চুপ ক'রে বসেছিল। কী মনে হ'ল সে-ই জানে, ধীরে ধীরে বললে, "চলো সকলে একসঙ্গেই ফেরা যাক্।"

নির্মল বললে "না।"

"কেন? এমন ক'রে পথের মাঝখানে ছেড়ে যাওয়া—কোথায় যাবে নির্মল?"

"কি জানি।"

"বেশ যাহোক, নিরুদ্দেশ যাত্রা নাকি?"

"কতকটা তাই বই কি।"

অনুপম ততক্ষণে সাম্‌লে নিয়েছে নিজেকে। ফিরে ব'সে বললে, "সুপ্রিয়া ঠিকই বলেছে, রেণুর ইচ্ছা ছিল—"

বাধা দিয়ে ব্যগ্র উৎকণ্ঠিতভাবে নির্মল বললে, "থাকা অসম্ভব অনুদা, পারলে থাকতাম!"

অনুপম ঘাড় হেঁট ক'রে বললে, "সে আমি জানি।" ব'লে নিজের কাজে মন দিল।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর প্রফুল্ল চুপি-চুপি বললে, "ব্যাপার কী নির্মল? কী যেন একটা লুকোচ্ছ, বলবে না?"

নির্মলের মুখ লাল হ'য়ে উঠল।

প্রফুল্ল আবার বললে, "নিরুদ্দেশ? এর মানে?"

কথাটা অপর দুজনেরও কানে গেল।

প্রফুল্ল তাড়া দিয়ে বললে, "বলোই না!"

নির্মল হাসল।

প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত হেসে বললে, "ও, ঠাট্টা?"

"একটু।"

"বাকিটা ?"

"বাকিটা ?" দেখতে দেখতে নির্মলের মুখ প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল, "বাকিটা কী শুনবে প্রফুল্ল ? যা না পেলে সমাধান হবে না এই ছন্নছাড়া জীবনের অসংখ্য সমস্যার, অগুন্তি জটিলতার, চলেছি তারই খোঁজে !"

সুপ্রিয়ার হাতে জলের গ্লাস কেঁপে উঠল। এ চাঞ্চল্য কারো চোখ এড়ালো না, নির্মল স্তব্ধ হ'য়ে থেমে গেল।

আত্মসংবরণ ক'রে প্রফুল্ল মৃদু হাসল, বললে, "সকল রোগের সে মহৌষধ কী ? আধ্যাত্মিকতা ? ভগবান ?"

অনুপমের ললাটে বিষাদের ছায়া। খানিক ইতস্তত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "তাই নাকি নির্মল ?"

নির্মল চুপ ক'রেই থাকে।

অনুপম বললে, "আইডিয়া—না আলেয়া! তারই পিছনে সারা জীবন ছুটোছুটি ক'রে শেষকালে যদি দেখ যে লাভ হয়েছে শুধুই সর্বহারা শূন্য প্রাণ ?"

এ-ই তবে অনুপমের অভিজ্ঞতা ? মুহূর্তের জন্যে নির্মলের মুখে কথা সরল না। তারপরে বললে, "তর্ক করা চলে না আমার। সত্যিই তো, এমন কিছু পাইনি দেখিনি বা উপলব্ধি করিনি জীবনে এখনো— যা মুঠোয় তুলে আপনাদের চোখের সামনে ধ'রে বলতে পারব, 'এই দেখুন সত্য ; আইডিয়া না—আলেয়া নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূত বাস্তবের থেকেও বস্তুগত সত্য !'···অথচ যতদিন তা না পারি, বিশ্বের মধ্যে অন্তত একজনও সত্যকে সুন্দরকে মহানকে জীবনে মূর্ত ক'রে তুলেছে, এ সন্ধান যতদিন না পাই এবং দেখিয়ে দিতে না পারি, ততদিন বিশ্বাস করাবার উপায় বাইরে নেই ; কিন্তু—"

সাগ্রহে সুপ্রিয়া মুখ তুলল। আন্তরিকতায় দীপ্ত সেই জিজ্ঞাসু

গভীর চোখ দু'টির দিকে আপন নিঃসংকোচ স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ততোধিক স্থিরস্বরে নির্মল বললে, "আছে অন্তরে!"

সুপ্রিয়ার চোখ উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠল।

ওদিক থেকে বিদ্রোহের কণ্ঠে প্রফুল্ল বললে, "কিন্তু সেই অন্তরই যখন উল্টোপাল্টা কথা বলে?"

দৃঢ় কণ্ঠে নির্মল বললে, "এলোমেলো কথা যে বলে, সে অন্তর নয় প্রফুল্ল। চিন্ময় সে, অভিলাষ তার ঊর্ধ্বমুখ।"

অনুপম বললে, "মানলাম, কিন্তু—নির্মল! ···না, থাক্।"

"বলুন না, থামলেন কেন?"

"বলছিলাম কি, মানি—মনই চিন্তার তরঙ্গ-চঞ্চল, প্রাণেই ওঠে বাসনার বিক্ষোভ, অন্তরতম বাণীই সত্য-প্রসূতি। কিন্তু যদি সেই নিভৃত অন্তরই কারো এমন কোনো মহৎ প্রচেষ্টা, এমন কোনো আদর্শের কথা শোনায়, যা মানুষকে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হ'তে ও বনে-জঙ্গলে নিরুদ্দেশে ঘুরে সত্যকে খুঁজতে প্রেরণা দেয় না, যে ভগবান মানে, অথচ তাঁকে উপলব্ধি করতে হ'লে সংসার ও তার শত কর্তব্যকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার কোনোই প্রয়োজন বোধ করে না, বরং মনে করে যে প্রত্যেকের স্বভাব-অনুসারে স্বজন স্বগৃহ স্বদেশের প্রতি কর্তব্য করলে তাঁর কাজ তাঁরই সেবা তাঁর আজ্ঞাই পালন করা হয়—কী বলবে তোমরা তাকে? মুখে যা-ই বলুক অন্তরে সত্যকে সে বাস্তবিকই চায় না, মনকে চোখ ঠারে ইত্যাদি বিদ্রূপের কথা ব'লে বা ভেবে একটুখানি অবজ্ঞার হাসি হেসে দেবে উড়িয়ে?"

"না", স্নিগ্ধ শান্তস্বরে নির্মল বললে, "শুধু এই বুঝব যে সে কর্ম, সে আদর্শ, সেই কর্তব্যের যথাযথ পালনই একান্ত সত্য, একান্ত প্রয়োজন ওর পক্ষে ততদিন—হয়ত বা সারাজীবন—যতদিন না ওর অন্তর,

ওর মনপ্রাণ আরো কিছুর জন্যে, আরো বেশির জন্যে ক্ষুধিত তৃষিত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে! সে ক্ষুধা এমন তীব্র, সে তৃষ্ণা এত প্রবল, এত সত্য যে কাউকে তা ব'লে দিতে হয় না, অনুদা। এরকমই শুনেছি আমি। কিন্তু মুখে ব'লে যখন তা বোঝানো যায় না—"

অনুপম আরো অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে, "আমিই বা কী বলতে চাই, কেন বুঝতে পারছ না? ভগবানকে উপলব্ধি করতে হ'লে সংস্কার স্বকর্ম স্বধর্ম—সমস্তকেই একেবারে অস্বীকার করবার বা ত্যাগ করবার কোনো দরকার আছে কি?" চোখ দু'টি ওর হঠাৎ জ্বলে উঠল, কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললে, "উপাস্যকে পাবার জন্যে উপাসনাও করতে হয় না কি একটা কোনো বিশেষ ধারায়? সে প্রয়োজনটাই যদি না মানো, যদি কারো হরিনামের ঝুলি, হাতের মালাটাই জোর ক'রে কেড়ে নাও কুসংস্কার ব'লে তাকে নামঞ্জুর ক'রে দিয়ে—".

"অনুদা!"

"পায়ের নীচে থেকে হঠাৎ মাটি সরিয়ে নিলে যেমন হয় নির্মল, চিরদিনকার জানা-পথে জানা-কাজে, মেনে-চলা আদর্শ বা ধর্মে মিথ্যে অবিশ্বাস এনে দিলে, সন্দেহ ঢুকিয়ে দিলেও ঠিক তেমনি—হয়ত বা তার থেকেও বেশি, সাংঘাতিক—মর্মান্তিক দুর্দশা হ'তে পারে মানুষের, তা জানো? কী কষ্ট যে আমার—" কণ্ঠ ওর ভেঙে পড়ল।

আর্দ্রস্বরে নির্মল বললে, "কিন্তু···তা তো আমি—"

"বলোনি? একশোবার বলেছ! ও ছাড়া আর কথাই নেই তোমাদের মুখে!"

সুপ্রিয়া স্তম্ভিতভাবে কেবল চেয়েই রইল।

সেদিকে চোখ পড়তে অনুপম অকস্মাৎ লজ্জিত হ'য়ে যথাসাধ্য শান্ত সুরে বললে, "তাই বলি, যার যে-কাজ স্থিরভাবে তা-ই করতে দাও

তাকে। নিঃস্ব হ'য়ে বেঘোরে ঘুরে মরার চেয়ে অল্প পুঁজি নিয়ে জানা পথে যাওয়া-আসাও ভাল নয় কি ?"

প্রফুল্ল এতক্ষণ চুপ ক'রে শুনছিল। এবার আস্তে আস্তে বললে, "তা তো বটেই। কিন্তু নির্মল বলছে কি—ধরো, আর কারো অন্তরের প্রেরণা যদি অন্যদিকে হয়, এমন কেউ যার সুখ নেই—"

কথার মাঝখানেই নির্মল উঠে দাঁড়াল, বললে, "থাক্, এসব আলোচনা। পুঁজি আমারও সত্যিই বিশেষ কিছু নেই অনুদা, তবু দেখতে হবে খুঁজে। কোথাও কিছু পাই যদি, ভালোই। না পেলেও দোষ দেব না কাউকে। গেলই বা একটা জন্ম বেঘোরে মারা! যে দিয়েছে জীবন সে-ই বুঝবে। আরো বুঝবে, কেন চিরটা কাল এমন শান্তিহারা ভবঘুরে ক'রে গড়েছে আমায়!"

অনুপম মুহূর্তেক চুপ ক'রে থেকে বললে, "নির্মল, কিছু মনে কোরো না, রেণু বড় ভালবাসত তোমায়, অন্তত সেজন্যে—"

নির্মল ফিরে দাঁড়াল।

নিশ্বাস ফেলে অনুপম বললে, "ধ'রে রাখবার হ'লে রাখতাম। সত্যিই যাবে ?"

"আপনার অনুমতি পেলে ভোরেই রওনা হব কাল।"

"আর দু'দিন থাকো না, অন্তত আমাদের লণ্ডন যাওয়া পর্যন্ত—কি হ'ল ?"

সুপ্রিয়া জানালার কাছে স'রে গিয়ে বললে, "কিছু না।"

নির্মলের হৃদয় অশান্ত হ'য়ে উঠল। চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে সুপ্রিয়ার পা কাঁপছে!

দুরন্ত অবাধ্য মনকে বশে এনে ক্লিষ্টকণ্ঠে নির্মল উত্তর করলে, "আর দেরি করবার যো নেই, অনুদা।" কোনো-দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এলো।

উপরতলায় নিজের ঘরে গিয়ে বসেছে মাত্র, প্রফুল্ল ছুটে এসে বললে, "কসাই !"

সভয়ে নির্মল জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপার কী ?"

নেমে যেতে যেতে কেমন একরকম ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে প্রফুল্ল চেঁচিয়ে বললে, "জানো না ?"

সিঁড়ির গোড়ায় অনুপম দাঁড়িয়ে। হাত নেড়ে নিষেধ ক'রে বললে, "ব্যস্ত হ'য়ো না। বিশেষ কিছুই নয় নির্মল, মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল মাত্র।"

"এখন কেমন আছে ?"

"ভালোই তো।" অনুপম ফিরে গেল।

মুহূর্তের জন্যে নির্মলের সকল সত্তা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতে চাইল, নীচে যাবার জন্যে একবার পা বাড়ালে, তারপর দ্বিগুণ নিরাশায় অবসন্ন চিত্তে ঘরেই এলো ফিরে। মনে হ'ল, চোখের সমুখে এমন দিনের আলোতেও ট্রসাক্সের ওই সুন্দরী প্রকৃতি নিমেষে ম্লান নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, রইল কেবল অর্থহীন অনুভূতি-হীন গাছ পাথরের স্তূপ, বর্ণ গন্ধহীন দুস্তীর্ণ জলের রাশি—মানুষের কোনো দুঃখেই এতটুকু ছায়াপাত হয় না যাদের বুকে !

সন্ধ্যার সময় সুপ্রিয়া খেতে আসেনি। বয় এসে খাবার উপরে নিয়ে গেল।

তিন জন নিঃশব্দে ডিনার শেষ ক'রে উঠে পড়ল।

প্রফুল্লর মুখ গম্ভীর ! অনুপম বা নির্মল কারো সঙ্গে ভালো ক'রে কথাই বলল না।

অনুপম জিজ্ঞাসা করলে, "কাল ভোরেই যাচ্ছ তাহ'লে ?"

নির্মল উত্তর করলে, "হাঁ।"

"পৌঁছেই কিন্তু একটা খবর দিয়ো আমার ইউনিভার্সিটির ঠিকানায়। আর, লণ্ডনে গেলে অবিশ্যি দেখা কোরো একবার। ভুলবে না তো?"

"না।"…

অনেক রাতে শুতে যাবার আগে প্রফুল্ল এলো। বিছানায় ব'সে ডাকলে, "ঘুমোচ্ছ, নির্মল?"

নির্মল পাশ ফিরল।

চুপচাপ ব'সে রইল প্রফুল্ল। দু'জনেই বুঝল দু'জনের মনের কথা। বন্ধুর হাতে হাত রেখে নির্মল নিস্তব্ধ রইল প'ড়ে।

কতক্ষণ পরে প্রফুল্ল শুতে চলল। নির্মল উঠে দুয়ার পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলো। হঠাৎ প্রফুল্ল ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "বলতে এসেছিলাম—আর একটা দিন থাকো। কিন্তু—হয়ত ঠিকই করছ তুমি, হয়ত এমনি যাওয়াই ভালো! লাভ কী সংসারে জটিলতা বাড়িয়ে!" ছুটে চ'লে গেল প্রফুল্ল।

বিষণ্ণ হেসে নির্মল মনে মনে বললে, "লাভ?"

* * *

তখনো ভালো ক'রে অন্ধকার কাটেনি। সমস্ত রাত্রি থাকতে নির্মল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। শেষবারের মতো, অনেক সুখ দুঃখ অনেক দিনের আশা-আনন্দের স্মৃতি-বিজড়িত ওই হ্রদ ওই পাহাড়!…

ধীরে দরজা খুলে এলো বাইরে। বিশ্বাস হ'ল না নিজের

চোখকে। ঠিক সামনে, বিশ্বের বিস্ময়কে সাথে নিয়ে, মৃদুচরণে মৌনমুখী—কে আসে ?···

বাক্যহারা নির্মলের শুষ্ক জিহ্বা অনেক চেষ্টায়ও যা উচ্চারণ করতে পারল না, চোখের দৃষ্টি শত বক্তার ভাষাদীপ্ত হ'য়ে সে অভাব, সে অক্ষমতার ক্ষতি পূরণ ক'রে দিল।

একাগ্র, নিবিষ্টভাবে সেদিকে তাকিয়ে আরো—আরো অগ্রসর হ'য়ে এলো সুপ্রিয়া, জাগ্রত, কি স্বপ্নময়ী কে জানে!

চারিদিকে বায়ুমণ্ডল, বাইরে বনভূমি স্তব্ধ—প্রতীক্ষমান।···কী বলতে এসেছে সুপ্রিয়া ? কথা নেই কেন মুখে ?

নির্মল আর সহ্য করতে পারল না। রুদ্ধশ্বাসে কাছে স'রে গেল।

ওর ব্যাকুল কম্পিত হাতখানি নিজের উষ্ণ ললাটে চেপে ধ'রে সুপ্রিয়া আবার মৌন নিথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।·· শেষ নিশার ম্লান তারার দলও বুঝি এত নিস্তব্ধ, এত করুণ নয়!

অন্ধকার ক্রমেই কেটে আসছে, হ্রদের জল স্বচ্ছতর।

অনেকক্ষণ পরে সুপ্রিয়া আস্তে আস্তে স'রে দাঁড়াল। নির্মল চকিত হ'য়ে বল্লে, "সুপ্রিয়া, তুমি—"

সুপ্রিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল।

"কেন এলে ? শেষদিনে কেন এলে তুমি ?"

"শেষদিন ? হ্যাঁ তাইতো এলাম।"

অবসাদে ক্লান্ত নির্মল সেখানেই ব'সে পড়ল।

খানিকক্ষণ নীরবে সেদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সুপ্রিয়া আরো কাছে স'রে এলো। নির্মল চোখ তুলল না, চেয়ে দেখল না। এবার সুপ্রিয়া ভেঙে পড়ল, নতজানু হ'য়ে সামনে ব'সে উর্ধ্বমুখে মুখের পানে চেয়ে শুধু বললে, "নির্মল!"···গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

বহুদিনের কামনার, বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার—প্রার্থনার ধন হাতের কাছে···কত কাছে! পল্লবিনী শ্যামল লতার মতো এই উষ্ণ কোমল সুখস্পর্শ প্রিয়া-দেহ!

নির্মলের মনে হ'ল চেতনা বুঝি লুপ্ত হ'য়ে যাবে! না জেনে না বুঝে এ কার কাছে এলো সুপ্রিয়া?

কষ্টে আপনাকে সংবরণ ক'রে, ওর মুখের ওর অধরের উপর হ'তে অবাধ্য চোখকে দূরে সরিয়ে কম্পিত ভগ্নকণ্ঠে, আচ্ছন্ন বিবশের মতো নির্মল বললে, "কেন এলে—কেন এলে? ঠিক যে মুহূর্তে সব ভুলে সব ফেলে পথে বের হব আমি, সে সময়ে সুপ্রিয়া, কেন এলে?"

"কেন এলাম? সাথী হব পথের, তাই।"

নির্মল চুপ ক'রে চেয়ে রইল।

"বুঝতে পারলে না? সঙ্গে যাবো আমি।"

"সঙ্গে যাবে—আমার? কোথায়?"

"যেদিকে তুমি যাবে·· যে পথে তুমি চলেছ···"

"কী জানো তুমি আমার?"

"কিছু না। ভালোবাসি—শুধু—শুধু এই।"

নির্মলের বুকের ভিতর তোলপাড় করতে লাগল, কোথায় ছিল এতদিন এ ভালোবাসা? হায় সুপ্রিয়া, যখন সময় ছিল—

সজল চোখ দু'টি তুলে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে, "উত্তর দাও না যে? বিশ্বাস হয় না?"

জবাব দিতে গিয়ে নির্মলের ওষ্ঠাধর কাঁপতে লাগল। কষ্টে অস্ফুটে বললে, "সে হয় না!"

"হয় না?···নির্মল!"

"পাগল হয়েছ সুপ্রিয়া? এক অজানা পুরুষের সঙ্গে—"

সুপ্রিয়া খাটের উপর মাথা রেখে ফুলে-ফুলে কাঁদছে···এক-

আধদিনের তো নয়, দু'বছর—দীর্ঘ দু'বছরের সঞ্চিত কান্না! বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, বুঝি বা অর্থও নেই তার।

নির্মল চোখ বুজে একবার অন্তরের মধ্যে তলিয়ে দেখলে। কী দেখলে কী বুঝলে সে-ই জানে। বললে, "সুপ্রিয়া, উঠে বোসো, শোনো।"

সুপ্রিয়া উঠে বসল।

"না শুনলে তুমি—বুঝতে পারবে না। তাই—" এক মুহূর্ত কোনো কথা এলো না নির্মলের মুখে, মুহূর্তের প্রলোভনে মনে হ'ল, না-ই বা বললাম···না-ই বা দিলাম চিরদিনের মতো পর ক'রে! তারপর হঠাৎ নির্মম হ'য়ে ব'লে ফেলল, "কোনোদিন কোনো কারণেই কোথাও যাওয়া হ'তে পারে না তোমার—আমার সঙ্গে। কেন জানো?"

সুপ্রিয়া কষ্টে উচ্চারণ করলে, "কেন?"

নীরসকণ্ঠে জবাব এলো, "অনুপম—আর—আর—ডরোথী; আমার সঙ্গে কী সম্বন্ধ ছিল তার, যদি—যদি জানতে—"

"শুধু এই জন্যে? নির্মল, শুধু এইজন্যে তুমি আমায়—"

"সুপ্রিয়া, তুমি নিজেই কি জানো না—অনুপম—তাকে তুমি··· নিজেই কি দেখনি! সুপ্রিয়া, সুপ্রিয়া! দয়া করো, দয়া করো আমায়! কোথায় গেল তোমার সেই তেজ, সেই দৃঢ়তা? ঘৃণা করো আমায়, অবজ্ঞা করো—ছেড়ে যাও!"

একবার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে সুপ্রিয়া বুঝতে চেষ্টা করলে, একবার বুঝি কী বলতে চাইল, পরক্ষণে চেতনা হারিয়ে সেখানেই পড়ল লুটিয়ে।

ব্যাপার অনুমান ক'রে অনুপম স্তম্ভিতের মতো ব'সে রইল। কত দুঃখে, অন্তরের কী ভয়ানক আবেগ-আলোড়নের ফলে সুপ্রিয়ার

মতো অনভিসারিকা স্পর্শকাতর মেয়ে ভূত-ভবিষ্যত সব ভুলে এমন-ভাবে অপরের হাতে তুলে দিতে পারে নিজেকে, নিশ্চয় ক'রে বুঝে. আজ আর ওর বিস্ময়ের, ভয়েরও সীমা রইল না। তবু সমস্ত ছাপিয়ে একটা কথাই কেবল মনে বাজতে লাগল, "কত ভালোবাসলে এ সম্ভব হয়!" যে বিষাদ প্রবল হ'য়ে উঠে আর সকল চিন্তাকে গলা টিপে মারতে চায়, জোর ক'রে তা ঠেলে ফেলে সংযত কণ্ঠেই নির্মলকে আড়ালে এক সময় বললে, "ডরোথীর বিষয়েও ও সবই জানত নির্মল। অশান্ত লিখেছিল লণ্ডন থেকে। তবু—"

হৃদয়ে সূচিবিদ্ধের মতো নির্মলের মুখ যন্ত্রণায় ম্লান হ'য়ে গেল, মনে মনে বললে, "আর তো আমি পারিনে!" উঠে গেল সেখান থেকে।······

জীবন-নাট্য!

কারো কোনো ক্ষতি হ'ত না, কাউকে হানতে হ'ত না মরণবাণ, যদি ক্ষণেকের প্রলোভনে ভূলে ট্রসাক্সে না আসত সে। স্ট্রাট্ফোর্ডের সেই শান্ত সুন্দর দিনগুলো, সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত অপ্রত্যাশিত সাক্ষাত! কেন সেই স্মৃতি মনে এঁকে নিয়ে তখনই যাত্রা করল না অজানা পথে!······

ফিরে এসে অনুপমকে বললে, "একদিন মার্জনা চেয়েছিলেন, কেন বা কী দোষ জানি না, জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি। আজ ক্ষমা চাইবার দিন আমার। যত অপরাধ করেছি—"

"নির্মল, সবই অদৃষ্ট। অনর্থক নিজেকে দায়ী ক'রে লাভ কী?"

"কোনো লাভ নেই? সত্যি বলছেন?"

ম্লান হেসে অনুপম বললে "সত্যই বলছি। শান্ত হ'লে নিজেই বুঝবে। নির্মল, মানুষ অন্ধ, মানুষ অজ্ঞান—যা খুসি বলতে পারো।

কিন্তু প্রতি পদে, তার প্রতি কাজে, যতটা দোষী ব'লে তাকে ভাবি আমরা, হয়ত দোষ ততটা সত্যিই নয় তার।"

"কার তবে?"

"তা জানিনে। বলেছি তো···অন্ধ!"

কথাগুলো নির্মল মন দিয়ে শুনল, ওর মুখের পানে চেয়ে একটু-খানি ভাবল, তারপর বললে, "চললাম। আর কোনোদিন দেখা যদি নাও হয়—" গলাটা ধ'রে এলো, সাম্‌লে নিয়ে বললে, "ভুলব না।"

অনুপম মনে মনে ভাবল, "ভুলতে পারবে কেন?"···কাছে এসে সান্ত্বনার সুরে বললে, "এখনই যাবার দরকার কী? আজকের দিনটা অন্তত থাকো। ··সুস্থ হ'য়ে উঠলে—হয়ত—আর একটিবার দেখা··· শেষবারের মতো—নইলে, ওর মনে হয়ত—"

নির্মলের বুকের ভিতরটা যেন পুড়ে গেল···শেষ দেখা? না না, এইই ভালো।

ঘরের ভিতর থেকে ব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে ঢোক গিলে বললে, "একটা খবর শুধু—কেমন থাকে—"

"নিশ্চয়। কিন্তু—এত তাড়াহুড়ো ক'রে না গেলেই কি চলত না? যাবেই? আচ্ছা এসো তবে। তোমায় মন্দ ভেবে শুধু যে অন্যায় করেছিলাম তা নয়, নিজের মনে কষ্টও পেয়েছি অনেক। যাবার সময় শুধু এটুকু বিশ্বাস ক'রে যাও, নির্মল।"

চোখের জল চেপে নির্মল দ্রুতপদে নীচে নেমে এলো।

গেটের পাশে প্রফুল্ল দাঁড়িয়েছিল। হাত চেপে ধ'রে জোর ক'রে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "দেখা ক'রে এসেছ?"

হাত ছাড়িয়ে নির্মল নিরুত্তরে ফটকের বাইরে এসে পড়ল। শুনতে পেল প্রফুল্লর শেষ কথা, "ট্রাজেডি হাউস্!"

থমকে দাঁড়াল নির্মল। ফিরে দেখল ঐ বাড়ি, এই হ্রদ, ওই

পাহাড়, ওই সেই বন-পথ—সুপ্রিয়া !···রইল সব পিছনে প'ড়ে—জীবনে যা কিছু প্রিয়, যা কিছু জানা যা মধুর—সব !

এখন শূন্যপাত্র হাতে নিয়ে কোন্ অজানার অভিসারে চলেছে সে ?

যা আছে তাকে ফেলে, নেই যা তারই পিছনে ছুটে চলা ! এই-ই যদি হয় শ্রান্ত পথের শেষে শেষ-আবিষ্কার !

মুহূর্তের জন্যে নির্মল অন্ধকার দেখল চোখে। সে নিমেষে সারা বিশ্বের সন্দেহ, বিষাদ, দেবদ্রোহ পুঞ্জীভূত হ'য়ে, ওর হৃদয় ও প্রাণ যেন অসাড় ক'রে দিল। সুপ্রিয়া নেই, রেণু নেই, নেই কোনো বান্ধব। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল শূন্যতা, কেবল রিক্ততা—অতলস্পর্শ, বিরাট, অনন্তকালস্থায়ী !···যন্ত্রণায় নির্মল পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে মাথাটা চেপে ধরল, জোরে—আরো জোরে ! বেদনাবোধ নেই, বুঝি চেতনাও নেই।

যখন চোখ খুলল, মনের আকাশ কোন্ যাদুমন্ত্রে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে।

উঠে দাঁড়াল। সামনে অনন্ত, উদাসী পথ।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী ও দর্শনের কয়েকখানি সাধারণোপযোগী পুস্তক—

শ্রীঅরবিন্দ-ভাষ্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)— ১।০

(অনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত—মূল শ্লোক অন্বয় মুখে অনুবাদ ও প্রতি শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য)

শ্রীঅরবিন্দ ও ভাবী সমাজ (শ্রীঅনিলবরণ রায়)—

তীর্থঙ্কর (শ্রীদিলীপ কুমার রায়)—

(শ্রীঅরবিন্দের বিষয় ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধি, রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সম্পর্কে অনেক তথ্যপূর্ণ কথা এতে আছে যা জীবনী আলোচনার উপাদান)

শ্রীঅরবিন্দ (জীবন ও যোগ)— প্রমোদ কুমার সেন—

(শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনের ও দর্শনের প্রাঞ্জল ভাষায় বিবরণী)